শিক্ষা
সমাজ
দেশ
সামাজিক শিক্ষা
ও
সমাজসংস্কার
হাসনান আহমেদ

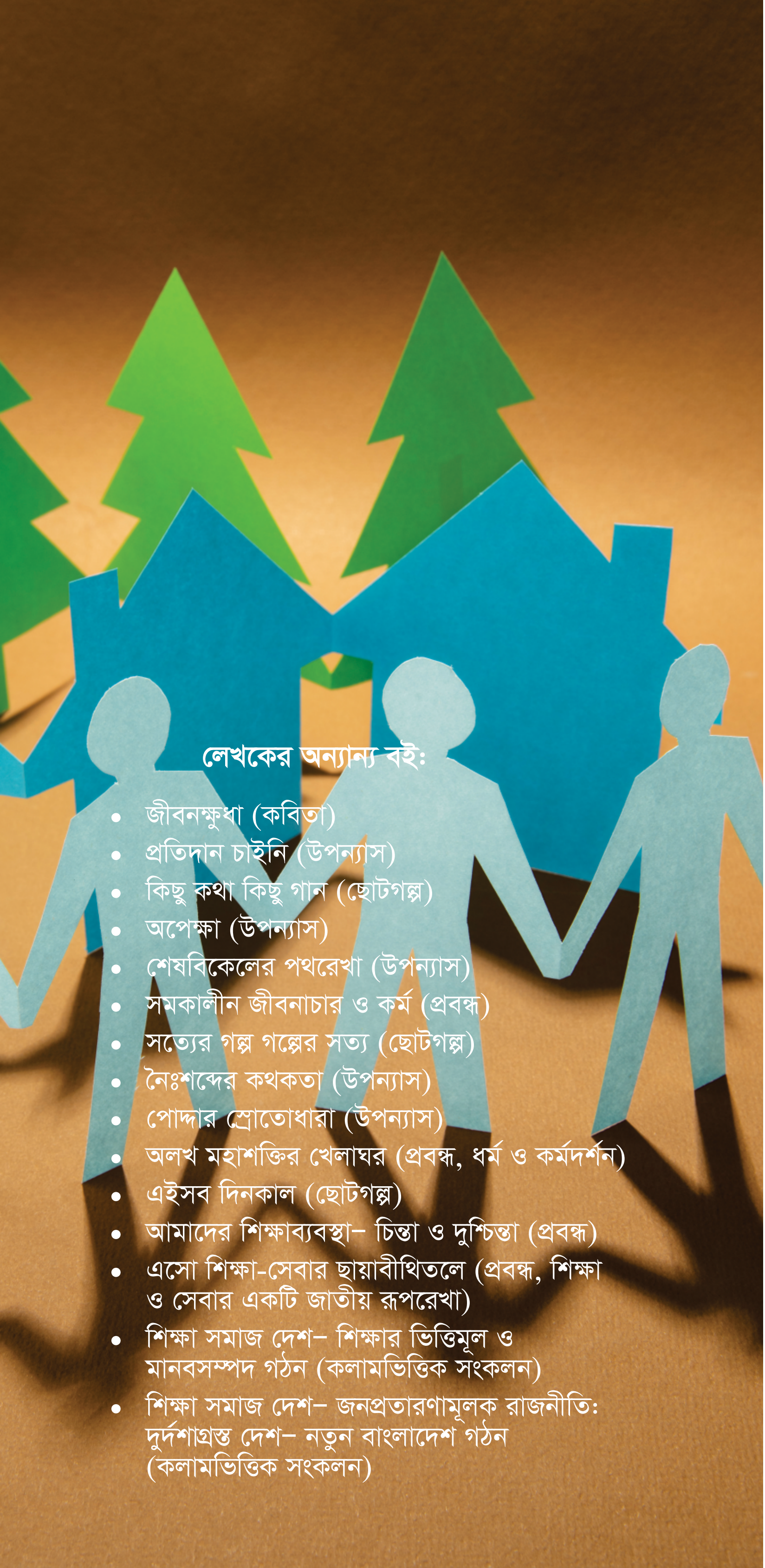

লেখকের অন্যান্য বই:

- জীবনক্ষুধা (কবিতা)
- প্রতিদান চাইনি (উপন্যাস)
- কিছু কথা কিছু গান (ছোটগল্প)
- অপেক্ষা (উপন্যাস)
- শেষবিকেলের পথরেখা (উপন্যাস)
- সমকালীন জীবনাচার ও কর্ম (প্রবন্ধ)
- সত্যের গল্প গল্পের সত্য (ছোটগল্প)
- নৈঃশব্দের কথকতা (উপন্যাস)
- পোদ্দার স্রোতোধারা (উপন্যাস)
- অলখ মহাশক্তির খেলাঘর (প্রবন্ধ, ধর্ম ও কর্মদর্শন)
- এইসব দিনকাল (ছোটগল্প)
- আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা (প্রবন্ধ)
- এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে (প্রবন্ধ, শিক্ষা ও সেবার একটি জাতীয় রূপরেখা)
- শিক্ষা সমাজ দেশ– শিক্ষার ভিত্তিমূল ও মানবসম্পদ গঠন (কলামভিত্তিক সংকলন)
- শিক্ষা সমাজ দেশ– জনপ্রতারণামূলক রাজনীতি: দুর্দশাগ্রস্ত দেশ– নতুন বাংলাদেশ গঠন (কলামভিত্তিক সংকলন)

শিক্ষা
সমাজ
দেশ

সামাজিক শিক্ষা ও সমাজসংস্কার

হাসনান আহমেদ

প্রবৃতি

শিক্ষা সমাজ দেশ

সামাজিক শিক্ষা ও সমাজসংস্কার

হাসনান আহমেদ

স্বত্ব

লেখক

প্রথম প্রকাশ

জুলাই ২০২৫

প্রকাশক

প্রকৃতি

১১৪-১৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম

২৫৩-২৫৪ ড. কুদরাত-ই-খুদা সড়ক, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫

ফোন: ০১৭২৭৩২৮৭২৩, ই-মেইল: Prokriti.book@gmail.com

প্রচ্ছদ

হাসনান আহমেদ

অলংকরণ

মোঃ নাজমুল আলম (বুলবুল)

মুদ্রণ

লিংক ভিশন

মিরপুর, ঢাকা

linkvision.bd@gmail.com

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৪৪৪-০৪০-১

মূল্য: ৩০০.০০ টাকা

Samajik Shiksha O Samajsanskar by Hasnan Ahmed
Published by Prokriti, Dhaka, July 2025
Price: Tk. 300.00

উৎসর্গ

সভাপতি, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
জ্ঞানজ্যেষ্ঠ শিক্ষাবিদ
দর্শনাচার্য প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান
শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার কথা

পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধের কথা বলছিলাম। আমাদের সমাজ থেকে সামাজিক শিক্ষা ও জনসেবা পুরোপুরি উঠে গেছে বললে অত্যুক্তি হবে না, এজন্য আমাদের এ পরিণতি। তাই সমাজসেবক ও উদ্যোগী স্বভাবের মানুষগুলোর উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়ানোর জন্য এবং সমাজ থেকে হারিয়ে যাওয়া কাজগুলোকে একটা ব্যবস্থার মাধ্যমে ফিরিয়ে আনতে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস– এ বিষয়কে আশ্রয় করে বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যবহুল কথা নিবন্ধে লিখতে হয়েছে। কোনো কোনো নিবন্ধ এদেশে প্রয়োগযোগ্য মডেল, যার বাস্তবতা পরীক্ষা করা হয়েছে। দেশ ও জাতীয় উন্নয়নে সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের এ মডেল ও আলোচনা অধিক ফলপ্রসূ হবে বলে আমার বিশ্বাস। বিভিন্ন জাতীয় সেমিনারে কোনো কোনো নিবন্ধ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে।

লেখালেখি আমার নেশা। আমার চিন্তা-চেতনা প্রকাশের মাধ্যম। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকেই কবিতা লেখার মধ্য দিয়ে আমার লেখালেখির হাতেখড়ি। কয়েকটা কবিতার বই, কাব্যগ্রন্থ, ছোটগল্প ও তিন-চারটে নিবন্ধ তখন আমার ভাণ্ডারে মজুদ; প্রকাশের অপেক্ষায়। জীবন চলার খরস্রোতে ভেসে লেখাগুলো দিনে দিনে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আবার লেখালেখি শুরু করলাম। ২০২২ সাল থেকে নিবন্ধ লিখে পত্রিকায় প্রকাশ করার উদ্যোগ নিলাম। আমার কলামের শিরোনাম 'শিক্ষা সমাজ দেশ'। এই শিরোনামে 'শিক্ষার ভিত্তিমূল ও মানবসম্পদ গঠন' নামে একটি কলামভিত্তিক বই ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। এ বইটি পত্রিকায় প্রকাশিত আমার কলামবিশেষের দ্বিতীয় সংকলন, যাকে 'সামাজিক শিক্ষা ও সমাজসংস্কার' নাম দিয়েছি। এমন কলামভিত্তিক আরো কয়েকটা বই প্রকাশের আশা আছে। লেখাগুলো এলোমেলোভাবে না সাজিয়ে মোটামুটি শিরোনামের প্রসঙ্গ অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। 'শিক্ষা, সমাজ ও দেশ' প্রসঙ্গ একটা অন্যটার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত হওয়ায় একটা থেকে অন্যটাকে আলাদা করা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি।

সব পাঠক একই পত্রিকা পড়েন না, পছন্দ অনুযায়ী পত্রিকা পড়েন। ফলে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রতিদিন প্রকাশিত অগণিত নিবন্ধ অলক্ষ্যে রয়ে যায়। আমি পাঠকসমাজের সুবিধার্থে এবং দিনে দিনে প্রকাশিত আমার লেখা নিবন্ধগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে একদিন কালের আবর্তে হারিয়ে যাবে ভেবে যথাসম্ভব বিষয়ভিত্তিতে বই আকারে একত্র করেছি মাত্র। এতে অনেক কথা ও ভাবের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। আমার বিশ্বাস, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার ভাবনাচিন্তা ও

পথনির্দেশিকা উন্নত দেশ গঠনের পথিকার ও যুগোপযোগী হবে; পাঠকসমাজের অনুসন্ধিৎসু মনের ক্ষুধা যথাসম্ভব তৃপ্ত করবে; চিন্তাশ্রয়ী গবেষক ও অনাগতদের পথ দেখাবে।

অধিকাংশ লেখা দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত। এজন্য দৈনিক যুগান্তর কর্তৃপক্ষের কাছে এবং বিশেষভাবে সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। উল্লেখ্য, পত্রিকা অফিসের বিবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে একটা লেখার সব অংশ তাদের পক্ষে সব সময় প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। একটা কারণ আমি নিজে অবহিত। আমার লেখার ভাষা কাকের কণ্ঠস্বরকেও হার মানায়। অঙ্কের শিক্ষক হওয়ায় শ্যাম ও কুল বজায় রেখে, ভারসাম্য রক্ষা করে লিখতে পারিনে, যা বুঝি সোজাসুজি প্রকাশ করে ফেলি। এটা আমার লেখার অকপটতা ও সীমাবদ্ধতা। এতে অনেকের বিরক্তি ও ক্ষোভের কারণ ঘটায়। লেখনীর মতো ধারালো অস্ত্র আর কীই-বা আছে! সেজন্য এবং অন্য আরো কারণে কখনো পত্রিকা অফিস কিছু কেটেছেঁটে বাদ দিয়ে প্রকাশ করেছে। এখানে প্রকাশিত নিবন্ধগুলো পত্রিকা অফিসে আমি যেভাবে পাঠিয়েছিলাম, পুরোটাই তেমন অশোধিত-অসম্পাদিত অবস্থায় প্রকাশিত হলো। বানানেও অনেক ভুলচুক রয়ে গেল। অনুসন্ধিৎসু পাঠকসমাজ বিষয়টা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। নিবন্ধগুলো এদেশের শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতির প্রকৃতি ও দেশ নিয়ে লেখা; প্রতিটাই চিন্তা-উদ্রেককারী। এগুলো পড়লে কেউ আমার 'পথরেখা'র সন্ধান পাবেন ও আমার পরিচয় পাবেন বলে আমার বিশ্বাস। তবে আমার 'পথরেখা'র পুরো সন্ধান পেতে আমার লেখা কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ পড়তে হবে ও অভিমুখিতা বুঝতে হবে।

পাঠকসমাজে আমার লেখার কিছু ভক্তও আছেন, যাদের অনেকে আমার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করেন। প্রতিনিয়ত তাদের দেওয়া গঠনমূলক পরামর্শের কারণে আমি তাদের কাছে ঋণী। ভক্ত পাঠকসমাজের আশা পূরণ হলে এবং লেখার উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ হলেই আমি খুশি। আমার লেখায় সমাজ, দেশ ও জাতি বিশেষভাবে উপকৃত হলে আমি নিজেকে সার্থক মনে করবো।

ঢাকা, জুলাই ২০২৫

হাসনান আহমেদ

শিক্ষা সমাজ দেশ

সামাজিক শিক্ষা
ও
সমাজসংস্কার

সূচিপত্র

- এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে ১১
- কেন 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' ১৬
- গোড়ায় গলদ রেখে ভালো হওয়া যায় কী? ২১
- সামাজিক শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নে ধর্মকর্ম ২৪
- সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে যারা অবদান রাখতে পারেন ২৯
- শিক্ষা ও উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে তবলিগ জামাত ৩৪
- 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে' ৩৮
- দেশ মেরামতের কাজে আমরা এগিয়ে আসতে পারি ৪২
- 'পড়েছি যবনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে' ৪৭
- 'যার জন্য যা, তাতেই খেল তা' ৫২
- সুস্থ চিন্তা ও কর্মই উন্নতির একমাত্র পথ ৫৭
- দুর্নীতির বহুমাত্রিকতা রোধ করবে কে? ৬২
- এদেশের রাজনীতি– আত্মজিজ্ঞাসা ও বিবেকবোধ ৬৭
- 'আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা' ৭২
- 'সেওনা কাজেরো কী-না হলো হে?' ৭৭
- এ সহিংসতার জন্য কি রাজনীতিকরাই দায়ী নন? ৮১
- অবচয় ও অপচয় ৮৫
- 'ও মুর্শিদ পথ দেখাইয়া দাও, আমি যে পথ চিনিনা গো...' ৯০
- মুক্তির পথের অ্যারো চিহ্ন কে দেখাবে? ৯৫
- 'পিপীলিকার পাখা গজায় মরিবার তরে' ৯৯
- 'আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে' ১০৪
- অশুভ চর্বিতচর্বণ আর কতদিন প্রয়োজন হবে? ১০৯
- ধার্মিকতা ও কপটচারিতা– এদেশে যে কথাগুলো বলাও বিপজ্জনক ১১৪

- বারবার ঠিকানা খুঁজে ফিরি ১১৯
- রাজনীতির পচা দুর্গন্ধে পথ চলা দায় ১২৪
- প্রকৃতির প্রতিশোধ বড্ড নির্মম ১২৯
- ক্যান্সার চিকিৎসায় প্যারাসিটামলের ব্যবহার! ১৩৪
- ‘কতদূরে আর নিয়ে যাবে বলো কোথায় পথের প্রান্ত’ ১৩৯
- আগে প্রয়োজন রাষ্ট্র ও সমাজ সংস্কার ১৪৪
- বিকারগ্রস্ত রাজনীতির কবলে মানুষ-সমাজ-দেশ ১৪৯
- ‘যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য বই...’ ১৫৪
- বর্তমান অবস্থার সোজাসাপটা ফয়সালা ১৫৯
- আসুন সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী ও কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ি ১৬৪
- রাজার দৃষ্টি উপেনের দুই বিঘা জমির ওপর ১৬৯
- মানসিকতার উন্নতি ছাড়া দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নতি সুদূরপরাহত ১৭৪
- ‘শত্রু তুমি বন্ধু তুমি, তুমি আমার সাধনা’ ১৭৯
- দেশবাসীকে সত্য ইতিহাস জানানোর উদ্যোগ নিতে হবে ১৮৪
- সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষা ১৮৯
- অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ– পরিচিতি ১৯৫

এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে

অনেক অভিযোগের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ হলো– সুযোগ পেলেই বাতাস না বুঝে দু-কলম ঠুকে বসি। এতে আমার অজান্তেই প্রতিপক্ষ তৈরি হয়। 'আনাঙলা মাস্টারসাহেবের' এ এক দোষ! এ দেশের বাতাসের অনুকূলে কথা বলতে জানে না! আসলে অভিযোগটা সত্য। তবে আমার এ ঠোকাঠুকি কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা রাজনৈতিক দলাদলির বিষয়ে নয়। কখনো কান টানলে মাথা এসে যায়। এটা অনিচ্ছাকৃত। কান ও মাথা সংযুক্ত, তাই। এ সমাজের শাশ্বত মাস্টারসাহেবদের একজন চুনোপুটি হিসেবে এদেশের সমাজব্যবস্থাপনা, নিয়ম-নীতি, পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা, জনগোষ্ঠীর মন-মানসিকতা ও কর্ম নিয়ে দেশ ও সমাজের মঙ্গলের জন্য আমার বিবেচনায় যেটাকে ভালো মনে করি, তা জনসমক্ষে প্রকাশ করার চেষ্টা করি। এটা একজন মাস্টারসাহেবের সামাজিক দায়িত্বও বলা যায়।

আমরা যত কথাই বলি, একটা বিষয় আমাদেরকে মানতেই হবে যে, এদেশে সুস্থ সামাজিক বিকাশ নেই; সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ধস নেমেছে। মানবিক মূল্যবোধ, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, দেশপ্রেম সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে। জনগোষ্ঠী জন-আপদে পরিণত হয়েছে, জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনায় মনুষ্যত্বহীনতার অশরীরী আত্মা ভর করেছে। এসবই অনভিপ্রেত। এতে এ জাতি পথ হারাবে। সময়ের অনিবার স্রোতে গা ভাসিয়ে সামনের দিকে চলতে থাকলেও পরিণতি শুভ নয়। প্রতিটি সুশিক্ষিত দেশ-সচেতন ব্যক্তিই তা ভালো করে বোঝেন। তাই কথা না-বলে পারা যায় না। এ দেশের মানবগোষ্ঠীকে সুশিক্ষিত ও জনসম্পদরূপে গড়ে তোলার কথা তো সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই বলা হচ্ছে। কিন্তু নগদ হাতে কত? জনসম্পদ ও জাতীয় উৎকর্ষ-বিরুদ্ধ এসব অপচর্চা, অপশিক্ষা ও অপমানসিকতা থেকে পরিত্রাণের অগত্যা মধুসূদন হিসেবে একটা পথের রূপরেখা সংক্ষিপ্ত পরিসরে এভাবে হতে পারে:

আমাদের সমাজে ভালো-মন্দ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের বসবাস। সুশিক্ষিত লোকগুলো সমাজের কোনো কাজে আর সম্পৃক্ত হতে চান না। এদেরকে বেছে আলাদা করে পরিবেশ দিয়ে কাজে লাগাতে হবে। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই প্রতিটা দেশে সমাজসেবক আছেন। সমাজ উন্নয়নে যুগে যুগে তারা কাজ করে যাচ্ছেন। এদের অনেকেই আছেন– নিঃস্বার্থভাবে সমাজসেবা করতে চান। দেশব্যাপী প্রতিটি এলাকায় ক্রমশ 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' গঠন করতে হবে। 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' একটি স্বশাসিত, অরাজনৈতিক, অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী, সেবাদানকারী সমাজ-সংগঠন হিসেবে কাজ করবে। প্রতিটা সদস্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অহিংস মনোভাবে বিশ্বাসী হবেন। প্রতিটা সদস্যের রাজনৈতিক দলের প্রতি পরোক্ষ সমর্থন থাকতেও পারে, তবে তারা

প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ নেবেন না। সমাজসেবার মাধ্যমে ত্যাগের মহিমায় তারা মর্যাদাপ্রাপ্ত হবেন। শিক্ষা-সেবা সমাজের সব কার্যক্রম ক্ষমতাভিত্তিক ও কর্তৃত্ববাদী না হয়ে পরামর্শমূলক হবে। প্রতিটা কাজের মধ্যে শিক্ষা ও আদর্শ ফুটে উঠতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষের সাথে সংগঠনের বিশ্বস্ততার সম্পর্ক গড়ে ওঠে; সমাজের সাধারণ মানুষ সংগঠনের সদস্যদেরকে শ্রদ্ধা ও অনুসরণ করে। এ দেশের স্থানীয় সরকার গঠনের উদ্দেশ্যও তো মূলত এরকমই ছিল, যা এখন দিকভ্রষ্ট হয়ে গেছে। 'মহান রাজনীতিবিদ'দের কৃতকর্মের সে কাসুন্দি এখানে আর না ঘাটি।

'শিক্ষা-সেবা সমাজ' গঠন মূলত সমাজের অশিক্ষিত, নিরক্ষর, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে শিক্ষাহীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে উন্নতি ও উৎকৃষ্টতার পথে নিয়ে যাবার একটা সম্মিলিত প্রচেষ্টা, শিক্ষার মান বাড়ানো, সমাজশিক্ষার ব্যবস্থা করা। 'শিক্ষা-সেবা সমাজ'-এর আওতা হবে তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার পরিবার বা তার কিছু বেশি-কম। প্রত্যেক পরিবারকে একটা একক হিসেবে গণ্য করা হবে। প্রথমত এক বা একাধিক সমাজসেবক উদ্যোগ নিয়ে সমাজের মধ্য থেকে এগারো থেকে সতেরো সদস্যবিশিষ্ট একটা 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' গঠন করবেন। সদস্যদেরকে 'সোসাইটি কাউন্সিলর' বলা হবে। প্রথমে কাউন্সিলরের সংখ্যা কম হলেও সমস্যা নেই। কিন্তু কোনো অশিক্ষিত, খারাপ চরিত্রের মানুষ যেন কাউন্সিলে না ঢুকে পড়ে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। শুধু স্বার্থত্যাগী সমাজসেবকদের জায়গা দিতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলরদের মতামতের ভিত্তিতে তাদের মধ্য থেকে একজন 'প্রধান সোসাইটি কাউন্সিলর' নির্বাচিত হবেন। একজন সেক্রেটারি ও একজন ক্যাশিয়ারও নির্বাচিত হবেন। প্রতিটা পদ হবে পালাক্রমে বা পর্যায়ক্রমে। একজন কাউন্সিলর প্রধান সোসাইটি কাউন্সিলর না হয়েও নিজ উদ্যোগে অন্য কাউন্সিলরদের সাথে নিয়ে সমাজের কাজ করতে পারবেন। এখানে পদের তুলনায় কর্মোদ্যোগ ও কাজ প্রাধান্য পাবে। কাউন্সিলের সভায় সমাজ থেকে (সমাজের আওতা বুঝে) পঞ্চাশোর্ধ্ব সমাজ-সদস্য নিয়ে একটি ওয়ার্কিং কমিটি থাকবে। কাউন্সিল কথা, কাজে ও চিন্তায় গ্রামীণ দলাদলি, ক্ষুদ্র-মানসিকতা, ব্যক্তি-স্বার্থ, পারস্পরিক প্রতিহিংসা, গ্রুপিংয়ের উর্ধ্বে উঠে 'শিক্ষা-সেবা সমাজ'-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট হবেন।

শিক্ষা-সেবা সমাজের উদ্দেশ্য হবে মোটামুটি এরকম: **১.** সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ। সাধারণ মানুষকে জনে জনে সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে সুস্থ চিন্তাধারার বিকাশসাধন করা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সম্মিলনে শিক্ষার জন্য ত্রি-পক্ষীয় সম্পর্ক গড়ে তোলা। প্রতিটা পক্ষকেই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বুঝিয়ে বলা। বিশেষভাবে অভিভাবকমহলকে তাদের সন্তানদের ব্যাপারে শিক্ষা ও শিক্ষার মান নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো। তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে উচ্চশিক্ষা বা টেকনিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত করতে বলা।

স্কুল-মাদ্রাসাগুলোতে 'ফুল-টাইম স্কুলিং' ব্যবস্থার দিকে ক্রমশ নিয়ে যাওয়া। শিক্ষক ও অভিভাবকমহলকে বুঝিয়ে শিক্ষায় সততা, মানবিক মূল্যবোধ ও আদর্শ ফিরিয়ে আনা। সমাজের মানুষকে জনে জনে শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও সুশিক্ষা বেগবান করা। ছাত্রছাত্রীদের স্কুল-মাদ্রাসা থেকে ঝরে যাওয়া বন্ধ করা। স্কুল-মাদ্রাসার অবকাঠামো ব্যবহার করে অভিভাবকদের ও সাধারণ মানুষের জন্য সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা। তাদেরকে সুপ্রশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত করা। শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হওয়া। জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা। সামাজিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা। সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করা। ২. স্কুল-মাদ্রাসার অবকাঠামো ব্যবহার করে নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে সমাজের মানুষের সামাজিক স্বাস্থ্য-সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা। ৩. গরিব, নিঃস্ব, পীড়িত, অসহায় ও মেহনতি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আর্ত-মানবতার সেবায় আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা। শেণিভেদে, বিশেষ করে নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের মাধ্যমে সুদবিহীন স্বল্পকিস্তিভিত্তিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা (ব্যক্তির আয়-রোজগার সৃষ্টিকারী সম্পদ তৈরি করে দেওয়া)। আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে মানুষকে কর্মমুখী করে গড়ে তোলা। ৪. 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' সমাজের সচ্ছল সদস্যদের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ করে তাদেরকে দিয়ে এক বা একাধিক কৃষিভিত্তিক প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি গঠন করার পরামর্শক হিসেবে কাজ করা। কোম্পানিতে কর্মরত কর্মচারী-কর্মকর্তাদের কাজে মনোযোগী হওয়া ও উৎসাহ দেওয়ার জন্য কোম্পানির বাৎসরিক লাভের দশ শতাংশ তাদের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা রাখতে পারে। এছাড়া কোম্পানি লাভের আরো দশ শতাংশ 'কর্পোরেট সোস্যাল রেস্পনসিবিলিটি'র জন্য 'শিক্ষা-সেবা সমাজ উন্নয়ন ফান্ড'-এ অবদান রাখবে। শিক্ষা-সেবা সমাজ এ ফান্ড ও অন্য আরো ফান্ড ব্যবহার করে সমাজ-উন্নয়নমূলক, আর্থিক সহায়তা প্রদান ও সেবাধর্মী কাজ করবে।

বর্তমানে ড্রাগ-এবিউজ সমাজে টিন-এজারদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করেছে। 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' শিক্ষক ও অভিভাবকদের এ বিষয়ে সচেতন করবে। প্রয়োজনে শিক্ষক-অভিভাবকদের সাথে নিয়ে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করবে। আমরা জানি, সমাজে, অফিস-আদালতে সুশিক্ষিত লোকের পদচারণা বাড়লে দুর্নীতি কমবে, সুনীতি বাড়বে। সুস্থ-চিন্তাশীল সুশিক্ষিত লোক ক্রমশ জনপ্রতিনিধি হতে এগিয়ে আসবেন। চেষ্টা না-করলে সমাজ, অফিস-আদালত দুর্নীতিমুক্ত, অপব্যবস্থাপনামুক্ত কোনোদিনই হবে না। এ দেশের সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সময়ের প্রয়োজনে দেশরক্ষার স্বার্থে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে হবে।

কাউন্সিলরদের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে, তাদের আওতাধীন বিভিন্ন মসজিদ-মাদ্রাসায় নিয়মিত যাওয়া। সেখানে কর্মরত মৌলবি-মাওলানাদের সাথে সমাজ উন্নয়নের

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। মৌলবি-মাওলানারা না-বুঝে তাদের অজান্তেই অকপটে কোমলমতি মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সযত্নে বেকার, অর্ধবেকার, ছদ্মবেকার, অকর্মণ্য, সৃষ্টি ও দুনিয়ার কাজে অযোগ্য করে খোদাভক্ত মুসলমান তৈরি করছে। কাউন্সিলরদের কাজ হচ্ছে, স্থানীয় সব মাদ্রাসায় জীবনমুখী, কর্মমুখী ও জীবনের উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষা চালু করার জন্য অনুরোধ করা। ছাত্রছাত্রীরা যেন বিজ্ঞান ও ব্যবসামুখী শিক্ষা নিয়ে কিংবা কারিগরি শিক্ষা নিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে সে কথা বুঝিয়ে বলা। কুরআন ও হাদিস শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন অফিসে চাকরিতে তারা সততা ও নিষ্ঠার সাথে দেশবাসীকে ভালো সেবা দিতে পারবে এবং এর বিনিময়ে হালাল রুজি রোজগার করতে পারবে। এছাড়া জনসেবার মাধ্যমে পরকালের মুক্তি নিশ্চিত হবে। দেশবাসীও অফিসের ভালো সেবা পাবে, ঘুষ-দুর্নীতি থেকে দূরে থাকতে পারবে, ভোগান্তি দূর হবে। ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ব্যবসা করলে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবে। উপার্জিত টাকা থেকে গরিব-অভাবীদের দান-খয়রাত করতে পারবে। ব্যবসাতে যদি ধার্মিক, চরিত্রবান, সৎ লোক চলে আসে, সাধারণ মানুষ যার-পর-নাই উপকৃত হবে। ওজনে কম নিতে হবে না, ভেজাল জিনিস খেতে হবে না, ব্যবসায়ীদের থেকে প্রতারিত হতে হবে না। কালোবাজারি, মজুতদারি, সিন্ডিকেটের হাত থেকে মানুষ রক্ষা পাবে। মৌলবি-মাওলানাদের আরো বলতে হবে, ধর্মকে পেশা বানানো ঠিক না; প্রতিটা মুসলমানেরই ধর্মের পাশাপাশি একটা কর্মের পেশা থাকা জরুরি।

কাউন্সিলররা প্রতিটি মসজিদের ইমামকে অনুরোধ করতে পারেন নামাজের দিন খুৎবা দেয়ার আগে বাংলাতে বক্তৃতা দেওয়ার সময় মুসলমানের বৈশিষ্ট্য কী হওয়া উচিত, প্রতিহিংসার পরিণতি, অজ্ঞতার পরিণতি, স্বাস্থ্যশিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখার গুরুত্ব, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব, মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য, প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব, গরিব-দুঃখীকে দানের সাওয়াব, সমাজসেবা সম্বন্ধে কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা, সমাজসেবকের ইহকাল ও পরোকালের প্রাপ্তি, দুনিয়ার সমস্ত ন্যায়-কাজ ও পেশাগত সমস্ত কাজও ইবাদতের অংশ ইত্যাদি বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী করে বক্তৃতা দিতে। মসজিদের ইমামকেও সমাজসেবার জন্য কাউন্সিলর হিসেবে সাথে নিতে পারেন।

'শিক্ষা-সেবা সমাজ' মাঝে-মধ্যেই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে সমাজের প্রতিটা লোককে স্বাস্থ্যশিক্ষা দেবে। স্বাস্থ্যসচেতন করে তুলবে। স্বাস্থ্যসেবা দেবে। শিক্ষা-সেবা সমাজকে নিজ এলাকায় একটি শিক্ষা-সেবা ক্লিনিক ও একটা কমিউনিটি পাঠাগার তৈরি করবে। স্বাস্থ্যশিক্ষার জন্য সেমিনার, হাতে-কলমে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে। সার্বিক বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সাহায্য-সহযোগিতা নেবে। কাউন্সিলররা উপজেলা বা জেলার কোনো মানবহিতৈষী এক বা একাধিক ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, যিনি বা যারা সপ্তাহে এককে

দিন ক্লিনিকে এসে বিনা ফিতে বা নামমাত্র ফিতে রোগী দেখবেন। এতে সাধারণ মানুষ যারপরনাই উপকৃত হবে।

'শিক্ষা-সেবা সমাজ'-এর প্রত্যেক সদস্য এককভাবে দেশের প্রচলিত আইনের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। অভিজ্ঞতা থেকে বলতে গেলে, সমাজে এক শ্রেণির লোক আছে, যাদের পুরো মগজটাই কুটিল বুদ্ধি ও বিকৃত চিন্তায় ভরা। এরা সমাজের ভালো কাজের উদ্দেশ্য বোঝে না বা বুঝতে চায় না, অথচ মাতব্বরিটা করতে চায়। গ্রুপিং, অন্তকলহ, দলবাজি, আত্মস্বার্থে মত্ত থাকে। শিক্ষা-সেবা সমাজ গঠনে এদেরকে এড়িয়ে যাওয়া ভালো। সমাজে এই শ্রেণি ছাড়া সহজ-সরল, ভালো মানুষের সংখ্যাই বেশি। সমাজের উন্নত চিন্তার অধিকারী, দানশীল, মানবহিতৈষী, উদার মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ নিয়ে 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' গঠন করতে হবে।

শিক্ষা-সেবা সমাজ তাদের অফিসিয়াল কাজকর্ম পরিচালনার জন্য ও নিয়মিত সকাল-সন্ধ্যায় কাউন্সিলর ও সাধারণ সদস্যরা বসার জন্য সমাজের আওতাধীন কোনো একটা সুবিধাজনক জায়গায় অফিস রুম তৈরি করে নিতে পারেন।

দেশব্যাপী শিক্ষা-সেবা সমাজ পরিচালনা ও নীতি নির্ধারণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম থাকবে। এ প্লাটফর্ম স্বীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে শুধু জনগোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষা, জনসেবা এবং সমাজ উন্নয়নের আদর্শকে কাজে ও কর্মে ধারণ করে প্লাটফর্মের নীতিমালা নির্ধারণ করবে, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও জেলা-প্রশাসকের সহায়তা নেবে, অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করবে এবং সে-মতো কর্মসূচি গ্রহণ করবে। জেলা প্রশাসন সমাজের উন্নয়নমূলক সকল কাজে অংশ নেবে এবং কো-অর্ডিনেশনের ভূমিকা পালন করবে। এ প্লাটফর্ম শিক্ষা ও সেবা কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেবে।

'শিক্ষা-সেবা সমাজের' পুরো কর্মকাণ্ডটাই হবে ব্যষ্টিক উন্নয়নের মডেল আকারে এবং সামাজিক উন্নয়নে মানবসম্পদ তৈরির প্রক্রিয়া হিসেবে। মানবসম্পদ উন্নয়ন তথা জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও মানসিকতার উন্নয়নও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুগামী একটা সহায়ক উপাদান। এসব বিষয় নিয়ে আরো অনেক কথা বারান্তরে বলার আশা রাখি।

(প্রকাশ: ১১ ডিসেম্বর ২০২২, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ– প্রফেসর, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক।
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

কেন 'জাতীয় শিক্ষা–সেবা পরিষদ'

বিগত ১১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে 'এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে' শিরোনামে প্রকাশিত কলামের ধারাবাহিকতায় সামনে এগোতে চাই। আমাদের দেশের শিক্ষা অন্য আরো অনেক দেশের শিক্ষার তুলনায় নিম্নমানের, না উচ্চমানের তা তুলনা না করেও বলা যায়, শিক্ষার মান ও পরিবেশের সঙ্কট এ দেশে বিদ্যমান। শিক্ষা পৃথিবীতে কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের অধিকতর টিকে থাকার অবলম্বন। সেজন্য শিক্ষার উন্নয়ন নিয়ে অন্য কোনো বিষয়ের সাথে আপস করা কোনোক্রমেই উচিত নয়। শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা (হিকমাত/জ্ঞান-বিজ্ঞান) অর্জিত হয়। অর্জিত জ্ঞান বা প্রজ্ঞা আমরা বাস্তবে প্রয়োগ করে জীবন ও কর্ম নির্বাহ করি। জ্ঞান আমাদেরকে পরিবার, সমাজ ও জাতির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম করে। জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

কার্যত আমাদের দেশে শিক্ষার মান ক্রমশই নীচে নেমে যাচ্ছে। শিক্ষা থেকে ধর্মীয় মূল্যবোধ, সততা, মানবিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, দেশপ্রেম, ন্যায়নিষ্ঠার মতো মানবিক গুণাবলি হারিয়ে যাচ্ছে। একটা পক্ষ শিক্ষা থেকে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষাকে বিযুক্ত করেছে; উচ্চশিক্ষা হারিয়েছে; টেকনিক্যাল শিক্ষার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থাকে খণ্ডিত শিক্ষায় পরিণত করেছে। এভাবে জাতি হিসেবে আমরা ক্রমশই দুর্বল ও হারিয়ে যেতে বসেছি। আবার শিক্ষা ও পরিবেশের অভাবে আমাদের সমাজে অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি, হিংসা-বিদ্বেষ, বিশৃঙ্খলা, সামাজিক আয়-বৈষম্য ক্রমশই বাড়ছে এবং ইতোমধ্যেই সহনশীলতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। এমন বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে এই অবাঞ্ছিত স্রোতধারার প্রতিকূলে দাঁড়াতে গেলে একটি অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠনের ভূমিকা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের শুভাকাঙ্ক্ষী শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবীসহ শিক্ষিতসমাজ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে একজোট হবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এভাবে জোটবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবী সমাজ-সংগঠনের নাম হতে পারে 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' (জাশিপ)।

সরকারি পর্যায়ে প্রণীত পরিকল্পনা, নীতিনির্ধারণ প্রভৃতি বিষয় বাস্তবায়নে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এদেশে জাতীয় উন্নয়নে এটাও একটা বড় সমস্যা। এ প্ল্যাটফর্ম সরকারের শিক্ষা ও সমাজসেবার নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও কর্মকৌশল নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

জাশিপ এ দেশের মানুষকে সুশিক্ষিত করা, শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সামাজিক শিক্ষা, শিক্ষা ও সেবা সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারণ, সমাজসেবা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে জাতীয় প্ল্যাটফরম হিসেবে কাজ করবে। জাশিপ ও 'শিক্ষা-সেবা সমাজের' কেন্দ্রীয় কার্যক্রম এ পরিষদ পরিচালনা করবে। এ পরিষদ আদর্শ ও মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটা অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও স্বেচ্ছাসেবী প্লাটফরম। এ পরিষদ এ দেশের বিদ্যমান রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে স্বীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে শুধু জনগোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষা, সেবা এবং সমাজ উন্নয়নের আদর্শকে কাজে ও কর্মে ধারণ করে পরিষদের নীতিমালা নির্ধারণ করবে এবং সে মতো কর্মসূচি গ্রহণ করবে। এ কর্মসূচির পুরোটাই জনকল্যাণ ও সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে রচিত, তাই এর বাস্তবায়নে পরিষদ প্রয়োজনানুযায়ী জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের সাহায্য-সহযোগিতা অবশ্যই নেবে। এ পরিষদ সমাজের মানুষের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা ও আর্থিক-সেবা বিষয়ে সমাজ সচেতনতা বাড়াবে, করণীয় করবে এবং শিক্ষা ও সেবা কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেবে। জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের একটা গঠনতন্ত্র থাকবে। জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের কার্যাবলি হবে এরকম:

১. এ দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে কাজ করা। জনে জনে শিক্ষার ব্যবস্থা করা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা; তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় জীবনমুখী শিক্ষা, যেমন– ব্যবহারিক জীবন পরিচালনা করতে শেখা, স্বাস্থ্যবিধি শেখা, ভালো থেকে মন্দকে পৃথক করতে শেখা, ঘটনা বিশ্লেষণ করতে শেখা, সমস্যার সমাধান করতে শেখা, ভাবনা-চিন্তা করতে শেখা, সামাজিকতা ও পরিবেশ বিষয়ে শেখা, বিভিন্ন সফট স্কিলস বিষয়ে শেখা ইত্যাদি; কর্মমুখী শিক্ষা, যেমন– পেশাগত শিক্ষা অর্জন, কারিগরি শিক্ষা অর্জন, প্রযুক্তিগত শিক্ষা অর্জন, প্রতিভার বিকাশ ইত্যাদি; এবং মানবিক গুণাবলি-জাগানিয়া শিক্ষা, যেমন– ধর্মীয় মূল্যবোধ, সততা, মানবিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, ন্যায়নিষ্ঠার মতো মানবিক গুণাবলির সম্মিলন ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা; সামাজিক শিক্ষার নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা।

২. দেশব্যাপী 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' পরিচালনা, তাদেরকে সমাজসেবার কাজে সহায়তা, সামাজিক শিক্ষা-সেবা কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা, সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কিং প্ল্যান তৈরি, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং স্বচ্ছতা,

জবাবদিহিতা ও নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন বিষয়ের নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সুষ্ঠু সমন্বয়সাধন এবং শিক্ষা-সেবা সমাজের কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফরম হিসেবে কাজ করা।

৩. দেশব্যাপী স্কুল, মাদ্রাসা নির্বিশেষে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ইন্টিগ্রেইটেড/ ইউনিফায়েড শিক্ষাপদ্ধতি চালু করা এবং সকল পর্যায়ে মানবিক-ব্যবসায়-বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীর সুবিধামতো উচ্চশিক্ষা কিংবা টেকনিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত হবার সুযোগ সৃষ্টি করা;

৪. এ দেশে শিক্ষা ও সেবার মান উন্নয়নে নীতিমালা ও জনসচেতনতা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স, গোলটেবিল আলোচনা প্রভৃতির আয়োজন করা, জনমত গঠন করা ও গণমাধ্যম ব্যবহার করে প্রকাশ ও প্রচার করা;

৫. শিক্ষা ও সেবার মান উন্নয়নে এবং জীবনমুখী, কর্মমুখী ও মানবিক গুণাবলি-জাগানিয়া শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সরকার ও যে কোনো সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে গঠনমূলক আলোচনা, শিক্ষানীতি তৈরিতে সরকারকে বা সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সহযোগিতা, শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা এবং শিক্ষা ও সমাজ-উন্নয়ন মূল্যায়ন প্রজেক্ট হাতে নেওয়া;

৬. দেশে শিক্ষা ও সেবার মান উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও গবেষণার কাজে আর্থিক সহায়তার জন্য শিক্ষা-সেবা পরিষদের সদস্য, কোনো সুহৃদ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সরকারের নির্দিষ্ট বিভাগ বা দাতা সংস্থার কাছ থেকে চাঁদা, দান, আর্থিক সাহায্য, এককালীন অনুদান, বাৎসরিক বরাদ্দ ইত্যাদি সংগ্রহের মাধ্যমে শিক্ষা-সেবা পরিষদের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা;

৭. দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 'শিক্ষা-সেবা সমাজ'-এর মাধ্যমে আগত ক্ষুদ্র শিল্প-উদ্যোক্তা, শিল্প/বাণিজ্য সংগঠকদের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা, তাদের গ্রাম ও অঞ্চলভিত্তিক শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনায় প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।

জাশিপ শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভাগ, মন্ত্রণালয়, কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এবং শিক্ষা-সেবা সমাজের মাধ্যমে অভিভাবকমহলকে শিক্ষা-সচেতন করে স্কুল/মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের শিক্ষা কার্যক্রমকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে প্রভাব সৃষ্টি করবে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের কাজের আওতা ও কাজের ধরনধারণ সময়ের গতিশীলতায় পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে সমাজজীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলবে।

জাশিপ পরিচালনা, নীতি নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটা 'নির্বাহী ও পরিচালনা পরিষদ' থাকবে। এ দেশের শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখতে ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে পরিষদের সাধারণ সদস্যদের তালিকা থাকবে। তারা পরিষদের 'সাধারণ সদস্য' বলে পরিচিত হবেন। সাধারণ সদস্য ছাড়াও 'ফেলো সদস্য' ও 'আজীবন সদস্য'দের তালিকা থাকবে, যারা সমাজের শিক্ষা ও সেবার কাজে আজীবন নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখবেন বলে ঘোষণা দেবেন। প্রতিটি 'শিক্ষা-সেবা সমাজের' 'প্রধান সোসাইটি কাউন্সিলর' পদাধিকারবলে জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের 'সোসাইটি কাউন্সিলর' হিসেবে থাকবেন। তিনি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা-সেবা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করবেন। জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের কার্যাবলির উন্নতিসাধন ও গঠনমূলক দিক-নির্দেশনার জন্য দেশের সম্মানিত ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে একটি 'বোর্ড অব অ্যাডভাইজারস' থাকবে। জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ তাঁদের অংশগ্রহণকে বিশেষভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখবে। জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের কার্যাবলিকে সুচারুরূপে সমাধা করার জন্য এবং মূল্যায়নের জন্য 'নির্বাহী ও পরিচালনা পরিষদ'-এর অধীন চারটি সেল থাকবে: ১. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সেল; ২.গবেষণা ও উদ্ভাবন সেল; ৩. মিডিয়া এ্যান্ড পাবলিক রিলেসন্স সেল; এবং ৪. তহবিল ব্যবস্থাপনা সেল। সেলগুলো পরিষদের সাথে একাট্টা হয়ে পরিষদের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করবে এবং কার্যাবলি মূল্যায়ন করবে। প্রত্যেক সেলের জন্য আলাদা পূর্ণাঙ্গ কমিটি থাকবে।

জাশিপ-এর গঠনতন্ত্রে পরিষদ গঠন ও পরিচালনা সম্পর্কিত বিভিন্ন নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে। জাশিপ-এর একটা যুতসই ও কার্যকর 'আর্থিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা' এবং 'ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা' থাকবে। পরিষদের অধীনে 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' এদেশের প্রত্যেক এলাকায় কাজ করবে।

সময়ের প্রয়োজনে আমাকে 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' ও 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' গঠনের ভাবনা ভাবতে হচ্ছে। এর বিকল্প অনেক কিছু আমি ভেবেছি; কিন্তু তুলনামূলক বিচারে দেশের পরিবেশ, পরিস্থিতি ও সমাজব্যবস্থার সাথে সেগুলো প্রায়োগিক, কার্যকর ও সময়োপযোগী হবে না বলে আমার বিশ্বাস জন্মেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানসম্মত শিক্ষা, পৃথিবীকে রক্ষা এবং মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ 'এসডিজি' বা 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়।

অপ্রিয় হলেও সত্য যে, আমাদের দেশের শিক্ষাহীনতা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অপরাজনীতি, অপশাসন, আইনের প্রয়োগহীনতা দেশ ও সমাজের জীবনীশক্তিকে

কুরে কুরে খেয়ে ক্রমশই খোলা বানিয়ে ফেলছে। অথচ বিষয়গুলো অলক্ষ্য ও অবিবেচনীয় রয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ-পরিস্থিতি ক্রমশই খারাপের দিকে ধেয়ে চলেছে। আবার জনগোষ্ঠীকে সুশিক্ষিত করতে না পারলে এ দেশের মুক্তি সুদূরপরাহত। যে কোনো মূল্যে এবং যে কোনো উপায়ে শিক্ষায় আদর্শ, নৈতিকতা, সততা ও মান ফিরিয়ে আনতে হবে। স্কুল-মাদ্রাসা ও কলেজ শিক্ষায় জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। সামাজিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উন্নয়ন করে জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। দুঃস্থ-অসহায়কে সরাসরি আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। পায়ে পায়ে অনেক দিন গড়িয়ে গেছে। সবকিছুর মধ্যে যেন রাজনীতির বিষবাষ্প না ঢুকতে পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এ দেশে এখনো গ্রামভিত্তিক জীবনব্যবস্থা বিদ্যমান। গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিচ্ছিন্ন কোনো অর্থ-সহায়তা কার্যক্রম ফলপ্রসূ হবে না। সুষম উন্নয়নের জন্য ব্যষ্টিক উন্নয়নের একটা টেকসই ভিত্তি তৈরি করা দরকার। সেজন্য শিক্ষা ও সামাজিক পরিবেশ উন্নীতকরণ, মানসিকতা ও জীবনমান উন্নয়নমুখী প্রশিক্ষণ, সফট স্কিল্‌স প্রশিক্ষণ, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এবং সুদমুক্ত আর্থিক সহায়তা অধিক উপযোগী। এসব বিবেচনায় 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' ও জাশিপ-এর কার্যক্রম সমাজ ও মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এছাড়া এ উন্নয়ন প্রক্রিয়া এসডিজি-১ (নো পোভার্টি), এসডিজি-৪ (গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ) এবং এসডিজি-৮ (শোভন কর্ম-সুযোগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন) বাস্তবায়নে অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। এজন্য এ দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের ও পদের শিক্ষা-সচেতন ব্যক্তিবর্গ, দেশের উন্নয়নে নিঃস্বার্থভাবে সামাজিক সেবা দেওয়াই যাদের লক্ষ্য হবে, 'শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে' জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ ও শিক্ষা- সেবা সমাজ গঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এ দেশের শিক্ষা ও সেবার মান উন্নয়নে তথা দেশ গঠনে সময়োপযোগী গঠনমূলক ভূমিকা রাখবেন বলে আমি আশাবাদী।

(প্রকাশ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২২, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ– প্রফেসর, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

গোড়ায় গলদ রেখে ভালো হওয়া যায় কী?

বিজয়ের আরেকটা মাস শেষ হতে চলেছে। এভাবে একান্নটা বিজয় দিবস আমরা পেরিয়ে এলাম। কী পেয়েছি, কী পাইনি সে হিসেব কষতে গেলে অনেক কথা। যুক্তি-তর্ক আছে। সেদিকে যেতে চাচ্ছিনে। বলা যায়, স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে স্বাধীন নির্মল বাতাস বুক ভরে নিতে পারছি, এটাই অনেক আনন্দ। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত অনেক অবকাঠামোগত উন্নতি হয়েছে। জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। দেশ মধ্যম আয়ের কাতারে নাম লিখিয়েছে, সবই বাস্তবতা। আয়-বৈষম্যও অনেক বেড়েছে। অনেক ভালো ভালো কথা বলতে পারবো। ভালো কথা লিখতে পারলে এক পক্ষ ভালো বলে। মন্দ কথা লিখতে পারলে অন্য পক্ষ বাহবা দেয়। এই ভালো বলা না-বলাই কি আসলে সব! একান্ন বছর পর আমরা এই দোষাদোষীর মধ্যে পড়ে আছি কেন? এই-যে আমাদের পাশের গ্রামের নিতান্ত গরিবের কলেজপড়ুয়া ছেলের দুটো কিডনিই নষ্ট হয়ে গেছে, প্রতিস্থাপন করা লাগবে, কিডনি হাসপাতালের বেডে শুয়ে হতাশা ও টাকার অভাবে হাউমাউ করে কাঁদছে। আজ বিকালে তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কোনো ভাষা আমার ছিল না। তাকে কী জবাব দেবো! কোনো উত্তর খুঁজে পেলাম না। দোষটা কি তার, না কি আমার? এই ছেলেটার পূর্বপুরুষ যে মুক্তিযোদ্ধাদের একজন নিকটতম সহযোগী ছিলেন, আমি নিজে দেখেছি। একাত্তরের বিজয়ের দিনে আমি তার বাঁধভাঙা বাঁধনহারা বিজয় উল্লাস দেখেছি। তার পরবর্তী বংশধরদের এ দশা কেন হলো? কেন এমন হলো? এসব নিয়ে ভাবতে গেলেই তো অনেক অনেক কথা মাথায় আসে। সব ব্যর্থতা, সফলতা বলা যায় না। বলতেও পারিনে, আবার লিখতেও পারিনে। যতটুকু লিখি তাতেও দোষাদোষীর মধ্যে থাকি। দৈনিক পত্রিকায় লেখা নিয়ে অনেকেই অনেক মন্তব্য করেন। সবারই একই প্রশ্ন, আমি কোন দল করি? যতই বলি 'বাংলাদেশ দল' করি। কেউ বুঝতে চায় না– কোনো দল করতেই হবে, তারপর পত্রিকায় লিখতে হবে, কেন? এ দেশের শাশ্বত মাস্টারের আবার কোনো দল করা লাগে না কি? মাস্টার সাহেবের আবার কোনো দল থাকা উচিতও না কি? এ-দেশ নিয়ে মাস্টারসাহেবের কি কোনো কথা থাকতে পারে না? রাজনৈতিক দলে নাম লেখাতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা আছে না কি? 'বিজয় দিবসে' কোনো দল ছিল না কি? শাশ্বত মাস্টারের নৈতিক মূল্যবোধ ও সত্য-ন্যায়ের কষ্টিপাথরে যাচাই করলে এ দেশের কোনো রাজনৈতিক দল ধোপে টিকবে না কি? হয়তো এমন কোনো দল থাকতেও পারে (যেহেতু দলের সংখ্যা অগনন), যার সম্বন্ধে আমার ভালো ধারণা নেই। অনেক শক্ত কথা লিখছি। বিজয়ের মাস বলেই হয়তো এসব

কথা লিখছি। এদেশের রাজনীতি হয়তো পথ ভুলে গেছে, সেজন্যই এতো গন্ধ শোঁকা। রাজনীতিকে আগে ভালো পথে আনতে হবে। আমার এসব চাঁছাছোলা কথা হয়তো অনেকের ভালো লাগে না। দেশে কিছু কিছু লোক তো থাকতেই হয়, যারা কাদার পাঁকে পড়তে চায় না, আবার খারাপ কথা লেখে। তাদের গায়ে দলীয় কাদার প্রলেপ না লাগানোই ভালো। তাদেরকে তাদের মতো শক্ত কথা লিখতে দেওয়াও ভালো। এ দেশে এটার বড় প্রয়োজন। দলকানা হলেই ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিচ্যুতি ঘটে।

কিডনি-বিকল রোগে আক্রান্ত ছেলেটাকে কিংবা তার পরিবারকে আমরা কি সময়মতো স্বাস্থ্যশিক্ষা দিতে পেরেছি? পরিবেশ দিতে পেরেছি? জনসাধারণের ভেজাল খাওয়া কি বন্ধ করতে পেরেছি? গলদটা কোথায়? আমরা দেশের অনেক উন্নতি করেছি। কিন্তু জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশকে 'জন-আপদ' বানিয়ে ফেলেছি। এ নিয়ে কি আমরা কেউ ভাবছি? এ দেশের লক্ষ লক্ষ লোক মরণঘাতী রোগে ভূগছে। হাসপাতালে গেলে বোঝা যায়। এর জন্য দায়ী কে? কান টানলে মাথা আসার মতো তখনই এ দেশের পথহারা রাজনীতির কথা চলে আসে। এ দেশের রাজনীতি সামাজিক শিক্ষা ও পরিবেশকে নষ্ট করে ছেড়েছে। এ কথা বললেই কেউ-না-কেউ আবার প্রশ্ন করে বসেন, 'কোন দল করেন? সাবধানে লেখেন, আপনি কিন্তু অমুক দলের কুনজরে পড়ে যাচ্ছেন!' হাল-ঢালহীন মাস্টারসাহেব তখনই বিপদে পড়ে যায়। আমি তো রাজনীতির স্বরগ্রাম জানিনে। জানিনে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলতে পারার কৌশল। এতে আমার জন্যও বিপদ, দেশের জন্যও বিপদ। এ দেশে অনেক সমস্যার মধ্যে রাজনীতি নিজেই একটা বড় সমস্যা ও বিপদ। এতে সাধারণ মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়। অথচ বোঝার কেউ থাকে না। এই সমস্যার সমাধান দরকার। বিজয়ের এ মাসে কি আমরা এ শপথ করতে পারিনে যে, আমরা সবাই মিলে এ দেশের রাজনীতিকে ভালো পথে চালাবো? মানুষের জন্য রাজনীতি, দেশসেবার জন্য রাজনীতি– একথা মেনে চলবো।

কয়েকদিন আগে বিএনপি তার 'রেইনবো-নেশন'-এর ধারণা প্রকাশ করেছে। অনেকে তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, পত্রিকার মাধ্যমেই শুনছি। বিরোধী পক্ষ অনেকভাবে সমালোচনা করছে। এ নিয়ে আমারও একটা কিছু বলার আছে। আমার মনে হয়, রাজনীতির কিছু পরিবর্তন জরুরি, এটা সত্য। কিন্তু গুণগত পরিবর্তন না করে শুধু কাঠামোগত পরিবর্তনে কি কাজ হবে? ছোটবেলায় রামপ্রসাদি গান শুনতে যেতাম। টানা সুর করে গাইতেন, 'মক্কা-কাশী-শ্রীবৃন্দাবন অকারণ ঘুরে ঘুরে মরণ, আগে নিজের স্বভাব সুন্দর কর, তারপর গুরুর চরণ ধর, মক্কা-কাশী...।' এই

‘স্বভাব সুন্দর করা’র বিকল্প তো আমি কিছু দেখিনে। স্বভাব সুন্দর করার একমাত্র উপায় হচ্ছে শিক্ষাদীক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পরিবেশ সুন্দর করা। পরিবেশ সুন্দরের মধ্যে আবার আইনের শাসন ও আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের কথা চলে আসে। এই সাতাশ দফার মধ্যে কি এ দেশের জনগোষ্ঠীর জন্য গুণগত ও মানসম্পন্ন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা-দীক্ষার কথাও বলা যেত না? নইলে যে ‘দিল্লি হনুজ দূরস্ত’ হবে।

গুণগত ও মানসম্মত শিক্ষা ছাড়া একটা জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি হয় কী করে? এই সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দৈন্যই তো আমাদের সব নষ্টের গোড়া। গোড়ায় গলদ রেখে রাজনীতি, অফিস-আদালত, সমাজনীতি, দেশনীতিই-বা ভালো হয়ে যাবে কী করে? গুণগত ও মানসম্মত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সামাজিক শিক্ষা ও পরিবেশের উপর অনেকটাই নির্ভর করে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার্থীরা সমাজ ও পরিবেশ থেকে শিক্ষা নেয়। পরিবেশ ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মান নিম্ন হলে সামাজিক শিক্ষা নষ্ট হয়ে যায়। আমরা এই দুষ্ট-আবর্তে পড়ে গেছি। মূলত আমরা এ দেশের জনগোষ্ঠীকে অশিক্ষা ও কুশিক্ষা দিয়ে দিনে দিনে নষ্ট করে ফেলেছি। তাই মুক্তিযোদ্ধা-সহযোগীর নাতি কিডনি বিকল হয়ে হাসপাতালের বেডে শুয়ে জীবনযুদ্ধে হারতে বসেছে। অথচ বিজয়ের মাস চলছে। আমাদের আত্মশুদ্ধির সময় এসেছে। এখান থেকে বেরোতে গেলে সামাজিক শিক্ষা, পরিবেশ ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে একসাথে উন্নত করার কথা মাথায় নিতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় জীবনমুখী শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা ও মানবিক গুণাবলি-সঞ্চারক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সামাজিক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। সকল পরিকল্পনার যথাসম্ভব বাস্তবায়ন করতে হবে। ‘সিস্টেম লস’ মেনে নেওয়া যাবে না। বিজ্ঞাপনসর্বস্ব উন্নয়নকে পরিহার করতে হবে। দেশে মানবসম্পদ গড়ে উঠবে। এ দেশের ‘মানব-আপদ’ মানবসম্পদে রূপ নেবে। তখন অফিস-আদালত, রাজনীতি, পেটনীতিসহ সব জায়গার দুরবগ্রহ-দুরাচারবৃত্তি অনেকটাই বন্ধ হয়ে যাবে। এছাড়া অমানিশার এই গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসার আমি তো আর কোনো উপায় দেখিনে। নইলে আকাশ দিয়েই উড়ি, আর পাতাল দিয়েই ফুঁড়ি, কোনো কিছুই ‘শনির দশা’মুক্ত হতে দেবে না। বিজয়ের মাস হাজার হাজার বছর ধরে আসুক, এটাই হোক আমাদের কামনা।

(প্রকাশ: ৩০ ডিসেম্বর ২০২২, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ– প্রফেসর, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

সামাজিক শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নে ধর্মকর্ম

বিগত ১৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখের লেখাটি ভুলবশত 'ধর্মীয় শিক্ষাকে কর্মমুখী করতে হবে' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। এ নিয়ে পাঠকসমাজের অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন, 'ধর্মীয় শিক্ষাকে আবার কর্মমুখী করা যায় কীভাবে'? আসলে শিরোনামটা 'ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে কর্মমুখী করতে হবে' লিখলে ভালো হতো।

এদেশের মানুষ কম-বেশি ধর্মভীরু। সেই আদিকাল থেকে এ দেশের সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। মানুষের চিন্তা-চেতনা, কর্ম ও সংস্কৃতির সাথে ধর্মীয় মূল্যবোধ ওতোপ্রতভাবে জড়িত। তাই সমাজব্যবস্থার প্রতিটা কর্ম, শিক্ষা ও সিস্টেম ডেভেলপমেন্টে ধর্মীয় উপাদানের সার্থক প্রয়োগ কর্ম, প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থার সফলতা অনেকটাই নির্ভরশীল।

এ দেশের প্রতিটা আস্তিক মানুষ ইহকাল ও পরকালকে নিয়ে ভাবেন– কেউ বেশি, কেউ কম। জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে চান। আস্তিক ধর্ম-উদাসী মানুষকে নিয়ে বেশি অসুবিধা হয় না; যা বোঝানো যায়, তাই বোঝেন। ধর্মজ্ঞান তাদের কম। কিন্তু অনেক ধর্মভীরু মৌলবি-মাওলানাদের কাছেই সৃষ্টি, সমাজব্যবস্থা ও জীবনের উদ্দেশ্যটা পরিস্কার না। আবার বর্তমান সমাজে ভালো কাজ ও ভালো কথা বলার লোকের বড্ড অভাব দেখা দিয়েছে। সমাজ ও দেশ পরিচালকরা তাদের চিন্তা ও কর্মব্যবস্থা দিয়ে সমাজকে বুনো আবহের দিকে সজোরে টানছেন। মাথায় আঘাত করে টাকের যত্ন নেওয়ার বিজ্ঞাপনে পারদর্শিতা দেখাচ্ছেন। মানুষের মানবিক বৈশিষ্ট্যের ভাণ্ডারে আজ টান পড়েছে। মৌলবি-মাওলানারা জীবনের উদ্দেশ্যকে পরকালের জন্য নামাজ, রোজা ও হজের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে অনেকটাই আবদ্ধ করে ফেলেছেন। এ-সবের প্রভাব আমাদের দুনিয়াদারি, সমাজব্যবস্থা ও সমাজকর্মের উপর পড়েছে। তাদের অনেকেই ইহকালের সামগ্রীক শিক্ষা (অল ইনক্লুসিভ শিক্ষা) ও কর্মজীবন অলীক-অসার ভেবে শুধু পরকালের কল্যাণকে সুনিশ্চিত করতে চান এবং সমাজে তা প্রচার করেন। ইহকালের কল্যাণ কীসে, ইহকালের কল্যাণ ছাড়া যে পরকালের কল্যাণ সম্ভব নয়– তা তাদের বুঝে আসে না। পরকালের কল্যাণ কী প্রক্রিয়ায় অর্জিত হয় তাও ভাবতে নারাজ। তারা নামাজ, রোজা, হজের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে বেহেশত যাবার সোজা-সাপটা পথ খুঁজে বের করার বুদ্ধি করে ফেলেছেন। সেমতো মানুষকে কর্মহীন শিক্ষা ও কর্মহীন জীবনের দিকে ধর্মীয় আবেগ দিয়ে টানেন। কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা না করে, না বুঝে,

নির্দেশনা মোতাবেক কর্ম না করে পরকাল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কুরআনের ইহকালীন কর্মজীবনের সামাজিক বিশ্লেষণ না করে শুধু বেহেশতমুখী ব্যাখ্যা দেন। হক্কুল্লাকে বোঝেন, হক্কুল ইবাদকে বোঝেন না। পরিবার, সমাজ ও মানবসেবা হলো হক্কুল ইবাদের অন্যতম দিক– এ নিয়ে অনেকে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিতেও অপারগ। জীবনকর্মকে উপেক্ষা করে শুধু বিশ্বাসের উপর ভর করে পরকালের কল্যাণ কামনা করেন। আংশিক, অগভীর শিক্ষা ও ধর্মদর্শন, সৃষ্টিদর্শন বোঝার অক্ষমতা, কুরআন বিশ্লেষণের অক্ষমতা– এর জন্য দায়ী। বলা হয়েছে, 'তবে কি তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না, না তাদের অন্তরে তালা পড়ে গিয়েছে?' (মুহাম্মাদ, ৪৭:২৪)। কুরআন বোঝার মতো উচ্চশিক্ষা নেই, সামাজিক বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান নেই, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আত্মজিজ্ঞাসা নেই, অনুভূতি নেই; মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানা নেই, চিন্তা-গবেষণার সক্ষমতাও নেই। ধর্মীয় শিক্ষা কর্মজীবন ও সমাজজীবনে প্রয়োগ নেই। ফলে আমাদের সুষ্ঠু সমাজ গঠন, সামাজিক সুশিক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন ব্যহত হচ্ছে। কুরআনের অসংখ্য বর্ণনা যে খোদা নির্দেশিত পথে ইহকালীন কাজ-কর্ম ও চিন্তা-চেতনা– তা আমরা এড়িয়ে যায়। কুরআনের সামান্য অংশ জুড়ে পরকাল, আর অধিকাংশ বিষয়ই যে ইহকালীন সৃষ্টি-জগৎ, নির্দেশিত কাজ, পথ ও পাথেয়। সেটা আমরা বেমালুম ভুলে বসে আছি।

মূলত কোরআন দুটো কাল বা সময়কে নিয়ে সবিস্তার আলোচনা ও ব্যাখ্যা করে– ইহকাল এবং পরকাল। ইহকালের পুরোটাই কর্মজগৎ ও চিন্তাজগৎ। ইহকালের সৃষ্টিজগৎ, জীবন ও জীবনকর্ম পুরোটাই বিজ্ঞান। বিজ্ঞান আছে বলেই মানুষ ইহলোকে টিকে আছে। মানুষের জন্ম প্রক্রিয়াটা বিজ্ঞান। মানব দেহ, দেহের কার্যপ্রণালি, কোষ, রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয় প্রভৃতি সবটুকুই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। খাবার গ্রহণের মাধ্যমে বেঁচে থাকা বিজ্ঞান। প্রাণি ও উদ্ভিদের পারস্পরিক বেঁচে-থাকা ও নির্ভরশীলতার সবটাই স্রষ্টার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। পরকালের পুরোটাই ইহকালীন কর্ম ও চিন্তাধারার ফল পাবার জন্য পরকালের কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস (মেটাফিজিক্স)। অথচ আমাদের মৌলবি-মাওলানারা বিজ্ঞান পড়েন না, বোঝেনও না, বুঝতে চানও না। বিজ্ঞানের অবদান ছাড়া জীবন পরিচালনা অসম্ভব, এটা ভেবে সেমতো কাজ করেন না। সৃষ্টিদর্শন ও জীবনদর্শন নিয়ে ভাবেন না। দুনিয়াদারি জীবন-পেশা-কর্মব্যবস্থা বুঝতে চান না। না-জেনে না-বুঝেই ইসলাম ধর্ম প্রচারে ব্রতী হন, সৃষ্টি ও কর্মপ্রণালীর সোজা-সাপটা উপরিগত মুখস্ত ব্যাখ্যা দেন। দুনিয়ার জীবনযাপন ও কর্ম বাদ দিয়ে শুধু বিশ্বাসের উপর ভর করে, কখনো তসবিহ পড়ে পরকালে ভালো প্রতিদান আশা

করেন। সাধারণ মানুষকে সে-ভাবে চালান। ইসলামকে শুধু পরকালের জন্য ইবাদত-বন্দেগির আনুষ্ঠানিক গণ্ডিতে আবদ্ধ করে ফেলেন। এটা বাস্তবসম্মত নয়। এখানেই সমাজের দুর্গতি। তাই বলতে হয়, কোরআনে বর্ণিত সমগ্র সৃষ্টিজগৎ ও এর কর্মপ্রণালীর সবটুকুই ধর্মের অন্তর্গত- এই সামুদয়িক (অল ইনক্লুসিভ) ব্যাখ্যা যতক্ষণ ধর্মকে নিয়ে না দিতে পারি এবং ধর্মশিক্ষার আওতা কোরআনে উল্লেখিত সমুদয় সৃষ্টি, জীবন ও কর্মপ্রণালি এবং এর ভালো-মন্দ সম্পর্কীত সকল বিষয়ের শিক্ষা (অল ইনক্লুসিভ শিক্ষা) বলে গ্রহণ করতে না পারি এবং সেমতো কর্ম করতে না পারি, ততক্ষণ 'ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান' বললে চিন্তা, কথা ও কাজে গরমিল ধরা পড়ে। এটা কোনোমতেই কাম্য নয়। আমরা এদেশের মাদ্রাসা শিক্ষায় সকল পেশাজীবী তৈরির শিক্ষা, সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও দুনিয়ার সকল শিক্ষা-কর্মকে বাদ দিয়ে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা ও সে বিষয়ে মাসআলা-মাসায়েল শিখি, পরকালে সফলকাম হতে চেষ্ঠা করি– এটাও অবাস্তব ও অবান্তর। স্রষ্টার দেখানো পথে দুনিয়ার সকল চিন্তা, পেশা ও কর্মই ধর্ম ও ইবাদত। পরকালে কোনো ধর্ম নেই, কর্মও নেই, ইবাদতও নেই; শুধু ফলাফল প্রাপ্তি এবং অনন্ত জীবনযাপন।

আমি সামাজিক শিক্ষা, সমাজগঠন ও সমাজকর্ম, সৃষ্টিসেবা নিয়ে বলতে গিয়ে বিষয়টাকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পরিষ্কার করতে চাই। এদেশকে গড়তে, উন্নয়নের প্রেক্ষাপট রচনা করতে ও এদেশকে এগিয়ে নিতে গেলে এদেশের অধিকাংশ মানুষের ধর্মবিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ চিন্তা, শিক্ষা ও কর্মব্যবস্থাকে বেছে নিতে চাই। জীবনবিমুখ, কর্মবিমুখ ও পেশা/বৃত্তিবিমুখ শিক্ষা থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াও সৃষ্টিসেবার উদ্দেশ্যে জীবনের কর্মে ও সমাজের কর্মব্যবস্থায় ধর্মের প্রায়োগিকতা দেখতে চাই। ইহকালীন জীবনযাপন, পেশা/বৃত্তিমূলক-ব্যবসায় শিক্ষা, সমাজগঠন, সমাজকর্ম, সমাজসেবা, সমস্ত ন্যায় কাজ ও কল্যাণের মধ্যে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার মধ্যে পরকালের কল্যাণ ও মুক্তির পথ খুঁজবে এমন জনগোষ্ঠী পেতে চাই। তাদেরকে 'ধর্মই কর্ম' বা 'কর্মই ধর্ম' (সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে)– এই নীতিতে বিশ্বাসী পেতে চাই। তারা যে কোনো ধর্মের হতে পারে বা সম্মিলিত মানব গোষ্ঠীর হতে পারে। এজন্য আমি অতি সংক্ষেপে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, ধর্মের আওতা, শিক্ষার আওতা, মানব কল্যাণ, মানুষের কর্ম-পেশা, আমল, ইবাদত (দৈনন্দিন জীবনে ও সব কাজ-কর্মে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সকল চিন্তা ও কাজ করা) বিষয়গুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে কিছু বলছি, যাতে ইহকালীন কর্মজীবন, শিক্ষা ও চিন্তাধারাই যে পরকালের মুক্তির পথকে নিরূপিত করে– তা পরিষ্কার হয়।

আমি ইন্টারনেট ঘেটে দেখলাম, ইসলামি স্কলারদের লেখাপড়ার মান ভালো। সৃষ্টিদর্শন, সমাজদর্শন ও কর্মদর্শন বিষয়ে তাদের দিক নির্দেশনা ও লেখালেখি নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা অন্য জায়গায়– তাদের লেখালেখি, বিশ্লেষণ সাধারণ মানুষ পড়েন না, জানেনও না। এরা সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়ে যান। সাধারণ মৌলবি-মাওলানারা সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে আছেন। এদের গৎবাঁধা ধর্মীয় কথা সমাজের মানুষ মেনে চলেন। দীর্ঘদিন শুনতে শুনতে ও মানতে মানতে সমাজের অভ্যন্তরে কিছু বিষয়ের উপলব্ধি ও অনুভূতি বিশেষ মনজাগতিক আবেগময় রূপ পেয়েছে। ফলে নির্মোহ-বাস্তবমুখী চিন্তাধারার গলদটা রয়ে গেছে। আমরা ইসলাম ধর্মের শিক্ষা, কর্ম ও ভাবনার গণ্ডি এই উপমহাদেশে সংকীর্ণ করে ফেলেছি। আমরা ধর্মের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ইসলামি পারিভাষিক অনেক শব্দ ধর্মীয় আবেগ মিশিয়ে ভাবতরঙ্গ তৈরি করি, ক্ষুদ্র গণ্ডিতে ব্যবহার করি এবং মনের মধ্যে সেভাবে উপলব্ধি করি, যদিও এসব শব্দের আওতা ব্যাপক; মানুষের সাধারণ কাজ-কর্ম ও চিন্তা-চেতনার সাথেও সম্পৃক্ত। এসব শব্দ আমাদের মনে শুধু ধর্মের বিষয়ে গেঁথে-যাওয়া আলাদা দ্যোতনা সৃষ্টি করে। ফলে আমরা বাস্তব জীবনে শব্দগুলো প্রয়োগ করতে পারিনে। শব্দগুলো দিয়ে আমরা বাস্তব জীবনের কিছু বুঝিওনে। সেমতো চলতে পারিনে, কাজও করতে পারিনে। সমস্যাটা আমাদের ধর্মের প্রতিভূদের (প্রতিনিধিদের) ভাবনার গণ্ডি নিয়ে। তারা ইসলাম ধর্মের সংকীর্ণ ব্যাখ্যা দিয়ে শুধু ক্ষান্তই হননি, বক্তৃতায় ভাবের আবেশ মিশিয়ে সুর করে কথা বলে আবেগাপ্লুত মুসলমানদেরকে কল্পনার জগতে ইহলোকেই বেহেশতের স্বাদ গ্রহণ করান। ইহকালের পথ ও পাথেয় এবং কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা কম করেন। সংক্ষিপ্ত পথে বেহেশতে যাবার নুসকা (ব্যবস্থাপত্র) বাতলান। ধর্ম মানে যে ইহকালীন কর্মবিধান ও চিন্তা-চেতনা তা উপেক্ষা করেন। কথায় কথায় ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে ফতোয়া জারি করেন। তারা কুরআনের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা ছেড়েছেন। ব্যর্থ হয়েছেন কুরআন-হাদিসের দৈনন্দিন কর্মজীবনে ও সমাজজীবনে প্রায়োগিক ব্যাখ্যা দিতে। অথচ কুরআন নিজেই নিজেকে 'বিজ্ঞানময় কুরআন' বলে ঘোষণা দিয়েছে। বলা হয়, কুরআনে মোট আয়াত সংখ্যার মধ্যে প্রায় এক-অষ্টমাংশই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয় আলোচিত হয়েছে। আমার মনে হয়, আমাদের আলেম-ওলামাদের বিজ্ঞান, সৃষ্টিজগৎ, কর্মজীবন, পেশা, পথ ও পাথেয় বিষয়ে শিক্ষায় আরো মনোযোগী হতে হবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ বিষয়গুলো প্রচার করতে হবে। তার আগে তাদের ধর্মের সামাজিক ব্যবহার ও কর্মজগৎ, সৃষ্টিদর্শন নিয়ে ব্যাপক পড়াশোনা করতে

হবে। তাদের নিজেদের ভালোর জন্য সকল শ্রেণির মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিতে ধর্মের সকল কর্মভিত্তিক প্রায়োগিক শিক্ষা আনতে হবে; পাঠ্যসূচিতে বিজ্ঞান-ব্যবসা শিক্ষার প্রচলন করতে হবে। সমাজজীবনে ও জীবনযাপনে ধর্মের প্রায়োগিক দিকের প্রচার করতে হবে। সৃষ্টিদর্শন ও কর্মদর্শন বুঝতে হবে; নিজেদের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনতে হবে। নিজেদেরকে সংশোধন করতে হবে। তাদের অগভীর জ্ঞানকে অজ্ঞতাবশত জাহির করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বিভক্তি, দ্বন্দ্ব, হানাহানি, রাজনৈতিক দলবাজি বন্ধ করতে হবে। 'নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই' কথাটা গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় রাখতে হবে। সাধারণ মানুষের কুরআন-হাদিসের জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা এবং এর সামাজিক বিশ্লেষণ শেখাতে হবে। এতে সমাজের ভোগবাদে আপদমস্তক নিমজ্জিত পথহারা মানুষ ও সাধারণ মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুগামী সঠিক পথের সন্ধান পাবে। তারাও উন্নত জীবন ও সুশিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলার সহায়ক ভুমিকা পালন করতে পারবেন।

(প্রকাশ: ২৯ অক্টোবর ২০২২, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক।
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে যারা অবদান রাখতে পারেন

ইদানীং একটা মানসিক বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছি। যত আপ্তবাক্য ও হেদায়েতি বয়ান আমার মতো অনেক অভাজন পত্রিকার মাধ্যমে করে থাকেন, এর ভালো কিছু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আদৌ আমলে নেন কি-না? এই দ্বন্দ্ব-দোটানায় মাঝে-মধ্যেই হতোদ্যম হয়ে পড়ি। ভাবি, রাজনীতির কথা লিখতে পারলে হালে পানি পাওয়া যেত; অন্য কোনো বিষয়ের গুরুত্ব কম। কারণ এ দেশের সবকিছু নিয়েই তো রাজনীতি। ধানের হাটে, গরুর হাটে রাজনীতি; বাসর ঘরে রাজনীতি; জন্ম-মৃত্যুতে রাজনীতি; সমাজনীতি-শিক্ষানীতি, শয়নে-স্বপনে ও পরজনম নিয়েও রাজনীতি। রাজনীতির আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে জীবনের পথ দেখি, নিজের উত্থান-পতন খুঁজি। রাজনীতি কখনো দেশকে পথে বসায়, আবার উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেওয়ার স্বপ্ন দেখায়। এক বয়াতি মনের দুঃখে গেয়েছিলেন, 'গুরু গুরু বলে ডাকি গুরু রসের গোলা-আ-আ, এমন দোয়া দিলে গুরু তুমি কাঁধে দিলে ঝোলা। আহা আ-আ-আ-।' গুরুর কথায় চলতে গিয়ে একদিন শিষ্য ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এ দেশে এও এক অনিবার ট্রাজেডি। রাজনীতি কিন্তু সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়ন নিয়েই হওয়ার কথা ছিল। প্রতিটা দলের গঠনতন্ত্রে তা ভালোভাবে লেখাও আছে। আমরা সেটাকে টেনে নীচে নামিয়েছি। রাজনীতির বিষবাষ্প চতুর্দিক কলুষিত করে ছেড়েছে। দেশে সামাজিক শিক্ষার ভরাডুবি। যা আছে কুশিক্ষা ও অশিক্ষা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অবস্থাও তথৈবচ। তাহলে সমাজ ও জাতির উন্নতি কীভাবে সম্ভব? শুধু অর্থ উন্নয়ন দিতে পারে না। আবার অর্থেরও দৈন্যদশায় ধরেছে। দেশ পরিচালনাও দেশের সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপর নির্ভর করে। প্রশাসনিক ধস ও সামাজিক অবিচারও সামাজিক কুশিক্ষার বহিঃপ্রকাশ। শিক্ষা ও জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উন্নয়ন ছাড়া সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়ন থাকে কী করে? পরিণতি কি– সচেতন মহল ভালো অনুমান করতে পারেন। শুধু মুখের কথায় তো আর চিড়ে ভেজে না! সমাজসেবার মনোভাব ও কর্ম না থাকলে সমাজ ও জাতীয় উন্নয়ন হয় না। এ দেশের রাজনীতির যতক্ষণ-না খোল-নইচে বদল করা হবে, ততক্ষণ রাজনৈতিক তরিকায় চলা নেতা, শিষ্য দিয়ে দেশের সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়ন হবে– একথা ভাবতে মন সায় দেয় না। আমি সে কাসুন্দি ঘাটতে গিয়ে লেখার উদ্দেশ্য-বিচ্যুৎ হতে চাইনে; কারো মনে বিরক্তির উদ্রেক করাতেও চাইনে। পরিবর্তিত সমাজে দীর্ঘ মেয়াদে গিয়ে রাজনীতি হয়তো সুস্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতেও পারে। রাজনীতিবিদদের দিয়ে যখন সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নতি আপাতদৃষ্টিতে আশা করা

যাচ্ছে না, মন্দের ভালো হলেও বিকল্প তো একটা খুঁজতে হবে। সেজন্যই এত গৌরচন্দ্রিকা দেওয়া।

ভালো-মন্দ মিলিয়েই সমাজ। রাজনৈতিক মদদপুষ্ট একটা বিশাল অংশ পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে জানি। কিন্তু এর মধ্যেও কোনো কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি এখনো ভালো আছেন। এদেরকে সমাজসেবায় সাথে নেয়া যায় কি-না দেখতে হবে। এছাড়া সমাজের একটা সচেতন ও সুশিক্ষিত অংশ রাজনীতির কর্দমাক্ত বানভাসি স্রোতে ভেসে যাননি; সুশিক্ষার প্রিজারভেটিভ মেখে এখনো এই সমাজেই নিভৃতে জীবনযাপন করছেন। এদেরকে নিয়ে আমরা আবার আশায় বুক বাঁধতে পারি। এদেরকে জাগিয়ে ঘরের বাইরে বের করে আনতে হবে। এদেরকে একত্র করা দরকার। এদের দিয়ে সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অনেকটাই উন্নতি করা যায়। কারণ এরাও তো একটা সামাজিক শক্তি। সমাজে এদেরও একটা অবস্থান আছে, শিক্ষা আছে, সুস্থ চিন্তাধারা আছে। তাহলে তারাই-বা সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে না কেন?

মানুষ পরিবেশের কারণে, ষড়রিপুর আধিক্যে মানুষ নামের কলঙ্ক হয়, পঙ্কিলতার সাগরে ডুবে যায়, আবার মানবিক গুণগুলো জাগিয়ে তুলতে পারলে মনুষ্যত্ব ও মানবতা বোধ ফিরে পায়, মানুষের মতো কর্ম করে, আচরণ করে। মানুষের অন্তর্নিবিষ্ট স্বভাব ছাড়াও সুশিক্ষা ও যোগ্য প্রশিক্ষণ এবং সুস্থ সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষকে 'মানুষের মতো মানুষ' রূপে গড়ে তোলা যায়। এভাবেই সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন শিক্ষিত সমাজ, আদর্শ রাষ্ট্র ও টেকসই জাতি গড়ে ওঠে। সমাজ উন্নয়নে এদের কাজে লাগানো যায়। ব্যক্তির সুষ্ঠু চিন্তাধারা সামষ্টিক সুস্থ চিন্তার উৎস। ব্যক্তির মানসিক উন্নতির মধ্যে সামষ্টিক উন্নতি নিহীত। তাই এদেরকে দিয়ে ব্যক্তির মানসিক উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। ব্যক্তির উন্নতির মধ্য দিয়ে সামষ্টিক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করতে হবে।

লায়ন্স ক্লাব ও রোটারি ক্লাবের সদস্যরা নিজে চাঁদা দিয়ে, অনুদান দিয়ে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ান, সমাজসেবা করেন। তাদের থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। জনসেবা ও সমাজসেবাও একটা অনিবার নেশা। এর মজা যিনি পেয়েছেন তিনিই মজেছেন। এ দেশে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত একটা ধার্মিক জনগোষ্ঠী আছে, তারাও একটা সামাজিক শক্তি, তারা পরকালের মুক্তি চান। তাদের অনেকেই জীবনের উদ্দেশ্যকে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে, ইহকালকে উপেক্ষা করেন, কখনো নিরর্থক জেনে পরকালের মুক্তির নেশায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছেন। আমি তো

দেখি, ইহকালের শিক্ষা, কর্ম, চিন্তা-চেতনা, সমাজসেবা, জনসেবা ও সৃষ্টিসেবার মধ্যেই ইহকালের ইবাদত, পরকালের মুক্তি। পুরো ধর্মদর্শন এই সৃষ্টি, কর্ম ও সৃষ্টিসেবার উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে। তারাও তো, একটু ভেবে দেখে, সমাজসেবা, মানবসেবা ও সৃষ্টিসেবায় যোগ দিতে পারেন। সৃষ্টিসেবার মধ্যে পরকালের মুক্তি খুঁজতে পারেন। স্রষ্টায় একান্তভাবে বিশ্বাসী প্রতিটা লোককেই সৃষ্টিসেবায় ও মানবসেবায় আনা সম্ভব।

তবলিগ জামাতের অসংখ্য ধর্মভীরু মুসলমান দেশ-বিদেশে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে ধর্ম প্রচারের কাজে মন দিয়েছেন। সমাজের অনেকে তাদের পথ অনুসরণ করে নামাজ-রোজা, হজ্জ-জাকাত ও তসবিহ-তেলাওয়াতের কাজে রত হয়ে পরকালের পথে নিজেকে সঁপে দিচ্ছেন। কিন্তু এদের অধিকাংশই সৃষ্টির উদ্দেশ্য– শিক্ষা, জীবন-জীবিকা-কর্ম, সমাজগঠনকে উপেক্ষা করে চলেছেন। প্রতিপালকের সৃষ্টিকর্ম, দুনিয়াদারি, সৃষ্টি-সেবা, জীবনকর্ম ও পেশাকে একেবারে মূল্যহীন-নিষ্কর্ম করে ছেড়েছেন। যুগ যুগ ধরে এরা সমাজে সুশিক্ষা, ন্যায়নিষ্ঠা, হতদরিদ্র মানুষের জন্য সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন, আর্ত-মানবতার সেবা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষিত সমাজগঠন ও সত্য কতটুকু প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, এসব কথা নিয়ে আজ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আমার বিশ্বাস, এগুলোও ‘দীনের খেদমত’ ও ‘হক্কুল ইবাদ’– পরকালের পাথেয়। এদেরকে বুঝিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক সুশিক্ষা, ন্যায় কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানো, দুঃস্থ সহায়তা ও দরিদ্র-মানবতার সেবার জন্য ‘শিক্ষা-সেবা সমাজের’ একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আনতে পারলে সমাজ নিঃসন্দেহে উপকৃত হয়, একই সাথে তাদের পরকালের মুক্তিও মেলে।

একসময় বাম রাজনীতির ধারা এদেশের জনগোষ্ঠীর একটা অংশকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। উদ্দেশ্য সমাজসেবা করা; বঞ্চিত, নিপীড়িত, মেহনতি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কাজ করা। গণমানুষের মুক্তি ও শোষণহীন সমাজ গঠনের জন্য স্বার্থত্যাগী ও ভুক্তভোগীরা এতে ভূমিকা রেখেছিলেন। স্বাধীনতা-যুদ্ধের কিছুদিন পরেই বাম ধারার রাজনীতির মধ্যে মতাদর্শগত ভিন্নতার কারণে অর্ন্তদ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। প্রভাবশালী অনেক নেতাই দলীয় আদর্শকে মনে মনে বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। অন্তরে-প্রকারান্তরে বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়ে গেলেন। দলীয় কর্মীরা ছত্রভঙ্গ হতে থাকলেন। ক্রমান্বয়ে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো থেকে বাম রাজনীতির মেহনতি মানুষের মুক্তির স্বপ্ন বিদায় নিলো। শেষ বিদায়ের মৃদু রক্তিম রশ্মির চিক্কণ মনোহর ছোঁয়া এ দেশের পশ্চিম গগনের অধরেও কিঞ্চিত ধরা দিয়ে আবার হারিয়ে গেল।

মাঝখান থেকে অসীম জীবনকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের নিগড়ে বাঁধতে গিয়ে বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষকে অকাতরে প্রাণ দিতে হলো। বাম নেতাদের অনেকে অন্য ডান দলে অনুপ্রবেশ করতে লাগলেন। ত্যাগী কর্মীরা বিনা প্রতিবাদে মনের দুঃখ মনে নিয়ে যার যার পথে রুজি-রোজগারের কাজে নেমে পড়লেন। তাদের মধ্যে আর্ত-মানোবতার সেবা, মেহনতি মানুষের জন্য ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার মনোভাব এখনো বিদ্যমান। পার্থক্য এটুকুই যে, যে-সব নেতা-কর্মীরা ধর্মকে সমাজ থেকে বিতাড়িত করে ধর্মহীন বাম-রাজত্ব কায়েম করতে চেয়েছিলন, তাদের অধিকাংশই এখন সময় অতিক্রমণে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ভুলে গিয়ে নামাজ-রোজার আস্তিক মোড়কে নিজেদের পরকালকে সংরক্ষিত করে চলেছেন। কথা হচ্ছে, সুস্থ মানসিকতার বিকাশ ছাড়া মানব সভ্যতা ও সৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। মানুষের জন্য সমাজ, রাষ্ট্র ও সৃষ্টির এত আয়োজন। স্রষ্টার এ প্রতিনিধিকে প্রচলিত আইনে বিচার না করে বিপ্লবের নামে অন্যায়ভাবে নিধন করার মতবাদকে সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন কোনো লোকই মেনে নিতে পারেন না। মানুষকে বিভক্ত করে, মানুষের নিধনযজ্ঞ চালিয়ে মানবতার মুক্তি আসে না। মতবাদ তখন অকেজো হয়ে যায়। অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সামাজিক বিভক্তি সমাজে প্রতিহিংসার জন্ম দেয়। অর্থনৈতিক ভিত্তিও সময়ের ব্যবধানে আপেক্ষিক। বাম রাজনীতির রাষ্ট্র ও সমাজগঠনের অনেক ব্যবস্থাকে আমাদের দেশের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, সামাজিক বুনন ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে খাপ খাইয়ে সংশোধিত মডেলে প্রয়োগ করতে পারলে সাধারণ মানুষের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হতো ও দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকতো বলে আমার বিশ্বাস। তবে সেখানে সততা, নৈতিকতা, শিক্ষা ও ধর্মীয় আদর্শ থাকা জরুরি ছিল। এগুলো সামাজিক দ্বন্দ্বকে মিনিমাইজ করে। সমাজসেবা ও মেহনতি মানুষের জন্য আত্মত্যাগে উজ্জীবিত অনেকেই বর্তমানে পরপারের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। আবার অনেকে এ সমাজেই বিভিন্ন পেশায় রয়ে গেছেন। এদের অনেকের মনে বঞ্চিত মানুষের মুক্তির নেশা, মানবতার ধর্ম রয়ে গেছে। তাদেরকে সমাজসেবা ও শিক্ষিত জাতি গড়ার আদর্শে আবার জাগিয়ে তুলতে পারলে তারাই শিক্ষিত সমাজ গঠনে অংশ নিতে পারেন।

সমাজে আরো কিছু পক্ষ আছে। এদের মধ্যে একটা শ্রেণি হচ্ছে চাকরি থেকে অবসরে যাওয়া ব্যক্তিবর্গ। এর একটা অংশ সুশিক্ষিত যারা সরকারি, বেসরকারি, বিভিন্ন সংস্থা, সামরিক বাহিনীতে কর্মকর্তা পদে সততার সাথে দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। এদের অর্জিত জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা থেকে সমাজ সেবা পেতে আশা করে। দেশের আনাচে-কানাচে এরা ছড়িয়ে আছেন। এদের অনেকে জীবনের

পড়ন্ত বিকেলে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সমাজকে কিছু দিয়ে যেতে চান। সমাজে এরা শ্রদ্ধেয়। সমাজ এদেরকে চায়। শিক্ষিত সমাজ গড়ে তুলতে এদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। এদেরকে খুঁজে খুঁজে সমাজ উন্নয়নের কাজে ভেড়ানো দরকার। একটা নীতিমালা হাতে তুলে দেওয়া দরকার।

সমাজের পরতে-পরতে আরেকটা পক্ষও মিশে আছে, যাদের শিক্ষা আছে, জ্ঞান আছে। ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা আছে। সমাজ এদের কথা এখনো নেয়। এদের একটা অংশ রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করে আত্মমর্যাদা ভুলে বিপথে গেছেন। বাকিরা তো ঠিক পথে আছেন। সমাজে এরা শিক্ষক হিসেবে পরিচিত। এরা ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার পাশাপাশি সমাজ-শিক্ষার দায়িত্ব নিতে পারেন। এরা জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষা, চিন্তা-চেতনা, নতুন নতুন ভাব-ধারণা (আইডিয়া), দিক-নির্দেশনা দিয়ে জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেন, সমাজের মানুষকে সুশিক্ষা দিতে পারেন। আমার বিশ্বাস, সুষ্ঠু পরিবেশ ও সমাজগঠনে অনুকূল পরিবেশ পেলেই এরা এগিয়ে আসবেন।

সামাজিক সুশিক্ষা ও সুস্থ সমাজগঠনকে যদি আমরা একটা সামাজিক আন্দোলন হিসেবে গ্রহণ করি, বিভিন্ন সমাজ-সংগঠনকে যদি এ-লক্ষ্যে ব্যবহার করি– এদেশে সামাজিক সুশিক্ষার অভাব হওয়ার কথা নয়। উল্লিখিত সামাজিক এসব পক্ষকে একত্র করে একটা অরাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারলে, সামাজিক এ স্বেচ্ছাসেবী সমাজসংগঠন চেষ্টা করলে, রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা পেলে অনেক অল্প সময়ে এদেশে সুশিক্ষা ও সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব।

সর্বোপরি সরকার ইচ্ছে করলে পুরো দেশের মানবসম্পদের বাঞ্ছিত উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে 'মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়' গঠন করতে পারে। পরিকল্পিতভাবে সমাজউন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন করতে পারে। এটা সময়ের দাবি। তবে নামের আগে 'সরকারি' শব্দটা যোগ থাকাতে এর কার্যকারিতা ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যত সন্দেহ ও ভয়। এ ভয়ও কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন করে দূর করা সম্ভব।

(প্রকাশ: ২৪ নভেম্বর ২০২২, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

শিক্ষা ও উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে তবলিগ জামাত

গত ক'দিন আগে তবলিগ (প্রচার, ধর্মপ্রচার) জামাতের দুই পর্বের বাৎসরিক ইজতেমা ঢাকার টঙ্গীতে শেষ হয়ে গেল। হাজার হাজার খোদাভীরু মুসল্লি এতে প্রতিবছর অংশ নেন। অনেক বছর আগে থেকেই ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের একটা অংশের বৃহৎ সমাবেশ এভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। দলমত নির্বিশেষে অনেক কষ্ট করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদত-বন্দেগি করার জন্য মুসলমানরা এখানে সমবেত হয়। বিভিন্ন দেশ থেকেও তবলিগের জামাত ইজতেমার মাঠে আসে। ইজতেমা অর্থই সম্মেলন বা বহুলোকের সমাবেশ। আমাদের দেশের অনেকেই ইজতেমা শব্দের সাথে পরিচিত কিন্তু ইজতেমা শব্দের প্রকৃত অর্থের সাথে পরিচিত নন। আমরা জানি ইজতেমার মাঠে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বয়ান (বক্তব্য বা ধর্মীয় আলোচনা) হয়। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা তা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। সে বয়ান কতটা দুনিয়ার কর্মজীবন, কর্মাচার ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে, তা আমার জানা নেই। শেষের দিনে যে মুনাজাত হয় তাকে আমরা আখেরি (শেষ বা অন্তিম) মুনাজাত বলে বুঝি। আমাদের দেশের, বিশেষ করে ঢাকা শহরের প্রচুর লোকজন আখেরি মুনাজাত ধরার জন্য অনেক সময় বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আখেরি মুনাজাতের দোয়া তাদের বড় প্রয়োজন। ইহকালের সমস্ত কাজকে ফেলে রেখে আমরা খোদার রাস্তায় মনোনিবেশ করি। মোনাজাতকে ঘিরে অনেক কল্যাণ প্রাপ্তির সুবিধা খুঁজি। দুনিয়ার গোমরাহির পথকে পিছে ফেলে অন্তত একদিনে পরকালের নাজাত (মুক্তি, নিষ্কৃতি) পাওয়ার চেষ্টা করি। ইসলামের দৃষ্টিতে এ মোনাজাতের ফায়দা (সুফল, লাভ, উপকার) পাওয়ার আনুষ্ঠানিকতা কতটুকু কিংবা ধর্মপ্রচারের কাজেকর্মে ধর্মের প্রায়োগিকতা কতটুকু তা আমাদের সম্মানীত তবলিগি আলেমগণ (অতিশয় বিজ্ঞ এবং জ্ঞানীরা) ভালো জানেন। আবার অনেকেই প্রথম দিন থেকেই অনেক কষ্ট স্বীকার করে পুরো বয়ান শুনি এবং জামাতে নামাজ আদায় করি। আমার অনেক পরিচিতজন জুম্মার দিন ভোরে পৌঁছে ফজরের নামাজে শরিক হন। সারাদিন মাঠে থাকেন, নামাজ আদায় করেন, বয়ান শোনেন। রাতে এশার নামাজ শেষে বাড়িতে ফেরেন। এভাবে খোদার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এরও পরলৌকিক প্রাপ্তি নিশ্চয়ই অনেক বলে আমরা গণ্য করি। এ নিয়ে অনেকের অনেক সমালোচনা থাকলেও মুখ ফুটে কেউ কিছু বলেন না। ধর্মীয় বিষয় বলেই হয়তো কিছু বলেন না। আমরা আল্লাহর নিয়ম-কানুন মোতাবেক সারা বছর কর্ম কতটুকু করি তা বিবেচনা না করে শুধু বছরের ঐ একদিন দোয়া অর্জন এবং নিজের ও মুসলিম উম্মাহর মাগফিরাতের (ক্ষমা,

নিস্কৃতি) জন্য ইজতেমার মাঠের দিকে ছুটি। আমাদের কালিমামাখা কাজের ও চিন্তা-চেতনার জন্য বয়ান ও মুনাজাতের মাধ্যমে কতটুকু ক্ষমা অর্জন করি, তা জগৎবিধাতাই ভালো জানেন। তবু আমরা ক্ষমা অর্জন করেছি ভেবে সান্ত্বনা ও তৃপ্তি অনুভব করি। এটাইবা কম কিসের!

আমার দেখা চোখে অনেক উচ্চশিক্ষিত পেশাজীবী খোদাভীরু লোক তবলিগ জামাতের মাধ্যমে ধর্ম পালন করেন। মানুষকে তবলিগ জামাতে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানান। তাদের বয়ান শুনলেই বোঝা যায়, তারা উচ্চশিক্ষিত, উচ্চ-পেশাজীবী। তাদের অনেকেই পেশাগত দায়িত্ব পালনে যত্নবান, সৎ ও ধর্মনিষ্ঠ। তাদের সাথে অনেকেই আছেন, লেখাপড়া তেমন একটা জানেন না, কুরআন পড়তে পারেন। কিছু মাসআলা-মাসায়েল, দোয়া শিখে মাসের পর মাস তবলিগ জামাতের সাথে ঘোরেন। নামাজ রোজা ও তবলিগ জামাতের সাথে থেকেই পরকালে জান্নাতের আশা করেন। আমার বড্ড জানার ইচ্ছে, উচ্চশিক্ষিত ভাইয়েরা তাদের সঙ্গী-সাথীদের ‘দীন-প্রচারে’ দীঘদিন ধরে দীনের কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন? তাদেরকে দীনের কী শিক্ষা দেন? দুনিয়ার কোন কোন কাজকে দীনের কাজ বলে গণ্য করেন? আমার জানা মতে, তবলিগ জামাতে দীনের আনুষ্ঠানিকতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। অথচ দীন একটা ‘জীবন-বিধান’। দুনিয়ার জীবনকর্মকে বাদ দিয়ে ইসলামের ‘জীবন-বিধান’ নয়। ‘জীবন-বিধান’ মোতাবেক চিন্তা করলে ও কাজ করলে পরকালে মুক্তি পাওয়া যায়। সোজাসাপটা কথা হলো, পরকালে দুনিয়ায় করা কাজের হিসাব হবে। এই কাজ মানে শুধু নামাজ-রোজা নয়, জীবনযাপন, রুজি-রোজগার ও দুনিয়াদারির কর্ম। এগুলো বলতে শিক্ষাদীক্ষা অর্থাৎ সার্বিক বিষয়ে জ্ঞানার্জন; সন্তান প্রতিপালন ও তাদের সুশিক্ষা; সৎ পেশা ও সৎ উপার্জন; ভালো কাজে সম্পদ ব্যয়; প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন; দুনিয়াকে মানুষের বসবাসযোগ্য করার জন্য অবদান রাখাসহ সমাজকল্যাণকর সকল কাজকেই বোঝায়। দুনিয়ার জীবনে প্রতিটা কাজেকর্মে, চিন্তা-ভাবনায় এ বিধান প্রয়োগ করলে সুষ্ঠু-সুন্দর জীবন গড়ে ওঠে; সমাজজীবন শান্তিতে ভরে যায়। পরিবেশ সুনিশ্চিত হয়। বিধিসম্মত প্রতিটা কাজই ইবাদতে রূপ নেয়। মানুষ-সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধিত হয়। তবলিগ জামাত মুসলমানদের একটি সুগঠিত, স্বেচ্চাসেবী, সুশৃঙ্খল একটা অংশ যারা দীনের কাজে নিজের সময় ও অর্থ ব্যয় করে থাকেন। যদিও তারা ‘দীন’ বলতে কী বোঝেন তা আমার জানা নেই। তাছাড়া আমার পরিচিত অনেক শিক্ষিত তবলিগি ভাইকেও প্রশ্নটা করেছি, তারাও পূর্ণাঙ্গ কোনো ধরণা দিতে পারেন না।

অনেকেই তাদের 'মুরব্বি'দের নির্দেশনা মতো তবলিগ জামাতে দল বেঁধে চলেন। মুরব্বিদের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। নিজে অনেক কিছুই বিচার-বিশ্লেষণ করেন না।

এভাবে তবলিগ জামাতের অসংখ্য ধর্মভীরু মুসলমান দেশ-বিদেশে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে ধর্মপ্রচারের কাজে মন দিয়েছেন। তাদের অনেকেই আমার ঘনিষ্ঠ, আমার শ্রদ্ধেয়। তাদের হাত ধরে দেশ-বিদেশের বহু অমুসলিম প্রতিনিয়ত মুসলমান হচ্ছে শুনি। সমাজের অনেকে তাদের পথ অনুসরণ করে নামাজ-রোজা, হজ-জাকাত ও তসবিহ-তিলাওয়াতের কাজে রত হয়ে পরকালের পথে নিজেকে সঁপে দিচ্ছেন। আনুষ্ঠানিক ইবাদতের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। কিন্তু এদের অধিকাংশই সৃষ্টির উদ্দেশ্য– শিক্ষা, জীবন-জীবিকা-কর্ম, সমাজগঠনকে উপেক্ষা করে চলেছেন। এদের অনেকেরই চিন্তা-চেতনা ও কর্ম গোঁড়ামিতে ভরা, একদেশদর্শী। প্রতিপালকের সৃষ্টিকর্ম, দুনিয়াদারি, সৃষ্টির সেবা, জীবনকর্ম, মানবকল্যাণ ও পেশাকে অলীক-অসার ভেবে একেবারে মূল্যহীন-নিষ্কর্ম করে ছেড়েছেন। যুগ যুগ ধরে তারা সমাজে সুশিক্ষা, ন্যায়নিষ্ঠা, হতদরিদ্র মানুষের জন্য সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন, আর্ত-মানবতার সেবা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষিত সমাজগঠন, ন্যায়-কাজের আদেশ ও সত্য কতটুকু প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, এসব কথা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাটাই স্বাভাবিক। তাদের সুশিক্ষিত অংশ এসব বিষয় ভেবে দেখতে পারেন। আমার বিশ্বাস, এগুলোও দীনের কাজ, 'দীনের খেদমত' ও 'হক্কুল ইবাদ'– পরকালের পাথেয়। এগুলোকে বাদ দিলে ধর্ম থাকে না। সমাজেও শান্তি থাকে না। যদিও ইসলাম শান্তির ধর্ম। তবলিগি ভাইদের দুনিয়াবিমুখ অংশ ও সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক সুশিক্ষা, ন্যায়কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানো, দুঃস্থ সহায়তা ও দরিদ্র-মানবতার সেবার জন্য 'শিক্ষা-সেবা সমাজের' একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে আনতে পারলে সমাজ নিঃসন্দেহে উপকৃত হয়, সুশিক্ষিত সমাজ গড়ে ওঠে। একই সাথে তাদের পরকালের মুক্তিও মেলে। এ বিষয়ে আমি তবলিগ জামাতের শিক্ষিত অংশের কাছে আবেদন জানাতে চাই; তাদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। তাদের কাজের আওতাকে মানুষের কল্যাণে সম্প্রসারিত করতে বলি।

আমি এমন তবলিগ জামাত চাই, যে জামাত তাদের বর্তমান কাজের পাশাপাশি সমাজের অদূরদর্শী, আত্মবিনাশী, পথহারা খণ্ডিত শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম ও অমুসলিম জনগোষ্ঠীকে বুঝিয়ে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষায় ফিরিয়ে আনবে। ব্যবসা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক ইন্টিগ্রেটেড ও ইউনিফায়েড শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলবে। ইহকালের

অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অর্থের সদ্ব্যবহার, সুশিক্ষা, কর্ম, পেশাগত দায়িত্ব পালনও ধর্ম ও ইবাদতের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ, মানুষকে তা বোঝাবে। প্রতিটা মানুষেরই ধর্ম ছাড়াও সমাজে আলাদা একটা মর্যাদাশীল পেশা থাকতে হবে, তা বোঝাবে। এই মর্যাদাশীল পেশাও যে ধর্ম-কর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তা বোঝাবে। সামাজিক সুশিক্ষা ও 'মানুষের খেদমত' যে আসলে একটা মানবসেবা, যার জন্য পরকালে তারা মুক্তি পাবেন, তা শেখাবে। তাদের মধ্যকার গোঁড়ামি, অকর্মণ্যতা দূর করবে। পুরো জনগোষ্ঠীকে ছোট ছোট নিয়ন্ত্রণযোগ্য অংশে ভাগ করে শিক্ষা, শিক্ষা-ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সুশিক্ষিত, সুপ্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করবে। আর্ত-মানবতা ও দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াবে। আর্থিক সেবা দেবে। নিঃস্বার্থভাবে সাধারণ মানুষকে সুশিক্ষার দিকে ডাকবে, প্রয়োজনে অনানুষ্ঠানিক সুশিক্ষা দেবে। সমাজের সকল জনহিতকর কাজ সাধ্যমতো করবে। সম্পদশালী মানুষ অকাতরে মানুষের কল্যাণে সম্পদ দান ও ব্যয় করবে। দেশে মানুষের মতো মানুষের বসবাস বাড়াবে। এসবই কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা, যা ধর্মপালনের মূল কাজ; এসব থেকে ক্রমশই আমরা বাদ পড়ে যাচ্ছি। আমরা ক্রমান্বয়ে আত্মকেন্দ্রিক, আনুষ্ঠানিকতাসর্বস্ব ধর্মচারী হয়ে উঠছি। সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত 'জীবন-বিধান' উপেক্ষিত হচ্ছে। আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছি। সবই বাস্তবতা। অথচ কোনো ধর্মই তা চায় না। আমরা ধর্মব্যবস্থাকে, ধর্মাচারকে জীবনের কাজে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে পরিকল্পিতভাবে ও সফলভাবে ব্যবহার করতে পারছিনে। যদিও সমাজের এসব কাজও প্রতিটা ধর্মচারী ও তবলিগি ভাইদের জন্য সদাকায়ে জারিয়া হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমার এ চাওয়া নিশ্চয়ই অতিশয়োক্তি কিছু নয়। বিষয়টা আত্মজিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলে বর্তমান অস্থির-দিশাহারা সমাজ আলোর দিশা পায়, সামাজিক শিক্ষা বাড়ে, জাতীয় উন্নয়নও ত্বরান্বিত হয়।

(প্রকাশ: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

‘সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে’

কিছু কিছু বিষয় আছে দৈনন্দিন জীবনযাপনের সাথে এত সম্পৃক্ত যে উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুজে বসে থাকা সম্ভব হয় না, আবার কথা বলতে গেলে মুখে খারাপ ভাষা চলে আসে, উচিত কথা বেরিয়ে পড়ে; নিজেই নিজের ঝুঁকি তৈরি করে। আমার মতো দুর্মুখ মাস্টারসাহেবের জন্য এটা অনেকটা সত্য। স্বার্থসংশ্লিষ্ট লোকগুলো এতে নাখোশ হয়। শেষে জীবনযাপন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। তখন রাজশাহীর ভাষা দিয়ে টেনে টেনে বলতে হয়, ‘কথা বুল্লেই তো বুইলবেন যে বুইলছে’। কিন্তু এ ভূখণ্ডে জীবনযাপন করতে গেলে কথা তো বলতেই হয়, না বলে যে উপায় থাকে না! তাই এত প্রাক্‌কথন। বিলের পানিতে নেমে কলমিলতার একটা লতা ধরে টান দিলে অনেকদূর পর্যন্ত লতার পাতাগুলো মাথা নাড়ে– একটার সাথে আরেকটার পারস্পরিক সংযুক্তি আছে বলে। প্রতিটা মানুষের জীবনযাপনের সাথে এমনই সমাজজীবনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, আইনকানুন, দেশ-পরিচালকদের মন-মানসিকতা, দেশ-পরিচালনাসহ অনেককিছুই জড়িয়ে যায়। তাই তো মানুষ ভোটের মাধ্যমে মনমতো দেশ-পরিচালক নির্বাচিত করতে চায়; অন্তত সুখে-শান্তিতে বসবাস করার আশা নিয়ে। আর ভাবে, ‘আমাদের দেশ-পরিচালকরা যেন জেগে না ঘুমান, তাহলেই জাগানো কঠিন’। কারণ আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

কোন অদৃশ্য শক্তির ইশারায় যে বাজারের প্রতিটা পণ্য ও সেবার দর ওপরের দিকে ধেয়ে চলেছে, এর কোনো সদুত্তর আমাদের জানা নেই। তবে পথ চলতে যখন রিক্সায় চড়ি, ফুচকা-চটপটি কিনে খাই, ব্যাগ হাতে বাজারে যাই, জীবনের ক্ষুধা মেটাই, তখন ‘কত ধানে কত চাল’ বোঝা যায়। এজন্য সাধারণ মানুষের জীবন নির্বাহ ক্রমশই দুরূহ হয়ে উঠেছে। বাস্তবে দেখছি, খেটে-খাওয়া মানুষের জাঁকান্দানি শুরু হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের আয় বাড়ছে না। দিনে দিনে টাকা তার ক্রয়ক্ষমতা হারাচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের ঘাড়ে শনির দশা ভর করেছে। সে শুধু লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরেই উঠতে জানে। সাধারণ মানুষ অসহায়। দেশ-পরিচালকদের মুখের দিকে তাকিয়ে হা-হুতাশ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কখনো নিয়তির ওপর দায় চাপিয়ে নিজেকে ধিক্কার দিই। কিন্তু ঘটনা কি আসলেই তাই?

দেশ-পরিচালকরা দ্রব্যমূল্যের সিন্ডিকেট ভাঙার চেষ্টা করেন না, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও চেষ্টা করেন না, নতুন কোনো বণ্টন পদ্ধতির খোঁজ করেন না, সিন্ডিকেট-সদস্যদের নিজের লোক বলে ভাবেন, দেশবাসীকে আশার কথা শোনান। অন্য কোনো দেশের এহেন অবস্থার রেফারেন্স দিয়ে আমরা বেহেশতের বাগানে শান্তিতে আছি বলে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলেন। কখনো ‘পুলিশ লাশ উদ্ধার করিয়াছে, তদন্ত চলিতেছে’ এ-

জাতীয় দায়সারা কথা বলে পরিত্রাণের ভাব দেখান। এখানেই যত বিপত্তি এসে ভর করে। কথাও সত্য। আমরা আম-জনতা আমাদের চামড়ার চোখ মেলে তো তাই-ই দেখছি। এদেশের মতলববাজ ব্যবসায়ীরা দেশ-পরিচালকদের বশে এনে ফেলেছেন। কীভাবে বশে এনেছেন, সাধারণ মানুষ তা জানে না, অনুমান করে। এসব মতলববাজ ব্যবসায়ীদের শুধু ব্যবসায়ী না বলে আমার মতো দুর্মুখেরা ব্যবসায়ী-রাজনীতিক বলতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করে। কারণ তাদের হাতেই সাধারণ মানুষের ভাগ্য নিয়ে কলকাঁঠি নাড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে ক্ষমতার বলয় গড়ে তোলার রাজনৈতিক ক্ষমতা। রাজনীতিবিদরাও আম-জনতাকে ভুলে নিজেদের ও ব্যবসায়ীদের টাকার ও ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে রাজনীতিবিদ নামকে রাজনীতিক-ব্যবসায়ী অভিধায় পর্যবসিত করেছেন। সাধারণ মানুষের দিকে দৃষ্টি কম। দৃষ্টি টাকা ও ক্ষমতার দিকে। টাকা ছিটিয়েই ভোটে পাশ করা যাবে, এমনটি ভরসা। একটা শেণির টাকা এবং ক্ষমতাই এ দেশের মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্তায় রূপ নিয়েছে। যাদের দায়িত্ব পালন করার কথা, তারা যে কোনো দায়-দায়িত্বকে ঠুনকো একটা কথা বলে এড়িয়ে যেতে চায়। কখনো জেগে ঘুমায়। এদিকে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস বয়ে যায়।

জীবনযাপন দিয়ে শুরু করেছিলাম। দেশের করকাঠামো জীবনযাপনের একটা প্রত্যক্ষ অংশ। গত ৩০শে নভেম্বর আয়কর রিটার্ন দাখিলের শেষ দিন ছিল। মেয়াদ বাড়িয়ে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২২ করা হয়েছে। করমুক্ত আয়ের শেষসীমা বাৎসরিক তিন লাখ টাকা। অর্থাৎ মাসিক আয়-রোজগার যাদের অন্তত পঁচিশ হাজার টাকা তাদেরকেই আয়করের আওতায় আনা হয়েছে। জানা মতে, কোনো পিয়ন, ড্রাইভার, দিনমজুর প্রভৃতি বাদে প্রত্যেককেই মাসে কমপক্ষে পঁচিশ হাজার টাকা রোজগার না করলে কখনো কখনো উপোস থাকতে হয়। এদের আমরা কর দিতে বাধ্য করছি। এদের আমরা 'করদাতার' খাতায় নাম লেখাতে চাচ্ছি। আমরা ব্যক্তিখাতে করের আওতা বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। এদেশে কত অবৈধভাবে অর্জিত কোটি কোটি টাকার মালিক কর না দিয়ে বিলাসী জীবনযাপন করছে, তাদের করের আওতায় আনা হচ্ছে না কেন? কত হাজার হাজার কোম্পানি হাজার হাজার কোটি টাকা মুনাফা করে, নামমাত্র কর দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে, তাদের হিসাবটা কে নিচ্ছে? যত দায়তে পড়েছে কায়ক্লেশে জীবনধারণরত ছা-পোষা আইনমান্যকারী ব্যাঙের আধুলি নিয়ে। অন্যভাবে বলতে গেলে, এই দ্রব্যমূল্যের বাজারে আয়ের একটা অংশ সরকারকে কর হিসেবে দিয়ে করদাতার ক্রয় ক্ষমতা বৈধভাবে কমিয়ে ফেলছি। তারা অবৈধ রোজগারকারীদের সাথে ক্রয় প্রতিযোগিতায় কোনোক্রমেই পেরে উঠছে না। সমাজজীবনে নাস্তানাবুদ হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটা পণ্য ও সেবা ভোগকারীকে জীবনযাপনের প্রতিটি পদে পদে অগণন ক্ষেত্রে ভ্যাটও দিতে হচ্ছে। এটাও তো একটা কর। দেশের পুরো অর্থব্যবস্থা অবৈধ

আয়-রোজগারকারীর দখলে। তাদের রোজগারের পুরোটাই করমুক্ত আয়। তাদের আয়কর দেওয়া লাগে না। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয় না। এ দেশে তাদের জয়জয়কার। সাধারণ মানুষের দুর্দশা দেখার কে আছে? আমরা কি করদাতাদের তেমন কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিতে পারছি? সামাজিক নিরাপত্তা দিতে পারছি? কর আদায়ের মাধ্যমে দেশ পরিচালনার জন্য যে আয় রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হচ্ছে, তার অনেকটাই লুটপাট-দুর্নীতি, অব্যবস্থা, দলীয় লোক-প্রতিপালনের নামে সিস্টেম লসে খেয়ে ফেলছে। এ বাস্তবতায় খেটে-খাওয়া নীতিবান মানুষ আয়করই-বা দিতে চাইবে কেন? নীতিই তাদের কাল হয়েছে। পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার এসব বিবেচনায় এনে দেশের প্রতিটা পেশার সুবিধাবাদি চালাক-চরিত্রের লোকজন তোষামোদি করে রাজনৈতিক-ক্ষমতার কাছে যাওয়ার অবিরাম প্রতিযোগিতায় নেমেছে; অনেকেই ক্ষমতার বলয়ের মধ্যে পৌঁছে গেছে। স্বার্থের মধু অনবরত চেটে চলেছে। কোষাগার শূন্য হবার পথে বসে গেছে; তবু চেটে চলেছে। এভাবে জীবনযাপন সুস্থ থাকে কী করে? দেশের অর্থব্যবস্থাই-বা ভালো থাকে কী করে?

কয়েক দিন ধরেই কোনো কোনো দৈনিকে, আবার সোস্যাল মিডিয়ায় 'ব্যাংক লুটপাট' বিষয়টা 'টক অব দ্য টাউন' হয়ে গেছে। যা ঘটেছে, তার থেকে অনেক বেশি পক্ষে-বিপক্ষে গুজব রটছে। গুজবে কান না দিয়েও কোনো উপায় নেই। এর আগেও যতবার 'অর্থ লুটপাটের' খবর বেরিয়েছে, সংশ্লিষ্ট পক্ষ সেটাকে ধামাচাপা দিতে সচেষ্ট হয়েছে, ক্ষতকে সারাতে এন্টিবায়টিক ব্যবহার না করে ক্ষতের উপর স্বার্থকভাবে মলমের প্রলেপ দিয়েছে। সাধারণ নাগরিকের কাছে ঘটনা সত্য বলে প্রতিয়মান হয়েছে। জীবনযাপনে উদ্বিগ্নতা বেড়েছে। 'অর্থ লোপাট', 'শেয়ারবাজার কেলেংকারী', 'স্যুটকেস পাচার', 'ব্যাংক লুট', 'বেগমপাড়া', 'অর্থ পাচার'– এসব কথা তো সাধারণ মানুষের জন্য এ দেশে জীবনযাপনের উপযোগী কোনো সুখকর কথা না। দেশ পথে বসার শামিল। এসব কথা এদেশের মানুষ অনেক দিন থেকেই শুনে আসছে। ইদানীং পত্রিকার পাতায় ও মানুষের মুখে শব্দগুলো বেশি বেশি উচ্চারিত হচ্ছে। মানুষের দুর্দশা বাড়ছে। তাহলে এইসব আর্থিক লুটপাটের কারণেই কি দ্রব্যমূল্যের বাজার চড়কগাছে উঠে যাচ্ছে? সাধারণ মানুষের তিলে তিলে জমানো ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ কোনো ব্যবসায়ী-রাজনীতিক ছলচাতুরী করে রাজনীতির ছত্রছায়ায় নিজ পকেটে ভরে ফেলবে– এটাই-বা কেমন কথা? দেশটা কি মগের মুল্লুক হয়ে গেছে না-কি? এমন ঘটনা তো এর আগে অনেকবারই শুনেছি। এ-ও শুনেছিলাম, একটা ব্যংকের মালিকানা রাজনীতির ছত্রছায়ায় দখলে নেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকেই আবার অর্থ লোপাটের কথা বাজারে আসছে। তাহলে এই অর্থ লোপাটের জন্যই ব্যংকটা দখলে নেওয়া হয়েছিল কি-না এমন কথা দুর্মুখদের মুখ থেকে ভেসে আসা অযৌক্তিক নয়।

আমি দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের অবস্থা পারতপক্ষে মুখে আনতে চাইনে। আবার দেশের সার্বিক পরিবেশ ও মানুষের মনোজাগতিক পরিবেশ, জীবনযাপন নিয়ে কিছু করতে গেলে, বলতে গেলে অবস্থাকে এড়িয়েও চলা যায় না– একটু বললেও বলতে হয়, প্রসঙ্গক্রমে চলে আসে। প্রতিদিনের পত্রিকাটা যথাসম্ভব মনোযোগ দিয়ে পড়লে এবং পোড়া চোখ দুটো সমাজের দিকে মেলে ধরলেই ভূতভবিষ্যৎ মোটামুটি পরিষ্কার দেখা যায়; আমরা কোথায় যাচ্ছি বোঝা যায়। কথা ছিল রাজনৈতিক নেতারা তাদের কর্মীদের সাথে নিয়ে জনসেবা, সমাজসেবা, দেশসেবা করবে। জনসেবা, সমাজসেবার জন্যই রাজনীতি। কিন্তু স্বপ্ন ভেঙে সবকিছু দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। বলা যায়, কোনো রাজনৈতিক দলেরই গঠনতন্ত্রের মূলনীতির সাথে তাদের কথা ও কাজের কোনো মিল নেই। সকল নোংরামি, কুশিক্ষা, কুটিলতন্ত্র ও জিঘাংসার আঁতুড়ঘর এখন এই দিগভ্রষ্ট, নীতিবিবর্জিত রাজনীতি। রাজনীতি এখন ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে দেশ ও সাধারণ মানুষের সম্পদ লুটপাটের একচেটিয়া ব্যবসা। এরা দেশকে যে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এবং এ জনগোষ্ঠীর গন্তব্য যে কোথায় তা মনের চোখে ভেসে ওঠে। চোখে ভেসে ওঠাটা হয়তো এ দেশে অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। ইচ্ছে করে দেখতে চাইনে, তবু চোখে চোখে ভাসে। তাই না-লিখে পারিনে। চোখ বন্ধ করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিকে তাকালে কেন জানি লাগামহীন দুর্নীতি, লুটপাট, বলদৃপ্ত মিথ্যাচার, দমন-পীড়ন, জিঘাংসা, অব্যবস্থাপনা, কুশিক্ষা, মারামারি, খুনখারাপি, গায়েব, প্রতিহিংসা, স্বার্থপরতা, ক্ষমতার দাপট ইত্যাদির ছবি মানসপটে ভেসে ওঠে। সমস্ত ব্যক্তিস্বার্থের প্রতিভূ চটকদার ভেক ধরে ভিন্ন পথে দেশের সম্পদ লুটপাট করার জন্য জোটবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় এক জায়গায় জড়ো হয়েছে, একই উদ্দেশ্য সফল করে চলেছে। সব বিকৃত ফন্দি-ফিকির বিষবাষ্পের মতো সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে, সমাজকে গ্রাস করেছে এবং করে চলেছে। সমাজের দু কূল প্লাবিত করে ছেড়েছে। এ সমাজেই আমাদেরকে বসবাস করতে হচ্ছে। ওদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হলো, এত সুন্দর একটা দেশ, অথচ ওরা জনগোষ্ঠীকে জন-আপদে পরিণত করেছে। এই নীতিহীন, চরিত্রবিধ্বংসী, মনুষ্যত্বহীন, সর্বভুক রাজনৈতিক স্রোতধারা কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র ও সুস্থ সমাজব্যবস্থা উন্নয়নে বিলীন হওয়া জরুরি। আমাদের মনে রাখতে হবে, 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'/দেশ পুড়ে ছারখার হয় সুনীতি বিহনে।

(প্রকাশ: ৫ ডিসেম্বর ২০২২, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ– প্রফেসর, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

দেশ মেরামতের কাজে আমরা এগিয়ে আসতে পারি

অনেকদিন পর গ্রামের বাড়িতে যেতে হলো। চলতে পথে মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, উন্মুক্ত প্রকৃতি, মানুষ, পরিবেশ, দিগন্ত-বিস্তৃত মুক্তাকাশ, একটা ভাবুক মন ও মনের পর্যবেক্ষণ নিয়ে এ ভ্রমণ। গ্রামে যেতে কমপক্ষে আড়াইশ কিলোমিটার সামনে চলতে হয়। এ চলাতে মনের মধ্যে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে তোলা আন্ডারলাইং এজামশনের সত্যতা বারবার যাচাই করি। পত্রিকার পাতায় লিখে সে দেখা অনেক সময় প্রকাশ করি। মূর্ত (কংক্রিট) কোনো বিষয়কে দেখে সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলে সত্য প্রকাশ করলে কোনো বাধা আসে না। বিমূর্ত (এবসট্রাক্ট) কোনো বিষয় যেমন– পরিবেশ, মানুষের আচার-আচরণ, সমাজ নিয়ে কোনো সত্য প্রকাশ করতে গেলেই আপত্তি আসে। আমার সহকর্মী, পরিচিতজনের কেউ কেউ গবেষণাভিত্তিক কিছু লিখতে বলেন। বুঝি, আমার এ লেখা কোনো রাজনীতির পক্ষাবলম্বন হয় কি-না, তাই। পক্ষে লিখতে পারলেই কেউ কেউ বাহবা দেন, বিপক্ষে গেলেই যত আপত্তি। লেখাতে গবেষণার সমর্থন চান। এ দেশে যেহেতু সমাজ ও পরিবেশ নিয়ে গবেষণা কম। তাই পরিণামে বিমূর্ত কোনো বিষয়ে লেখা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। আমার বক্তব্য ভিন্ন। গ্রামের বাড়িতে যাওয়া-আসার পথে, গ্রামে বসে, প্রতিদিনের পত্রপত্রিকায় যা বারবার দেখছি ও শুনছি, ভাবুক মনের এটাও এক ধরণের গবেষণা। একে পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা বলা যায়। বিষয়টা মূর্ত, বিমূর্ত যা-ই হোক, সত্য সত্যই। রাজনীতি সমাজ নিয়ে ডিল করে। আমরাও সমাজিক শিক্ষা ও পরিবেশ নিয়ে লিখি। সেজন্য কোনো কোনো বিষয়ে রাজনীতির চলতি ধারণার সাথে আপাতদৃষ্টিতে সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের লেখা কোনো দল বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়; সামাজিক অবক্ষয়, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, দুর্নীতি, দুরাচারবৃত্তির বিরুদ্ধে।

ঢাকা থেকে বেরোতেই পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বুড়িগঙ্গা নদী। সমস্ত প্রকার জঞ্জাল, আবর্জনা, বর্জ ফেলে পানি আজ কলুষিত, ব্যবহারের অযোগ্য, দুর্গন্ধময়। এক হাজার টাকা বকশিশ দিলেও কেউ হয়তো ঐ পানিতে ডুব দিতে রাজী হবে না। আমরাই নদীটাকে নষ্ট করে ফেলেছি। নদীতে এখনো স্রোতের গতিময়তা আছে। ভাবি, এ নদীর পানি কি আবার ব্যবহার ও অজু-গোসলের উপযুক্ত করা যায়? মনের দৃঢ়তা বলে, ইচ্ছে করলেই তা সম্ভব। কাজটা করার জন্য ইচ্ছেশক্তিই যথেষ্ট। আশায় বুক বেঁধে আছি, নদীর পানিতে একসময় স্বচ্ছতা আসবে।

পথ চলতে অগনিত মানুষ, সমাজ, পরিবেশ পেরিয়ে তারপর নিজের ঠিকানা। চলতে পথে এক ঠোঙা মুড়ি কিনে খেলেও মুড়ির মানকে যাচাই করি, মুড়িতে

ইউরিয়া সার মেশানো আছে কিনা দেখি, সরষের তেলের ভেজাল কতটুকু ইত্যাদি বিবেচনা করি। বিক্রেতা লোকটার আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ করি। এভাবে প্রতিদিন শত কাজের মধ্যে এদেশের মানুষ, সমাজ ও পরিবেশের উত্থান-পতন মনের মুকুরে গেঁথে সাজাচ্ছি। প্রতিটা পদে পদে হাজারো মানুষের মনের সাথে অবিরাম ক্রসিং করছি। সিদ্ধান্তে আসছি। দেখছি, আমরা মনুষ্যত্ববোধ থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। পরিবেশ ও সমাজের মূল উপাদানও এই মানুষ। পরিবেশ ও সমাজও বুড়িগঙ্গা নদীর স্রোতের মতো বহমান, গতিশীল। এর অবস্থাও বুড়িগঙ্গা নদীর মতো বানিয়েছি। ইচ্ছে করলেই তা ভালো বা খারাপের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারি। সেখানেও ইচ্ছেশক্তিই যথেষ্ট। সমাজ পরিচালকদের মন-মানসিকতা ও স্বভাবের উপর নির্ভর করে সমাজ সামনের দিকে ধাবিত হয়। আসলেই তারা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, সমাজ তাদেরকে অনুসরণ করে। এটা সমাজ ও পরিবেশের নিয়ম। নদীর পানিতে স্বচ্ছতা আনতে পারলে সমাজ ও পরিবেশেরও ইতিবাচক পরিবর্তন ও সুস্থতা আনা সম্ভব। আশায় বুক বেঁধে আছি, সমাজ ও পরিবেশ একদিন নিশ্চয়ই ভালো হবে। প্রয়োজন সমাজ পরিচালকদের মন-মানসিকতার পরিবর্তন ও সদিচ্ছার। বর্তমান সমাজ ও পরিবেশের দিকে তাকালে দেখি উপরতলা থেকে নীচতলা পর্যন্ত দুর্নীতি, বলদৃপ্ত মিথ্যাচার, ক্ষমতার দাপট, কুশিক্ষা, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা, ধোঁকাবাজি, দুরাচারদের দৌরাত্ম্য, প্রতারণা, পরিবেশের অধোগতি, মনুষ্যত্বের ঘাটতি ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর দায় কোনো একক রাজনৈতিক দলের উপর চাপিয়ে লাভ নেই। বিগত একান্ন বছরে আমরা দিনে দিনে এ পর্যায়ে উপনীত হয়েছি। এ সবকিছু দিনে দিনে সামাজিক নিয়মে রূপ নিতে চলেছে। এ থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পথের সন্ধান না করতে পারলে আমাদের পরিণতি ভয়াবহ হতে বাধ্য। তখন কোনো দলের প্রতি আনুগত্য, দলবাজি, তন্ত্র-মন্ত্র আর কাজে আসবে না।

গ্রামের পাশে বাজারে গেলাম। গ্রামের প্রতিটি তেমাথা পথের ধারে চায়ের দোকান গড়ে উঠেছে। সেই ভোররাত থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত প্রতিটা দোকানে লোকজনের ভীড় লেগেই আছে। বিভিন্ন দোকানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের আড্ডা। অবিরাম পারস্পরিক দোষারোপ চলছে। বিভিন্ন আলোচনা, সমালোচনা, মতামত- একের প্রতি অন্যের ছিদ্রান্বেষণ চলছে। কে কাকে কীভাবে পরাস্ত করতে পারবে তার কুটকৌশলও চলছে। সাথে চলছে একের বিরুদ্ধে অন্যের চরিত্রহনন। কে কাকে কোন কুটবুদ্ধি খাটিয়ে ল্যাং মারবে, চলছে তার অবিরাম রিহার্সল। এ এক আজব সমাজ ও পরিবেশ। কোনো সামাজিক শিক্ষা নেই, জ্ঞানের কোনো কথা নেই, নেই কোনো জীবন উন্নয়নমুখী আলোচনা, উন্নতির

ভাবধারা, সুস্থ রাজনৈতিক চেতনা। শুধু পরচর্চার উপর ভিত্তি করে এভাবে কোনো সমাজ চলতে পারে না। চললেও পরিণতি ভালো হয় না। গ্রামে দেখলাম, কোনো রাজনৈতিক কর্মী নেই, শৃঙ্খলা নেই, শুধুই সামাজিক দ্বন্দ্ব, গ্রুপিং, মারামারি– সকলেই যেন 'বিরাট মহান নেতা'। মগজটা ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের ধান্দায়।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা মানুষের মনোভাব ও আচরণের উপর ভিত্তি করে মানুষকে এক্স গ্রুপ ও ওয়াই গ্রুপে ভাগ করেছে, আবার পরে জেড গ্রুপও করেছে। অর্গানাইজেশনাল বিহ্যাভিয়ার মানুষের চিন্তা-চেতনা ও আচরণকে 'সিটিজেনশিপ বিহ্যাভিয়ার' ও 'উইথড্রোয়্যাল বিহ্যাভিয়ার'– এ দুভাগে ভাগ করেছে। আমার দেখায় অন্য দেশের মানুষের মতো বাঙালির মন-মানসিকতা ও আচার-আচরণের বিভক্তি এভাবে সঠিক হয় না। এটা আচরণগত। এ দুটোর সমন্বয়ে 'বাঙালি বিহ্যাভিয়ার' নামে আরেকটা আলাদা শ্রেণিবিভক্তি করা সমীচীন হবে। প্রতিটা ধর্মও মানুষকে ভাগ করেছে। সনাতন ধর্ম দেবতাদের পক্ষের শক্তি ও অপ-দেবতাদের পক্ষের শক্তি– এ দুভাগে মানুষকে বিবেচনা করে। ইসলাম ধর্ম মানুষকে তার বিশ্বাস এবং ভালো ও মন্দ কাজের ভিত্তিতে বিভাজন করেছে। আমাদের দেশে আমরা সুবিধাবাদের বিজ্ঞাপন প্রচার করতে গিয়ে রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিতে জনগোষ্ঠীকে ভাগ করেছি। এদেশে কে চরিত্রগত ও স্বভাবজাতভাবে ভালো বা মন্দ, কে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত– এ বিভাজনের কোনো গুরুত্ব নেই। কোনো কাজ করতে গেলে আগেই প্রশ্ন ওঠে, কে কোন দল করে; অর্থাৎ ভাগ করেছি রাজনৈতিক দলবাজির ভিত্তিতে। সব দলের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। যার যত মুখের জোর, পারস্পরিক দোষারোপ ও লাঠির জোর, দলে তার গুরুত্ব বেশি। সেই তত ত্যাগী নেতা। আমার দল করলেই সে ধোয়া তুলসীর পাতা, আমার বিরুদ্ধে গেলেই যত গালাগালি। প্রয়োজনে কাউকে দমন করার জন্য কিংবা দুর্নাম রটানোর জন্য নামের আগে বা পরে মনগড়া একটা খারাপ বচনের ট্যাগ ঝুলিয়ে দিতে পারলেই কেল্লা ফতে। এভাবেই রাজনৈতিক পরিবেশ, সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালত, সমাজ বেওয়ারিশ চলছে। সমাজ ও পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ দেশ ছাড়া বিশ্বে কোথাও এ ধরনের বিভাজন আছে বলে আমার জানা নেই।

আমাদের চামড়ার চোখে যেটুকু দেখি, মানুষের কেউ কেউ আছেন মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন, ন্যায়নিষ্ঠ, জাগ্রত বিবেক দ্বারা চালিত, সুশিক্ষিত। নিজের থালার ভাত অন্যকে ভাগ করে দিয়ে সবাই মিলে খেয়ে তৃপ্তি পায়। আবার অনেকেই আছেন অন্যের থালার ভাত কেড়ে নিয়ে নিজের থালা ভরে তৃপ্তি পায়। কেউ

নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়, আবার কেউ বনের মোষ নিজের খোঁয়াড়ে এনে বাঁধে। সবই মানুষের প্রকৃতি। সব প্রকৃতির মানুষই সমাজে আছে। মানুষের এই নৈতিক ও মানসিক ভিন্নতাকে তো আর অস্বীকার করা যায় না! এই প্রকৃতি বা স্বভাবের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগের গুরুত্ব না দিয়ে আমরা যদি ভালো-মন্দ এক করে ফেলি, মন্দ স্বভাবের লোকগুলোকে সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করতে দিই, তখনই যত বিপত্তি এসে দেখা দেয়। সেজন্য সামাজিক উন্নয়ন ও সুস্থ পরিবেশ অধরাই রয়ে যায়। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা জনগোষ্ঠীর একটা অংশকে মানবসম্পদ বলে। আমার মতো দুর্মুখেরা অন্য অংশকে ‘মানব আপদ’ বলি। মানবসম্পদ অংশকে আমরা সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীও বলতে পারি। প্রতিটা এলাকাতেই এই সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর বসবাস। এই সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক দায়িত্ব রয়ে গেছে। তারা দায়িত্ব সচেতন। আমরা তাদেরকে দায়িত্ব পালন থেকে দূরে রাখছি। তাদের অনেকেই বর্তমানে সামাজিক কোনো কাজে আর নিজেকে জড়াতে চান না। অর্থনীতির একটা নীতি হলো খারাপ টাকা ভালো টাকাকে বাজার থেকে বের করে দেয়। সমাজের খারাপ লোকগুলোও খারাপ পরিবেশ ও সমাজ দিয়ে ভালো স্বভাবের লোকগুলোকে ঘরবদ্ধ অবস্থায় থাকতে বাধ্য করছে। আমরা আমাদের সমাজ ও পরিবেশ গড়ার কাজ এই সুশিক্ষিত লোকগুলোর হাতে ছেড়ে দিতে পারি। তাদেরকে ঘরের বাইরে বের করে এনে কাজ দিতে পারি। তারা ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ গড়তে পারেন।

সামাজিক উন্নতি ও সামাজিক শিক্ষার বিভিন্ন পথ সমাজ পরিচালকরা বেছে নিয়েছেন। উন্নতির চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ফলাফল বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি। কোনো সমাজের সুশিক্ষিত অংশ দিয়ে সেই সমাজের সুশিক্ষার আলো-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক শিক্ষা দেওয়া, ভালো হবার প্রশিক্ষণ দেওয়া, নিয়মিত কাউন্সিলিং করা, সামাজিক সেবা দেওয়া সমাজ-শিক্ষার উন্নয়ন ও পরিবেশ উন্নয়নের একটা পথ (এ্যাপ্রৌচ) হতে পারে। এটা মানবসম্পদ গড়ার একটা প্রক্রিয়া। সামাজিক শিক্ষা ও পরিবেশ ভালো হয়ে গেলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপর এর সুপ্রভাব পড়তে বাধ্য। সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা সমাজসেবার এ কাজকে পরকালের জন্য ইবাদত হিসেবেও গণ্য করতে পারেন, আবার সামাজিক দায়িত্ব হিসেবেও নিতে পারেন। এভাবে এ দেশের অনেক সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। একবার শুরু করতে পারলেই দিনে দিনে এটা সামাজিক সংস্কৃতির অংশ হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশ এভাবেই পরিবেশ ও সামাজিক শিক্ষা উন্নত করেছে। এ পথ বিনা-খরচের একটি ধন্বন্তরি ও উপাদেয় পথ। জনগোষ্ঠী ও সমাজ এটা বিনা বাধায়, নির্দ্বিধচিত্তে মেনে নেবে। শুধু শিক্ষিত

জনগোষ্ঠীকে কাজ করার উপযুক্ত পরিবেশ দিতে হবে। দেখতে হবে কেউ যেন ব্যক্তিস্বার্থে কিংবা গোষ্ঠীস্বার্থে এদের নামের আগে বা পরে কোনো খারাপ শব্দের মতলববাজির ট্যাগ না লাগিয়ে দেয়। এ বিষয়ে প্রতিটা জেলা ও উপজেলার সরকারি কর্মকর্তাদের একটু যত্নবান হতে বললেই চলে।

আমরা বিশ্বাস করি, জাতীয় উন্নয়নের যত পথের কথাই আমরা বলি না কেন, মানবসম্পদের উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন ও উৎকর্ষ কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। বিগত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বাংলা একাডেমি মিলনায়তনে এদেশের অনেক দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, গবেষক, সরকারি কর্মকর্তা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' (জাশিপ)-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সেখানে সামাজিক শিক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সমাজসেবার উন্নয়নে উল্লিখিত এ মডেল বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। মূলপ্রবন্ধকার বলেন, 'জাশিপ' একটি সামাজিক আন্দোলন যা দেশের সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সমাজসেবা করার জন্য একত্র করবে, প্রতিটি এলাকায় সামাজিকভাবে ও কেন্দ্রীয়পর্যায়ে সরকারের পাশাপাশি শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাবে। অনেক শিক্ষাবিদ অনেক দিক-নির্দেশনামূলক ও গঠনমূলক বক্তব্য এ অনুষ্ঠানে তুলে ধরেছেন। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের' মূল নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতির সাথে একমত পোষণ করেছেন। এদেশের সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী, সংবাদ মাধ্যম এভাবে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে দেশ মেরামতের কাজে অংশ নিতে পারেন। আশা করা যায়, 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' জাতীয় উন্নয়নে আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারবে।

(প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

‘পড়েছি যবনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে’

ছোটবেলায় আমি নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবতাম। লুকিয়ে ঘর থেকে মধু নিয়ে কিছুটা চেটে চেটে খেতাম, আবার অনেক্ষণ ধরে ঠোঁটে ঘষতাম। জীবনের বেলাশেষে এসে দেখছি, আমার সে মধু-থেরাপি কাজে লাগেনি, বিষমাখা কথাই রয়ে গেছে। তাই আজীবনই অপ্রিয় সত্যকথক হয়েই রয়ে গেলাম।

কখনো মনে হয় দেশটা ‘বিষকুম্ভ’ এবং আমরা ‘বিষদিগ্ধ’ হয়ে গেছি। আশা ছিল সুসাহিত্যিক হব। জনপ্রত্যাশিত সাহিত্য রচনা করে যশস্বী হব। সে গুড়ে বালি। ‘যা হয়নি বিয়ের রাত্তির, তা হবে আবার আশ্বিন-কার্তিক’! এদেশের যেদিকেই চোখ যায় বিষাদের চিহ্ন, শঠতা, হতাশা, দুরাশার দিগন্তবিস্তৃত কালোরেখা, ‘চাটার দলে’ ভরপুর; সুসাহিত্যিক হব কীভাবে! আচ্ছা, পশ্চিম দিকে নিকটেই তো ‘পলাশীর প্রান্তর’। ‘মীর জাফর আলীর দল’ কি শেষমেশ পুব দিকেই বেশি ঢুকেছিল?

কী দেখে ভালো কথা লিখবো! কিশোর বয়সেই দেশের স্বাধীনতা অর্জন দেখেছিলাম। সেদিক থেকে নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান ভাবতাম, পুলকিত হতাম। স্বাধীনতাযুদ্ধের আগের কথা না বলি, তখন তো পরাধীন ছিলাম। তারপর স্বাধীন হলাম। নিজের ইচ্ছাধীন মুক্তভাবে চলতে ও সিদ্ধান্ত নিতে শিখলাম, অনন্যনির্ভর হলাম। তবুও আমাদের অবস্থা কেন এমন হলো? আমরা কেন ‘সজীব জন-গণতন্ত্র’কে কবর দিয়ে, ‘উন্নয়নের গণতন্ত্র’কে লুফে নিলাম? আমাদের পরে স্বাধীন হয়েও তো বেশ কয়েকটা দেশ ওপরে উঠে গেছে। শুধু কয়েকটা অবকাঠামো গড়াই উন্নয়নের মাপকাঠি নয়। দেশের সমস্ত নিষ্প্রাণ সম্পদকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগিয়ে দেশকে উন্নত করার জন্য যে জনসম্পদ, এর এ হীনদশা কেন? যে জনসম্পদ অন্যান্য নিষ্প্রাণ সম্পদকে দেশের কাজে লাগাবে, তারা তো জন-আপদ হয়ে নিষ্প্রাণ সম্পদগুলোকে উল্টো কুক্ষিগত করছে। জীবনে কত দেশেই তো গেলাম। যখনই সবুজ রংয়ের এ পাসপোর্টটা হাতে দেখে, সন্দেহের তীর আমার দিকে পড়ে। চেকিংয়ে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। বুঝতে পারিনে কেন এমন করে। আমার অপরাধটা কী, কেউ বলে না। বর্তমান অবস্থায় অধিকাংশ দেশই আমাদের ভালো চোখে দেখছে না, তা নির্বাচন ‘নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক’ হোক বা কৌশলী ‘সংবিধান রক্ষার নির্বাচন’ হোক। সবরকম ‘বিদেশী বন্ধু’ই তো আমাদের আছে। নিশ্চয়ই আমাদের অবর্তমানে তারা ট্যারা চোখে মুচকী হাসে, মনে মনে দীনহীন ভেবে আমাদের উপহাসের চোখে দেখে। এ উপহাসের জেরও কি আমাদের সাধারণ মানুষকেই বইতে হবে? আমরা এত

'ঠোটকাটা' হলাম কেন? আমার এ 'হীনমন্যতায় ভোগা রোগ' কি শুধুই আমার, না কি প্রতিটা সচেতন নাগরিকের? ছোটবেলায় কবিতায় পড়েছিলাম, 'আপনারে বড় বলে বড় সে নয়, লোকে যারে বড় বলে বড় সে হয়।...হিতাহিত না জানিয়া মরে অহংকারে, নিজে বড় হতে চায় ছোট বলি তারে।' ছোটবেলায় পড়া কবিতা থেকে নেওয়া শিক্ষা কি ভুলে যেতে হবে? না কি বিজ্ঞাপন দিয়ে জিব ঘুরিয়ে যে বড় বড় কথা বলে, তাকে বড় বলতে হবে? আমরা গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধারে দেশের স্বার্থকে বিকিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করিনে কেন? আমি কি নিজেকে অতিরিক্ত বুদ্ধিমান ভেবে ঠোঁটে মধু ঘষে মধুভাষী হতে পেরেছি? ব্রিটিশ ও পশ্চিম-পাকিস্তান আমাদের শোষণ করেছে, আমরা তা জানি। এই বায়ান্ন বছর ধরে নিজেদের মানুষ দিয়েই কি আমরা কম শোষিত হচ্ছি? যত দিন যাচ্ছে, শোষণের মাত্রা বাড়ছে, ধরন ও রূপ পালটাচ্ছে। অনন্য প্রতারক, নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী, দুর্নীতিবাজ, জোচ্চোর, ক্লাউনে ক্রমেই দেশ ভরে যাচ্ছে। কথায় বলে, 'বাঘের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভূত বলে পেলাম কাছে'। এখন কোথায় যাব? একটা দেশের মানবসম্পদ নষ্ট হয়ে গেলে তাদের আর থাকে কী!

একদিনের যুগান্তরের কয়েকটা খবর উল্লেখ করি (১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩): 'সামগ্রীক অর্থনীতির ওপর বড় আঘাত– বাংলাদেশ থেকে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি বাড়ছে, কিন্তু এরপরও কমে যাচ্ছে রেমিট্যান্স প্রবাহ'। 'মূল্যস্ফীতির অসহনীয় ঊর্ধ্বগতিতে বিশিষ্ট ২৪ নাগরিকের উদ্বেগ।' 'মেঘনায় আ.লীগের দুগ্রুপের সংঘর্ষে নিহত ১ আহত ১০।' 'দিশেহারা মানুষ যাবে কোথায়? –সংকট, সংকট আর সংকট। সার্বিক সংকটের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে জনগণ। যারা এ সংকট থেকে জনগণকে উদ্ধার করতে পারেন, তাদের এ বিষয়ে মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। ক্ষমতাসীনদের মাথাব্যথা একটাই– কিভাবে নির্বাচনের দুয়ার অতিক্রম করে ক্ষমতায় টিকে থাকা যাবে। ক্ষমতার বাইরে যারা আছেন, তাদেরও একই চিন্তাভাবনা– কীভাবে ক্ষমতার মসনদে বসা যাবে। জনগণের কল্যাণের বিষয়টি রাজনীতিকদের মাথায় নেই।'

এই খবরগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে জায়গা সংকুলান হবে না। ভাসা ভাসা কিছু বলি। মিথ্যার বেসাতি, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, দলবাজি সেই স্বাধীনতার পর থেকে এদেশে লেগেই আছে। কখনো কখনো কমবেশি হয়েছে মাত্র। এই সবকিছুর মূলে বিকৃত মানসিকতার রাজনীতি। আমরা রাজনৈতিক দলের গুরুরা ছাত্র ও যুব-সম্প্রদায়ের হাতে রামদা-কিরিচ তুলে দিয়েছি। দলে-দলে দ্বন্দ্ব, ভাইয়ে-ভাইয়ে মারামারি-কোন্দল, একই দলে অর্ন্তদ্বন্দ্ব বহাল রয়েছে।

যার যা খুশি করে বেড়াচ্ছে। আইনের শাসন নেই। নানাধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেশটা ভরে গেছে, কিন্তু (ব্যতিক্রম বাদে) কোথাও সুশিক্ষা নেই। সামাজিক শান্তির পরিবেশ কোথায়? তৃণমূল পর্যন্ত ঘরে ঘরে রাজনৈতিক সংঘাত জিইয়ে রেখেছি। শিক্ষার মান যারপরনাই নীচে নামিয়েছি (মাস্টার হওয়াতে যা স্বচোক্ষে দেখছি)। এদেশে যত রাজনৈতিক দল আছে, বিশ্বের আর কি কোথাও তা আছে? গ্রাম-গঞ্জের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করে ফেলেছি। দুর্নীতি, মাদক, লুটপাটের প্রকাশ্য আসর বসেছে। জীবনের প্রতিটি পদে পদে টাউট, বাটপার, প্রতারকে ছেয়ে গেছে। সমাজ থেকে সুশিক্ষা, মানুষের প্রতি মানুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, বিশ্বাস উঠে গেছে। রাজনীতির নামে প্রতিহিংসা শেখাচ্ছি, অপশিক্ষা-কুশিক্ষার বীজ বুনছি, হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছি, আবার মুখে আশার বুলি আওড়াচ্ছি, 'ময়না পড় রে জাদুর ধন, কাল সকালে ফড়িং মেরে দেবো বারো পণ, ময়না পড়রে...।' এসবই আমাদের আত্মপ্রবঞ্চণা। কোনো রাজনীতিক আমার দিকে হেই হেই করে তেড়ে আসার প্রয়োজন নেই; আত্মজিজ্ঞাসা কোথায়? নিষ্পেষিত, নিপীড়িত লক্ষ মানুষের বুকফাটা কান্না ও আহাজারি বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। প্রকৃতির প্রতিশোধ বলেও তো একটা কথা আছে। সাধারণ মানুষ প্রতিশোধ না নিলেও হয়তো প্রকৃতির প্রতিশোধ কেউ রোধ করতে পারবে না। যে যা-ই বলুক আমাদের আত্মশুদ্ধির সময় এসেছে।

এত সুন্দর একটা দেশ। এদেশের মাটির গুণের তুলনা নেই। মনের অজান্তেই কোথাও কোনো একটা বীজ পড়ে থাকলে তা অঙ্কুরোদ্গম হয় এবং কোনো এক সময়ে কচি-পল্লবে ভরে যায়। শাশ্বত অতিথিপরায়ণ ও সহজ-সরল বাঙালির আজ এ কী দশা! স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও তো এরা আত্মত্যাগী, দেশপ্রেমী ছিল। এদের মাথায় এত জটিলতা-কুটিলতা কে কখন ঢুকালো? শুনতে খারাপ লাগলেও বলতেই হবে: এদেশের এই দিগভ্রষ্ট-কুলনাশী কুটিল রাজনীতি সব নষ্টের জননী।

এদেশ জনসংখ্যাধিক্যের দেশ। মধ্যপ্রাচ্যসহ পশ্চিমা বিশ্বের অনেক দেশই জনশক্তি সংকটে ভুগছে। আমাদের এ জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করে বিদেশে পাঠালেই আর্থিক সংকটের চূড়ান্ত সমাধান হয়ে যায়। আমরা যুব সমাজের ক'জনকে সম্পদ তৈরি করে আয়-রোজগারের জন্য বিদেশ পাঠাচ্ছি? অধিকাংশ পাঠাচ্ছি উটের রাখাল কিংবা দিনমজুর হয়ে কাজ করার জন্য। রেমিট্যান্স বেশি আসবে কীভাবে? আমাদের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা কোথায়? কাগজে-কলমে যদি কিছু থেকেও থাকে, সে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন আদৌ আছে কি? দিন পেরোতে পেরোতে বছর, বছর

পেরোতে পেরোতে বায়ান্নটা বছর পেরিয়ে গেছে। প্রাইমারি, হাইস্কুল ও কলেজে যে লেখাপড়া আমরা শেখাচ্ছি, আগামী দশ-পনেরো বছরেও শিক্ষার মানের কোনো উন্নতি হওয়ার আশা নেই, যদি শিক্ষাব্যবস্থাপনার আমূল পরিবর্তন না করা হয়। আবার সকল সেক্টর দুর্নীতিযুক্ত রেখে এককভাবে শিক্ষাকে গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। কে করবে? এসব নিয়ে ভাবার লোক কোথায়? কেউ চাকরি করার নামে স্বার্থ খোঁজে; কেউবা জনপ্রতিনিধির আলখাল্লা পরে স্বার্থ খোঁজে। সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ দেখা ও ভাবার কে আছেন, ক'জন আছেন?

শুধু জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করে এবং জনশক্তি রপ্তানি করে এদেশকে উন্নত ও স্বনির্ভর করা সম্ভব। বুয়েট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু বিভাগের অনেক ছাত্রছাত্রী পাশ করার এক বছরের মধ্যে বিদেশী বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যায়। কম সংখ্যক ফিরে আসে। বাকিরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে বেশি বেতনে সেখানে কাজ করে, দেশে টাকা পাঠায়। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও কেউ কেউ যায়। বাঙালির মেধা খারাপ, একথা নিশ্চয়ই কেউ বলবে না। গলদটা কোথায়? এদেশের প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য যদি এমনই হতো যে, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও উন্নত দেশের চাহিদা মতো আমরা প্রাজ্যুয়েট তৈরি করবো, তারা মেধার জোরে বিদেশ যেয়ে বড় বড় পদে কাজ করবে। এমনটি আশা করা কি অতিশয়োক্তি হবে? আমরা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করি রাজনৈতিক কারণে। ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে রামদা-কিরিচের ট্রেইনিং দেওয়ার জন্য। নিজেদের দলের লোকগুলোকে সেখানে বিভিন্ন পদে নিয়োগ দিয়ে রাজনীতির মাঠ দখল করার সুপ্ত অভিপ্রায়ে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইসেন্স দিই রাজনৈতিক বখশিশ বা নজরানা হিসেবে, শিক্ষা-বাণিজ্য করে খাওয়ার জন্য। এদেশে যত বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ গড়ে উঠেছে, সেখানে যদি আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা দেওয়া যেত, এদেশের কোনো কাজে বাইরের দেশের লোকের প্রয়োজন হতো না। আমাদের অনেকেই বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তো; দেশের মর্যাদা বাড়াতো, প্রচুর রেমিট্যান্স পাঠাতো। টাকার অভাব হওয়ার কথা ছিল না। টেকনিক্যাল কলেজ ও ইনস্টিটিউট থেকে যদি চাহিদা মোতাবেক ব্যবহারিক শিক্ষা ও ভাষা শিক্ষা দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে জনশক্তি পাঠানো যেত, ছেলেমেয়েরা অন্তত বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেত। মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে উটের রাখাল হতো না। কিন্তু যত কথাই বলি 'বিড়ালের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধবে কে'? ঘণ্টা বাঁধতে নিশ্চয়ই এই মাস্টারসাহেবকে ডাকা হবে না। কোথায় সে 'বংশীবাদক'? এগুলো করলে যে, দেশে রাজনীতির ব্যবসা আর থাকে না, এটাও তো একটা ভয়।

আমি তো দেখি, মেরে-কেটে উৎসন্ন করে না দিলে এদেশে টাকার অভাব হওয়ার কথা নয়। গত দু-সপ্তাহ আগে আমাদের পাশের গ্রামের এক গরিব যুবকের দুটো কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়াতে অনেক দিন ভুগলো। জমিজমা শেষ, গোয়ালের গরু শেষ, হাঁস-মুরগি শেষ, দান-খয়রাত নেওয়া শেষ। শেষে জীবনও শেষ। মৃত্যুর আগ-মুহূর্তে দামি যে শেষ ইনজেকশনটা দেওয়া হলো, সেটার গায়েও লেখা ছিল, '১৫% ভ্যাট সংযুক্ত'। সে মরণের আগ-মুহূর্তেও সরকারকে পরিমাণ মতো ভ্যাট দিয়ে মরেছে। সুতরাং এদেশের সরকারের টাকার অভাব হওয়ার কথা নয়।

'মূল্যস্ফীতির অসহনীয় ঊর্ধ্বগতিতে বিশিষ্ট ২৪ নাগরিকের উদ্বেগ' খবরটি হালে পানি পাবে বলে মনে হয় না। কারণ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কোনো কান নেই, সে শুনতে পায় না। কেবল মই বেয়ে উপরে উঠতেই জানে। আমাদের কোনো কথা না বাড়িয়ে নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। আমার একটাই বিশ্বাস যে, ক্ষমতাসীন দলই হোক বা বিরোধী দলই হোক– এদেশে কোনো দলের অধীনে নির্বাচন আর সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবার সম্ভাবনা নেই। আমরা 'পড়েছি যবনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে'।

(প্রকাশ: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

‘যার জন্য যা, তাতেই খেল তা’

ছোটবেলায় সন্ধ্যাতারা মিটিমিটি জ্বলার সাথে তাল মিলিয়ে আমরা ক’ভাইবোন পাড়ার খেলার সাথীদের নিয়ে বিশাল উঠোনের মাঝখানে পাটি বিছিয়ে ধাঁধার আসরে বসতাম। সময়টা কিভাবে যেন পার হয়ে যেত। ধাঁধাগুলোও ছিল হালকা প্রকৃতির। বড় হয়ে এখন বুঝি কত হালকা জিনিস নিয়েই না সময় পার করেছি! আমাদের আসরে মাঝে-মধ্যে এসে যোগ দিতেন আমাদের থেকে বয়সে একটু বড় কেউ। একবার এসে একজন একটা প্রশ্ন করল, “বলো তো, ‘যার জন্য যা, তাতেই খেল তা’ ধাঁধার অর্থ কী?” আমরা ঘাবড়িয়ে গেলাম। অনেক বছর ধরে মাথার মধ্যে ধাঁধাটা মাঝে-মধ্যে ঘুরপাক খেত। পরে বাস্তবতার ঘা খেয়ে দিনে দিনে বুঝতে শিখেছিলাম। কারণ ধাঁধাটা এ দেশের, আমার জীবনটাও অতিবাহিত করে চলেছি এ দেশেই। উত্তরটা তাকে আর বলা হয়ে ওঠেনি। বুঝতে শিখেছি নানা রূপে, নানান ভঙ্গিতে, ভিন্নভাবে জীবনের প্রতিটা পদে পদে তার প্রয়োগ দেখে। বুঝেছিলাম, যে ছাগলের মাংসকে রসনা তৃপ্তির জন্য রান্না করে খেতে বাজার থেকে শুকনো মরিচ, মসলা, তেজপাতা কিনে এনে রান্নঘরে রাখা হয়েছিল, অর্থাৎ নিজের জন্য যত আয়োজন, কোনো এক সুযোগে সেই ছাগলই রান্নঘরে ঢুকে মসলাপাতি খেয়ে সাবাড় করে ফেলেছে। তাই এখন আর কর্ম দেখে ঘাবড়িয়ে যাইনে, অলক্ষ্যে কৃত্রিমভাবে হাসি। সে হাসি ম্লান হয়ে যায় নিমিষেই। ভাবি, কেন এমন হলো? ভাবনার মধ্যে কি কোনো গলদ ছিল? দেশ স্বাধীন হয়েছিল তিনটি লক্ষ্য সামনে নিয়ে– সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। রাজনীতিবিদরা দেশের জন্য এ আয়োজন সাজিয়েছিলেন। এতটা বছরে কেন এর একটিও অর্জন করতে পারলাম না? কেন আমরা বারবার ভূতের মতো পিছনে হাঁটছি? এর পরিণতি কী?

আজ সকালে উঠেই পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছিলাম আর অন্যমনস্ক হয়ে রকমারি সংবাদের মধ্যে শুধু নেগেটিভ সংবাদগুলো গুনছিলাম। দেখলাম, শতকরা পঞ্চাশভাগের বেশি সংবাদই নেগেটিভ; সংবাদগুলো আমাদের সমাজব্যবস্থা ও মানুষের নেগেটিভ দিকের কর্ম ও এর বহিঃপ্রকাশ। কোনোটা মানুষের প্রকৃতিগতভাবে নেগেটিভ, কোনোটা সামাজিকভাবে নেগেটিভ, কোনোটা আবার রাষ্ট্রীয়ভাবে নেগেটিভ, কোনোটা পরিবেশের জন্য নেগেটিভ। সবকিছু সমাজের মানুষই করছে, ভাবছে। তারা এই সমাজেরই লোক। আমরা জনগোষ্ঠীকে নষ্ট করে ফেলেছি। নষ্ট চরিত্রের লোকজন সমাজের পরতে পরতে সমাজ-পরিচালক হিসেবে বহাল তবিয়তে আসর জমিয়েছে। সকল নেগেটিভ প্রভাব এদেশের উপর

চেপে বসেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ হলে হয়তো বলে বসতেন, ‘দেশকে শনির দশায় ধরেছে’। এসব কথা শুনে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, ‘আপনার চোখে শুধু নেগেটিভ বিষয়গুলো ধরা পড়ে কেন? আপনি কি তাহলে নৈরাশ্যবাদী?’ আমি নৈরাশ্যবাদী হতে চাইনে, পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা আমাকে ক্রমেই নৈরাশ্যবাদিতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অতি উৎসাহী কেউ বলতে পারেন, ‘দীর্ঘ একান্ন বছর ধরে আমরা এত এত যে দেশের উন্নতি করলাম, পত্রিকাগুলো ইচ্ছে করেই শুধু নেগেটিভ সংবাদগুলো প্রকাশ করে, এটা সংবাদপত্রের স্বভাব।’ আমি এ কথাতে সবিনয়ে শুধু বলি, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ছাপতে গেলে সমাজে যা ঘটে তাই তো প্রকাশ করতে হয়। নেগেটিভ ঘটনা অবিরাম ঘটতে থাকলে পত্রিকাগুলোই-বা ভালো-পজিটিভ সংবাদ পাবেটা কোথায়? খারাপ ঘটনা ঘটলে তাকে কত ভালো করেইবা আর লেখা যায়! সমাজের একজন মানুষ যখনই কোনো কিছু ভাবে ও তা প্রকাশ করে এবং সে-মতো কাজ করে, তখনই তার ভেতরটা বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ে। সংবাদের নামে আমরা সমাজের পরিবেশ, মানুষের মন-মানসিকতা ও কর্মকে জানি। একটা দেয়াশলাইয়ের কাঠি দেয়াশলাই বাক্সের সান্নিধ্যে ঘর্ষণ দিলে আগুন জ্বলে ওঠে। কেউ দেখে, কাঠিটা জ্বলে উঠলো। আমরা বলতে পারি, কাঠিটা শুধু জ্বললোই না, কাঠি ও বাক্সের অন্তর্নিবিষ্ট স্বভাব প্রকাশ পেল।

এদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ও সমাজব্যবস্থায় যেদিকে তাকাই অগণিত নেগেটিভ সংবাদ, হতাশার দিগন্তরেখা, দুরাশার ছায়াবৃত্ত, সর্বগ্রাসী অব্যবস্থাপনা, মানবতার অপমান, মনুষ্যত্বের বিকৃতি সর্বত্র প্রকাশ পাচ্ছে, চারদিক থেকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কোনো আশার আলো দেখিনে, তাই নৈরাশ্যবাদিতায় ভুগি। এসব কোনো এক বছরের কর্মফল নয়; সুদীর্ঘ একান্ন বছরের আবাদী ফসল। মূলত মানুষ তার ঐচিত্যবোধ ও মনুষ্যত্ব ক্রমশই হারাচ্ছে। এর দায় থেকে কেউই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারিনে। সবকিছুই আমাদের সামগ্রিক ব্যর্থতা; সুশিক্ষার অভাব, দূরদর্শী চিন্তা-চেতনার ঘাটতি। সমস্ত নেগেটিভ ঘটনাই প্রমাণ করে আমাদের মানবিক গুণাবলির অবক্ষয়। আমরা যে যেখানেই বাস করি না কেন– আমরা এদেশের একই সমাজে বাস করি। তাই মানবিক গুণাবলির এ অবক্ষয় আমাদের পুরো সামাজের অবক্ষয়। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমরা অনেক কথা বলতে শিখেছি বটে। কিন্তু এ অবক্ষয়কে কোনোক্রমেই অস্বীকার করতে পারিনে। এ অবক্ষয় এতই প্রকট যে, আমরা নিজের অপকর্ম ও অপচিন্তাকে নিজে উপলব্ধি করতেও অক্ষম ও অপারগ। অর্থাৎ অপকর্ম ও অপচিন্তা করতে করতে আমরা এমনই একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছি যে, নিজের চিন্তাধারার মধ্যে এই অপচিন্তা ও অপকর্মকেও অবলীলায় উৎকৃষ্ট চিন্তা-চেতনা বলতে ও ভাবতে লজ্জাবোধ ও

দ্বিধাবোধ করিনে বরং ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আসর মাত করি। নিজের কৃতিত্ব বলে জাহির করি। আত্মজিজ্ঞাসার জায়গাটা ফাঁকা রয়ে যায়। এ আমাদের ভালো ও মন্দকে পৃথক করতে না পারার অক্ষমতা; বোধহীনতাও বলা যায়।

এদেশে ব্রিটিশ শাসনামলে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার উপর সব দোষ চাপিয়ে আমরা আমাদের অপচিন্তা ও অপকর্মকে ঢাকতাম। পাকিস্তান শাসনামলে পশ্চিমা সামরিক শাসকগোষ্ঠীর উপর সব দায়ভার চাপিয়ে আমরা ভালোমানুষ সেজেছি। অনেক দায়ের সাথে শোষণের দায়ভার তাদেরকেই বহন করতে হবে, এটা সত্য, আমরা মেনেও নিয়েছি। কিন্তু আমাদের এ সামাজিক ও মনুষ্যত্ববোধের অবক্ষয় আমাদেরই। আমরা কোনো অন্যায়কে নিজের স্বার্থে মনগড়া ন্যায় বলে ভাবতে শিখেছি– এর থেকে নৈতিক অবক্ষয় আর কী হতে পারে! এ অবক্ষয় এই একান্ন বছরে দিনে দিনে প্রকটভাবে পরিস্ফুট হচ্ছে। এর জন্য অন্য কোনো বহিঃশক্তিকে দোষারোপ করলেও কেউ তা গ্রহণ করবে না। আমরা কর্মদায় গ্রহণে বড্ড পিচ্ছিল স্বভাবের। নব্বই দশকের প্রারম্ভে এরশাদ সরকারকে স্বৈরাচারী আখ্যায়িত করে তার পতনের পর অনেক বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক কলাম-লেখক এদেশে এখন থেকে গণতন্ত্রের বন্যা বয়ে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। আমি অলক্ষ্যে মুচকী হাসতাম আবার আশাবাদীও হতাম। অলক্ষ্যে মুচকী হাসতাম এই ভেবে যে, সামাজিক পরিবেশের অবক্ষয় দূর করবো না, বসবাসরত মানুষের ও সমাজ পরিচালকদের মানসিকতার পরিবর্তন করবো না, মনুষ্যত্ববোধের উন্নতি ঘটানোর কোনো শিক্ষা দেবো না, শুধু আন্দোলন করেই দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনবো ও গণতন্ত্র চর্চা করবো, 'চাটার দল'কে মানুষ বানিয়ে ফেলবো– তা কীভাবে সম্ভব! 'বিড়াল বলে খাবো না মাছ, ছোঁবো না আমি কাশিতে যাবো' অবস্থা। এসব ভাবনা আমাকে মুচকী হাসতে বাধ্য করতো। আজকের এই দিনে এসে এখন আমরা দেখছি, আমরা যেখানে ছিলাম, সেখানেই পড়ে আছি। বরং মানবিকতা ও মনুষ্যত্ববোধ, সামাজিক চিন্তা-ভাবনা ও নৈতিকতার অধঃপতন; দেশপ্রেম, দুর্নীতি, ক্ষমতাধর কারো পিঠ চুলকিয়ে দিয়ে আত্মস্বার্থ হাসিল, দলবাজি ইত্যাদি বিবেচনায় আমরা অনেক পিছিয়ে গেছি।

এদেশের মানুষ আমাদের মূল উপজীব্য। মানুষের জন্যই সমাজ ও রাষ্ট্র। এদেশ শান্তিতে বসবাসের উপযোগী কি-না সেটাই আমরা সর্বাগ্রে বিবেচনা করবো। এদেশের গণমানুষের মুক্তির জন্য যত আয়োজন, এই সমাজের একশ্রেণির ক্ষমতাসন্ধানী ও স্বার্থবাদী লোকজন বা গোষ্ঠী তা সমূলে নিপাত করে চলেছে। এই শ্রেণি রাজনীতিসহ প্রতিটা পেশাতেই স্বচ্ছন্দে আছে। রাজনীতি এখন আর

রাজনীতিবিদদের হাতে নেই। প্রতিটা পেশারই সুযোগসন্ধানী চাটুকার লুটেরাগোষ্ঠী ব্যক্তিস্বার্থে রাজনীতির ধামাধরা হয়ে বসে আছে। নিজের পেশাকে কলঙ্কিত করে, জলাঞ্জলি দিয়ে, রাজনীতির মই বেয়ে নিজের জীবনের উন্নতি করছে। এদের দুর্নিবার কর্মকাণ্ড বরং অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনীতিবিদদের মাথায়ও 'দেশসেবা', 'জনসেবা' কথাগুলো হালকা-পানসে হয়ে গেছে। তারা এখন 'হেথা নয়, অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে' রসাস্বাদনে ব্যস্ত। সামনে নির্বাচনের পদশব্দ কানে ভেসে আসছে। সেখানে হয়তো 'পদপ্রার্থীতা' কেনা-বেচার বাজার আবার বসতে পারে। 'দেশসেবা', 'জনসেবা' শব্দযুগল এখন পণ্য হিসেবে কেনা-বেচার সংবাদ হয়তো অমূলক কিছু নয়। আমরা দু-চোখ জুড়িয়ে দেখার প্রতীক্ষায়। এদিকে সমাজের প্রতিটা ক্ষেত্রে ভেজালের সমারোহ। খাবারে ভেজাল, পণ্যে ভেজাল, লেনদেনে ভেজাল, নির্মাণে ভেজাল, কথায় ভেজাল, মূল্যে ভেজাল, অর্থবাজারে ভেজাল, ধর্মে ভেজাল, কর্মে ভেজাল, আচরণে ভেজাল, কোথায় ভেজাল নেই! সমাজে চলে-বলে-খেয়ে শান্তি উঠে গেছে। কেন? সমাজের মানুষের মানসিকতার বিকৃতি ঘটেছে বলে। মানুষ গড়ার দিকে গুরুত্ব না দিয়ে, মনুষ্যত্ববোধের উন্নতি না করে যে কোনো অপকৌশলে পাহাড় পরিমাণ টাকা গড়ার দিকে ঝুঁকে পড়েছি বলে। 'বাহির পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয় পানে চাইনি' বলে। মানুষের দুর্নীতিপরায়ণতা, শঠতা, প্রতারণা, অনভিপ্রেত চাটুকারিতা, স্বার্থপরতা, মিথ্যার বেসাতি, বলদর্পিত দাপট বেড়েছে, তাই। অমানুষসুলভ কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয় দিয়েছি, তাই। সুশিক্ষা নেই, আইনের শাসন নেই, মনুষ্যত্ববোধের চর্চা নেই, সমাজে মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন লোকের মাঙ্গলিক পদচারণা ও কর্ম নেই, তাই।

আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে বলেই আমাদের নাম মানুষ হয়েছে। আমরা মানুষের মতো কর্ম করবো না অথচ নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দেবো, এটা কাকের ময়ূরপুচ্ছ ধারণ। মানুষের মধ্যে পশুত্বের প্রাবল্য বেশি দেখা দিলে তখন আমরা আর মানুষ থাকিনে, সে-মানুষকে পশুর সাথে তুলনা করি। সরাসরি পশু বলতে দ্বিধা করি, তাই। বনের পশু আমাদের মতো এত জটিল-কুটিল সমীকরণ কষতে অপারগ, এটা আমাদের কৃতিত্ব। আমাদের অনেক পশুসুলভ কর্মকাণ্ড আমাদেরকে নরাধম বানিয়েছে। অথচ মানুষই মানুষের জন্য দেশ গড়ে, সমাজ গড়ে। মানুষের জন্যই রাষ্ট্র। মানুষের জন্যই সব। সমাজে কুশিক্ষিত ও দুরাচারের প্রাধান্য বেশি হলে সামাজিক অধঃপতন ত্বরান্বিত হয়। অশান্তি বিরাজ করে, উৎকৃষ্টতা লোপ পায়। সমাজের চেহারা দেখেই মানুষের প্রকৃতি চেনা যায়। যে সমাজে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধানেরা সমাজের প্রধান

আসনগুলো দখল করে রাখে, সমাজে সম্মান পায়, সে সমাজ পচে নষ্ট হয়ে গেছে, নিশ্চিতভাবে বোঝা যায়। যে সমাজে অশিক্ষিত, দুর্নীতিবাজ, মিথ্যাবাদী, সোস্যাল টাউট, মিথ্যার দাপট বেশি, সমাজ এদের পক্ষাবলম্বন করে, সমাজে এদের কদর বেশি– বুঝতে হবে সে-সমাজে বুনো আবহ বিরাজ করছে, সমাজের বিবেক ধ্বংস হয়ে গেছে, সমাজে সুশিক্ষিত লোক তার কর্তৃত্ব হারিয়েছে, সমাজে তখন আর আইনের শাসন নেই, মিথ্যাবাদী ও প্রতারক তার বলদর্পিত দাপটে আসন গেড়ে বসেছে। সে সমাজের অন্য সব সাধারণ মানুষ হয় নির্বোধ, নইলে অসহায়। যে মানুষের জন্য এত আয়োজন, সেই মানুষের একটা বলদর্পী কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী অনেক ত্যাগে গড়া শান্তির আবাদি ফসল লুটেপুটে শেষ করে দিচ্ছে, সমাজে খবরদারি করছে, সমাজের রক্ষক বনে গেছে। আমরা এ অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছি।

এজন্য মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ দরকার। মনুষ্যত্ববোধ মানে মানুষ হওয়ার, মানুষের মতো কর্ম করার ও মানুষের মতো ভাবার হাতেখড়ি। মানবিকতা, সুশিক্ষা, বিবেক, নৈতিকতা, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মসচেতনতা, সম্মানবোধ প্রভৃতি মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য। এগুলো যাদের মধ্যে আছে তারাই মানুষ। এজন্য সমাজে মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন মানুষ তৈরিতে, শিক্ষিত সমাজ গড়তে সুশিক্ষিত লোকের এগিয়ে আসা সময়ের প্রয়োজন। বিড়ালের মুখ-ভেংচিতে ভয় পেয়ে ঘরে বসে থাকলে চলবে না। সুশিক্ষিত লোকদের আগল ভেঙে সমাজে জায়গা করে নিতে হবে। সমাজে সুশিক্ষার রীতি চালু করতে হবে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নইলে তিমিরাচ্ছন্ন জীবন যুগ যুগ ধরেই চলতে থাকবে। এই মানুষই সুশিক্ষা পেলে, সুশিক্ষিত হলে ভালো ও উন্নত দেশ ও সমাজ গড়ে। তখন সমাজে মানুষের বসবাস সুখ-শান্তিতে ভরে যায়।

(প্রকাশ: ২৮ মার্চ ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

সুস্থ চিন্তা ও কর্মই উন্নতির একমাত্র পথ

ব্যক্তি ও সমাজজীবনের কিছু অসাঞ্জস্যতা ও অব্যবস্থাপনা এবং এ থেকে পরিত্রাণের উপায় নিয়ে কিছু কথা পত্রিকায় লিখে পাঠকসমাজকে অবহিত করি। এতে মনের ভিতরে জমে থাকা অস্থির-গুমোট ভাবটা অনেকটাই কেটে গিয়ে স্বস্তির ভাব ফিরে আসে। আমি উপকৃত হই। আমি এদেশের শাশ্বত 'মাস্টারসাহেবের' ভূমিকায় কাজ করে শান্তি বোধ করি। এদেশের মাস্টারসাহেবদের একজন হিসেবে এটা আমার দায়িত্বজ্ঞান বলেও মনে করি। একজন মাস্টারের দায়িত্ব শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই নয়, সমাজের প্রতিও আছে। জীবন ও জগতের যেখানেই 'শিক্ষা' ও 'শিক্ষণীয়' বিষয় আছে, শিক্ষকদের কাজ সেখানেই আছে। শিক্ষা, মানবকল্যাণ ও মানবিক গুণাবলি থেকে আমরা যত দূরে সরে যাব, আমাদের সার্বিক দুর্গতি ততই ঘনিভূত হবে। এদেশের অব্যবস্থা, দুর্নীতি, দুর্বলের প্রতি সবলের প্রাবল্য নিয়েও কখনো কখনো কথা বলি। সেটাও আমার পেশাগত দায়িত্ব। দেশ ও কোনো প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠাকরণও আমার অন্যতম পেশা। যদিও অনেক সময় সোজা-সাপটা কথা লেখার কারণে অনেকের বিরাগভাজন হতে হয়। অনেকেই নাখোশ হন। আমাকে কোনো না কোনো দলের রঙ মাখিয়ে দিতে চান। তখনই অসুবিধায় পড়ি। কোনো অব্যবস্থা নিয়ে কিছু কথা লিখলেই, বিশেষ করে সেই অব্যবস্থা থেকে সুবিধাভোগীরা আমার দিকে টেরা চোখে তাকান। অন্যায় ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বললেই কোনো মানুষ দলবাজ হয়ে যায় না। একটা রাজনৈতিক দলে থেকেও অনেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলেন। আমি জানি, একসাথে সবাইকে মন রক্ষা করা যায় না। কারো মন রক্ষার জন্য বা মনে আঘাত দেওয়ার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু লিখিনে। যা লিখি তা নিতান্তই দায়িত্ববোধ থেকে উৎসারিত, দেশ ও সমাজের 'শিক্ষকসুলভ পথপ্রদর্শন' হিসেবে উজ্জীবিত ও উচ্ছলিত। এটা আমার ঐচিত্যবোধের বহিঃপ্রকাশ। এদেশে শুধু দলীয় লোক বাস করবে, তা-ই নয়; কিছু দলাদলিহীন লোকের বসবাসও প্রয়োজন আছে। এটাই যে আমার পেশা, তা বোঝানো কঠিন হয়ে পড়ে। লিখতে বসে কখনো-সখনো কলম সামনে চলতে চায় না, নানাবিধ কথা মাথায় আসে, তাই লেখার মধ্যে নানাবিধ কারণে কখনো কিছু গৌরচন্দ্রিকা ('গীতিকাহিনী আরম্ভের পূর্বে শ্রীচৈতন্য বন্দনা বা শ্রীচৈতন্যের বর্ণনা; ভূমিকা, পূর্বাভাস') দিই।

আমি একজন শিক্ষক। সেজন্য সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে শিক্ষাদান বিষয়ে কথা, শিক্ষার উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার, সামাজিক সুশিক্ষা ও এর উপাদান, উপকরণ,

পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে ভালো হয়। এসব নিয়ে আলোচনা ও পরিবেশ সৃষ্টি নিয়ে কথা বলতে গেলে দেশ ও রাষ্ট্র-সম্পর্কীত অনেক কথা চলে আসে। এর অর্থ এই নয় যে, আমাকে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হতে হবে, আমি রাজনীতি-অন্ধ হব; নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে অতি উৎসাহী হয়ে রাজনীতির মই বেয়ে নিজ জীবনের উন্নতি খুঁজবো। এই যে রাজনীতির মই বেয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি– এটাও এদেশে ব্যবসা পেশার একটা অধুনাতন সংস্করণ। আমরা ক্রমশই সেদিকে সবেগে ধাবিত হচ্ছি। 'দেশসেবা', 'সমাজসেবা' শব্দযুগল রাজনীতির মাঠ থেকে হাত গুটিয়ে অভিধানে ঠাই করে নিয়েছে। কোনো কথা লিখতে বা বলতে স্ব-স্ব 'রাজ-বন্দনা' গাওয়ার সামাজিক রীতি ও প্রবণতা আমরা সমাজে দেখতে পাচ্ছি। আমরা কখনো স্বেচ্ছায়, কখনো অনিচ্ছায় 'রাজা'র করকমলে এ বন্দনা উপহার দিচ্ছি। এতে ব্যক্তি স্বাধীনতার দশা নিয়ে আমরা কেউ-ই কিছু ভেবে দেখছিনে। ব্যক্তিস্বার্থই প্রথম বিবেচিত হচ্ছে। এগুলো পুরাকালের রাজা-বাদশাদের সময়ে রাজার গুণগান দুকলম লিখে, কখনো কবিতা রচনা করে, কখনো রাজ-গুণকীর্তন গেয়ে রাজসভায় স্থান করে নেওয়ার শামিল। ছোটবেলায় যাত্রা (গীতাভিনয়বিশেষ) শুনতে যাত্রা-প্যান্ডেলে যেতাম। শুরুতেই তারা 'পূবেতে বন্দনা করি পূবের ভানুশ্বর, একদিকে উদয় রে ভানু চৌদিকে পশর...' ইত্যাদি গৌরচন্দ্রিকা দিত। বর্তমান যুগে আমদের সমাজে নব নব রূপে 'গৌরচন্দ্রিকা' উদ্ভাসিত হয়েছে।

কর্ম ও রুটি-রুজির তাগিদে এবং বিশেষায়িত জ্ঞানের আবির্ভাবে বর্তমান সমাজ বিভিন্ন পেশাদারিত্বের সমাজ। প্রতিটা পদে আমরা বিভিন্ন পেশাদারের স্মরণাপন্ন হচ্ছি। পেশাদার ছাড়া জীবন চলে না, কাজও ভালো হয় না। এক সময় দেখতাম, ডাক্তার হাতুড়ে, না-কি এমবিবিএস? এখন দেখি কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। এদেশে এরকম একটা প্রবাদও আছে, 'যার কাজ তার সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে'। আমরা বাস্তবে এ প্রবাদের উল্টোটা করি। যেমন–আমরা শিক্ষকতা ও শিক্ষার নীতি নির্ধারণ, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে অনেকটাই উল্টো কাজে যোগ দিয়েছি। নিজের দলের বা মতের দলবাজ লোকজন, যাদের গায়ে অন্তত শিক্ষকতার গন্ধ আছে, দলবাজি করাই যাদের মূল লক্ষ্য, তাদেরকে বেছে নিই। তারা যতটা না শিক্ষক, তারচেয়ে অনেক বেশি রাজনীতিক, রাজনৈতিক আনুগত্য, ভিনদেশি ভোগবাদী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তারা দলের কাঁধে ভর করে লুকিয়ে রাখা ব্যক্তিগত ইজম বাস্তবায়ন করতে চান। তাদেরকে দিয়ে আমরা শিক্ষার নীতি নির্ধারণসহ শিক্ষাসংক্রান্ত সবকিছু করাতে চেষ্টা করি। তারা মনে

মনে নিজের উন্নতির একটা লক্ষ্য ঠিক করে নেন, তারপর কখনো একা একা, কখনো কোরাস ধরে যথাযোগ্য ব্যক্তিকে মোসাহেবি ও গুণকীর্তনে রত হন। নিজেদের পেশা ও পেশাগত কর্ম অবহেলিত হয়ে পিছনে পড়ে থাকে। শ্যামও রাখি, কূলও রাখি। শেষে কাজের কাজ কিছুই হয় না, বা 'ঘ্রানং অর্ধনং ভোজনং' সার হয়। এটা এদেশের চলতি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটা পেশাতে এগুলো করে আমারা যেমন পেশাদারিত্বের অবমাননা করছি, তেমনিভাবে দলবাজিও করছি। রাজনৈতিক দলগুলোও এভাবে বাড়তি কিছু কিছু সুবিধা দিয়ে দলে লোক ভেড়াচ্ছে। মূল কাজ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ব্যক্তিপর্যায়ে লাভবান হচ্ছি।

উন্নতি করার আগে বটলনেক জায়গাগুলো ও ক্ষতিকর উপাদানগুলো চিহ্নিত করতে হবে, এগুলোকে আমরা লিমিটিং ফ্যাক্টরও বলে থাকি। লিমিটিং ফ্যাক্টর মুক্ত করাও এক ধরনের চিকিৎসা। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষেই উন্নতি করতে হলে দলমত নির্বিশেষে মেরুদণ্ডসম্পন্ন জাত শিক্ষাবিদদের হাতে শিক্ষা-পলিসি তৈরি, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার কাজ দিতে হবে। তাদেরকে রাজনৈতিক বিভেদমুক্ত রাখতে হবে। তারা এদেশ, দেশের স্বাধীনতা, ইতিহাস, দেশীয় সংস্কৃতি, মানবিকতা, সামাজিক বুনন, দেশীয় মূল্যবোধ, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি দুচোখ মেলে দেখবেন। আমরা জানি, রাজনৈতিক দল ও কোনো মামলার উকিলসহ কিছু কিছু পেশা আছে যারা একচোখা। তারা একটা চোখ ব্যবহার করেই টিকে আছেন। বিচারক ও শিক্ষকতা পেশাসহ আরো কিছু পেশা আছে যাদের দুটো চোখ থাকতে হয় এবং দুটো চোখই সমানভাবে ব্যবহার করতে হয়। নইলে সমাজ অচল হয়ে যায়। এর ব্যত্যয় হচ্ছে বলেই-না সমাজে এত অসুবিধা। কোনো বিষয়ে এই একচোখা সিদ্ধান্তই এদেশের সাধারণ নাগরিকের ক্ষতি করছে বেশি। দল থাকা প্রয়োজন, কিন্তু দলবাজিই এদেশের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এছাড়া বাস্তবতা হলো: এদেশের ঐতিহাসিক কারণে সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পুরোটাই সেই-যে রাজনীতিবিদের হাতে চলে গিয়েছিল, সেখান থেকে পরবর্তীতে সমাজের সুশিক্ষিত লোকের হাতে আর ফিরে আসেনি। রাজনীতিতে সুশিক্ষিত লোক কমছে। বরং রাজনীতিই দুরাচারদের কবলে ক্রমশই চলে যাচ্ছে। সমাজসেবা, দেশসেবায় ক্রমশই দুর্বৃত্তায়ন হয়েছে ও এখনো হচ্ছে। অনৈতিক চরিত্রের অধিকারী, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধারকারীরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ছলে, বলে, কৌশলে বিভিন্ন পেশার সুচতুর লোকজন প্রকাশ্যে বা ছদ্মবেশে রাজনীতির কর্মে যোগ দিয়েছে। প্রতিটা পেশারই রাজনীতিকীকরণ হয়েছে। এ ধরণের সুচতুর লোকজন রাজনীতিকে কলুষিত করছে, সমাজেরও

ক্ষতির কারণ হচ্ছে। পেশাজীবীদের অনেকে রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা ও আইনের উর্ধ্বে চলাফেরার মানসিকতার ফলে দেশে আইনের শাসন বিঘ্নিত হচ্ছে। ব্যবসায়ীরাও অল্প কাজে অধিক লাভের আশায় রাজনীতির ছত্রছায়ায় জড়ো হচ্ছে এবং আইনের দীর্ঘসূত্রিতার ঘেরাটোপে ফেলে আইনের উর্ধ্বে উঠে যাচ্ছে। রাজনীতিবিদরা তাদের কাজ করুক, আমরা বিভিন্ন পেশাজীবীরা আমাদের কাজে রত হই– এমনটা হওয়াই নিয়মের কথা। 'গোলে হরিবোল দিয়ে কাছিম জড়ো করা' কোনোমতেই সমীচীন নয়। এতে ফলাফল শূন্যের রেখা পেরিয়ে নেগেটিভ-মুখী হয়ে যায়। এভাবে সমাজের মনুষ্যত্ববোধ বিবর্জিত সুচতুর-ফন্দিবাজরাই অন্যায়ভাবে লাভবান হচ্ছে। এখান থেকে কি সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক শিক্ষা প্রভৃতি সমাজ ও দেশ-উন্নয়নের নিয়ামক আশা করা যায়? কালবোশেখি নিকষকালো মেঘের কাছে কি শ্রাবনের স্নিগ্ধ-মেদুর অবিরাম বর্ষণ পাওয়া যায়? অথচ এতেই আমরা ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি। আমাদের আচরণ অনেকটাই কীর্তিনাশা পদ্মার মতো। বর্ষায় বন্যা ও স্রোতের প্রবল তাণ্ডবে দুকূলের যত সুকীর্তি আছে ভাসিয়ে নিয়ে চলি। আবার শীত-মৌসুমে ধূ-ধূ বালির বিরাণ প্রান্তরে বসে অতীত কীর্তির কথা মুখে আওড়িয়ে বিলাপ-ধ্বনিতে মুখরিতে করে তুলি। আগল ভেঙে বেরিয়ে আসার কোনো চেষ্টাই আমরা করছিনে। নিজেদের ভুলক্রটিগুলো আমরা শুধরে নিইনে। এভাবেই দিন সামনে এগোচ্ছে। বিভিন্ন পেশায় পেশাদারিত্বের প্রাধান্য ক্ষীণ হয়ে আসছে, পরিবর্তে দলীয় আনুগত্য প্রাধান্য পাচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকতা পেশার মতো অন্যান্য সকল পেশার ক্ষেত্রেই একই ধারা চলছে। বিষয়টা বিবেচনীয়। অথচ আধুনিক শিক্ষা ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে কোনো দেশে কোনো সুনির্দিষ্ট ইজম প্রতিষ্ঠা করার দিন শেষ।

বিশ্বের যে দেশেই 'রাজ' ও 'রাজা' শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়ম-নীতি, বাধা-নিষেধ না মানার রেওয়াজ তৈরি হয়ে গেছে। এতে রাজনীতি নীতিচ্যুত হচ্ছে, দেশ গড়া ও দেশের প্রশাসন বিঘ্নিত হচ্ছে। এ দুটো শব্দ সকল জবাবদিহি ও দায়দায়িত্বের উর্ধ্বে চলে গেছে। এজন্য রাজনীতিতে এত লোকসমাগম হচ্ছে। এখানে যে কোনো অপকর্ম করেই পার পাওয়া যায়। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলো যেমন- ভারত, মিয়ানমার, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির দিকে তাকালে রাজনীতির ও মানবিক নিয়ম-নীতি না মানার অস্তিত্ব বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে। পশ্চিমা অনেক দেশের অবস্থাও ভালো না। আমরা সিরিয়ার সাথে তুরস্কের তুলনা করতে পারি। অথচ

প্রত্যেকেই আমরা মানুষ। মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন মানুষ– এটাই আমাদের প্রধান পরিচয়। উন্নতির তুলনায় হিংসা-বিদ্বেষ, দলাদলি, লাঠালাঠি, পরনিন্দা, তখত নিয়ে ব্যবসা বেশি হচ্ছে। 'খাজনার তুলনায় বাজনা বেশি' হচ্ছে। সময় এসেছে আইন করে রাজনীতিরও একটা নীতি প্রতিষ্ঠা করা। সময় এসেছে রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সুশিক্ষিত পেশাজীবীদের নির্দলীয় পেশাদারিত্ব-ব্যবস্থার সম্মিলনে গণতান্ত্রিক ধারার ভারসাম্যপূর্ণ একটা কাঠামো তৈরি করা। রাজনীতিবিদদের চিন্তা-চেতনা ও কর্মের জবাবদিহির ব্যবস্থা করা; তাদের সার্বিক কর্মকাণ্ডের নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং করা। এটা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। মানুষ পৃথিবীতে বসে মহাকাশে কি হচ্ছে তা টেকনোলজির সাহায্যে দেখছে। একটা দেশের কারো কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান করার ব্যবস্থা সে-দেশের মানুষই পারে। দরকার কাজ করার ইচ্ছা। তখন প্রতিটা দেশই তার গতিপথ ফিরে পাবে। রাষ্ট্রে বসবাস হবে সাবলীল ও স্বস্তিদায়ক। প্রতিটা দেশই হবে এক-একটি সার্বভৌম উন্নয়নকেন্দ্র। আমাদের এখনো পথ বহুদূর যেতে হবে। ধূ-ধূ মাঠ, বালিয়াড়ি, প্রখর সূর্য পেরিয়ে তারপর বনাঞ্চল, সবুজের ছায়া।

(প্রকাশ: ৩ জুন ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

দুর্নীতির বহুমাত্রিকতা রোধ করবে কে?

কবি নজরুল তার এক কবিতায় লিখেছিলেন, 'বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে! দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে'। আমরা তো বর্তমান এই যুগে ক্ষেপতেও পারিনে, মুখে যা আসে বলতেও পারিনে, 'মুখে ভাসুরের নাম বাধে'। বিদেশি কোনো শক্তি তো আর এখন দেশ চালাই না, সবই আমরা। তবে সত্য কথা বলতে গেলেও একটা পক্ষ হেই হেই করে তেড়ে আসে; বলে, 'কলা ছুললে ক্যানো, বুজিয়ে দেও'। কোনো না কোনো রাজনৈতিক পক্ষে কৌশলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। কায়েমি স্বার্থে যাদের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়, তারাই এসব করে, তেড়ে আসে। যে দলই যখন ক্ষমতায় আসুক, এদের অপচিন্তা ও অপকৌশল এদেশে আসন গেড়ে বসেছে। এদেশ থেকে এই মন-মানসিকতা উচ্ছেদ করা অতটা সহজ নয়। এদের কথা বলার ভাব, 'এটা আমার দেশ, আমি এদেশের সব; তুমি কথা বলার কে?' আবার এদেশে বাস করে চোখ-কান মেলে মুখ বুজে সবকিছু সহ্য করাও অনেক কঠিন। একজন শাশ্বত মাস্টারসাহেবের পক্ষে তো আরো কঠিন। একটা নিয়ম-নীতি, সুস্থ চিন্তাধারা, ব্যবস্থা ও মূল্যবোধ ধ্বংস করা যত সহজ, পুনরুদ্ধার করা বা প্রতিষ্ঠা করা অনেক সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। পত্রিকার পাতায় আমাদের গলদগুলো তুলে ধরতে গিয়ে প্রতিবন্ধকতা ও কোনো দলে ঠেলে দেওয়ার মনোভাব হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। দুর্নীতিবাজরা ও দুর্জনেরা এদেশ দখলে নিয়ে ফেলেছে। আমরা এদেশের কেউ হই, আর না হই; একজন নাগরিক তো বটে। কথা বলার নাগরিক অধিকারটুকুও এরা আমাদের দিতে চায় না।

ব্রিটিশ আমলের বইপত্র ঘাঁটলে দুর্নীতির সংজ্ঞা নিশ্চয়ই একটা পাওয়া যাবে। পাকিস্তান আমলেরও হয়তো সংজ্ঞা একটা ছিল। একবিংশ শতাব্দিতে অবশ্যই দুর্নীতির সংজ্ঞায় ব্যাপক ওলট-পালট হয়ে গেছে। এদেশের অনেকেই দুর্নীতি বলতে শুধু আর্থিক দুর্নীতিকে বোঝে। দুর্নীতি বলতে আমি সাদামাঠাভাবে 'দুঃ(অভাব)+ নীতি' অর্থাৎ নীতির অভাবকে বুঝি, যা আমাদের এই ভূখন্ডে প্রতিটি পদে বিদ্যমান। এদেশে আমাদের নীতির এত টানাপোড়েন চলছে কেন? অনেক অপচেষ্টার ফলে একটা পক্ষ তাদের কায়েমি স্বার্থ নিয়ে জগদ্দল পাথরের মতো এদেশের বুকে চেপে বসেছে। ফলে সাধারণ মানুষ ও দেশকে ভুগতে হচ্ছে। ইন্টারনেট ঘাটলে দুর্নীতির একটা আধুনিক চলনসই সংজ্ঞা হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে, সে খোঁজাখুঁজির রুচি আমার নেই। আমাদের বর্তমান দুর্নীতির অবস্থা সে সংজ্ঞাকেও হয়তো ছাড়িয়ে গেছে। ধৈর্যে যে আর কুলায় না!

‘দেবদাসের প্রাণবায়ু যে বের হয়ে যায়!’ “দেবদাস কহিল, ‘গাড়োয়ান ভাই, হাড়িপোতা আর কতদূর?’।” এদেশের সজ্জন ও বিদগ্ধজনদের কাছে আমার এ আকুল জিজ্ঞাসা, ‘ভাই, এদেশের মুক্তি আর কতদূর’? । নিজের অস্তিত্বের ওপরে বিশ্বাস হয় না। মনে হয়, ‘আমি কি মরে গেছি না-কি, মরে বেঁচে আছি’।

২৪ জুন ২০২৩ যুগান্তর পত্রিকাসহ অনেক পত্রিকাতেই সংবাদটা পড়লাম, ‘ঘুসের টাকাসহ দুদক মহাপরিচালকের পিএ আটক’। খবরে প্রকাশ, গৌতম ভট্টাচার্য কর্মকর্তাদের সই জাল করে দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানের চিঠি দিয়ে ৫০ লাখ টাকা দাবি করেন এবং মিষ্টির প্যাকেটভর্তি টাকা লেনদেনের সময় দুই সহযোগীসহ হাতেনাতে আটক হন। সেই ছোটবেলা থেকেই পত্রিকায় পড়ে আসছি, সরষের মধ্যে না-কি ভূত থাকে। এটা আবারও প্রমাণিত হলো। এটা আরেকটু খতিয়ে দেখা দরকার, দুদকের কোন কোন জায়গায় ভূত দানা বেঁধেছে এবং ভূতের সংখ্যাই-বা কত। এটা ভাবতে অবাক লাগে, দুদকের ঘরে স্বয়ং দুর্নীতি ঢুকে বসে আছে। আমার ধারণা, সরষের বাইরেও ভূত ছড়িয়ে পড়েছে। কুইনাইন জ্বর সারাবে জানি, কিন্তু কুইনাইন সারাবে কে? শুধুই কি দুদক? মেঘে মেঘে বেলা অনেক বেড়েছে। বলতে দ্বিধা নেই, ‘তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে, সে আগুন ছড়িয়ে গেলো, সে আগুন ছড়িয়ে গেলো সবখানে, সবখানে, সবখানে-এ...।’ দেশময়, আনাচে-কানাচে, প্রতিটা পদে পদে, জীবনের মন্দাকিনী (হিন্দুপুরাণ অনুসারে স্বর্গের গঙ্গা নদী) তীরে তোমার অস্তিত্বের অনুভব! সর্বত্র সুনীতির অভাব। ‘মঘা, এড়াবি কয় ঘা?’

যুগান্তরে আরো পড়লাম, ‘যুক্তরাষ্ট্রে পালানোর সময় আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার’। সংবাদের নীচে লেখা, “যুক্তরাষ্ট্রে পালানোর সময় বিমানবন্দরে গ্রেফতার হয়েছেন প্রস্তাবিত পিপলস ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা আবুল কাশেম। অর্থ পাচারের এক মামলায় বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই তিনি গ্রেফতার হন।... তিনি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ-সভাপতি। এ মামলার একটি অভিযোগে বলা হয়েছে, প্রস্তাবিত পিপলস ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালকের পদ পাওয়ার জন্য এবং শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে হাজারো গ্রাহকের কাছ থেকে নেওয়া ১০০ কোটি টাকা মঞ্জুর আলম ওই ব্যাংকের চেয়ারম্যান আবুল কাশেমকে দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, ১৭ জুন যুগান্তরে ‘গ্রাহকের টাকা পাচার আলেশা মার্টের। লোপার্ট ৪২২ কোটি টাকা’ শিরোনামে এ বিষয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়।” এদেশে রাজনীতি যারা করেন (বিশেষ করে ক্ষমতায় যারা যখন থাকেন) তাদের অনেকের নামে ‘একটু-আধটু’ এমন

অভিযোগ প্রায়শই কানে ভেসে আসে। যুগান্তর পত্রিকায়ও এমন শতেক খবর প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হচ্ছে। এগুলো 'চাঁদের কলঙ্ক' বলাই ভালো। এমন অভিযোগ কানে নিতে গেলে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে গেলে 'লোম বাছতে কম্বল উজাড়' হবে, তা ভেবেই হয়তো আমরা আইনের প্রয়োগ যথার্থ করতে পারিনে। আইনেরও তো কোনো হাত-পা নেই যে চলবে; যদিও আমরা একটা কথায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি 'আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে'। আমরা দেখি সংশ্লিষ্ট পক্ষ আইনকে সামনে না চালালে চলে না। তাছাড়া বিচারে নির্দোষ হয়ে বেরিয়ে আসার আইনে ও লাইনেও অনেক ফাঁকফোকর আছে শুনি। তাই বিচারের কথা এ প্রসঙ্গে না তুলি। আমি যে অনেক লেখাতে বলি, 'এদেশে রাজনীতি পচে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। রাজনীতিতে জনসেবা ও জনস্বার্থ বলতে কিছু আর অবশিষ্ট নেই। স্বার্থান্ধ-দিগভ্রষ্ট রাজনীতি, ব্যক্তিস্বার্থ আর দলবাজিই এখানে সর্বেসর্বা।' কথার মাহাত্ম্য কী? 'উলটপালট করে দে মা লুটেপুটে খাই।' কথা কি সত্য? এদেশে কেন মানুষ দলে দলে রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছে, উদ্দেশ্য কী? দলীয় আদর্শের কারণে ক'জন মানুষ রাজনীতিতে আসছে? এদেশে রাজনীতিই একমাত্র পেশা যেখানে জবাবদিহির কোনো ব্যবস্থা নেই। এদেশের সুশিক্ষিত ও সচেতনমহলকে দেশরক্ষার স্বার্থে আজ এটা অবশ্যই ভাবতে হবে। রাজনীতি তো বন্ধ করা যাবে না, কিন্তু রাজনীতিতে জবাবদিহিতা আনতে হবে। শুনতে খারাপ লাগলেও সত্য যে, এদেশের অন্যায়-অত্যাচার, মিথ্যাচার, অবিচার, দুর্নীতি, ব্যাংক লুট, হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার, গায়েবি মামলা, সামাজিক প্রতিহিংসা, অগণতান্ত্রিক মন-মানসিকতা, 'চোরের মা-র বড় গলা', নরম কাঠে ছুতারের বল, শিক্ষাশূন্যতা ও মনুষ্যত্বহীনতা ইত্যাদি সবকিছুই আজ এই অধুনাতন 'রাজনৈতিক ব্যবসা'র ফসল। রাজনীতিই হয়েছে যত অপকর্মের 'অসিলা'। আবার এই রাজনীতির বদৌলতে এদেশে অনেকেই যে কোনো অপরাধ, দুষ্কর্ম, দুরাচারবৃত্তি থেকে রেহায় পেয়ে যাচ্ছে। এসবই আমরা প্রতিনিয়ত পত্রিকার পাতায় পড়ছি, বাস্তবেও দেখছি।

আমি সেই হাইস্কুল পর্যায় থেকে আজ পর্যন্ত ট্রান্সলেশন শিখে আসছি, 'ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগীটি মারা গেল' কিংবা 'যাত্রীটি স্টেশনে পৌঁছাইবার পূর্বে ট্রেনটি ছাড়িয়া গেল'। এখনও বাক্যের কোন অংশটা কোন টেনস-এ হবে ভুলে যাই। কিন্তু এদেশের শতেক ঘটনার সাথে এর মিলও প্রতিনিয়ত পাই, তাই ভুলটা সংশোধন করতে পারি। যেমন– ১৫ জুন ২০২৩ তারিখে একই পত্রিকায় প্রকাশিত 'চার্জশীটের খবরেই দেশত্যাগ বাচ্চুর' শিরোনাম। এদেশে তাই-ই তো

হবার কথা। খবরে প্রকাশ, 'বেসিক ব্যাংক কেলেঙ্কারির হোতা, ব্যাংকটির সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হাই বাচ্চুর দেশত্যাগের নেপথ্য স্পর্শকাতর তথ্য পাওয়া গেছে। দুদকের দায়ের করা ৫৮ মামলায় চার্জশীটভুক্ত আসামি হচ্ছেন– আগেভাগে এই খবর পেয়ে তিনি দেশ থেকে পালিয়ে যান। যদিও তার বিদেশ ভ্রমণের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু দুদক থেকে নিয়মিত ফলোআপ না করায় তিনি সেই সুয়োগ নিয়ে গত ৭ জুন দেশত্যাগ করেন। দেশ ছাড়ার আগে বাচ্চু তার বেশ কিছু সম্পদও বিক্রি করে দেন। কিছু সম্পদ দুদক ক্রোক করে রাখলেও সেখানে রিসিভার নিয়োগ না করায় তিনি গোপনে অনেক সম্পদ বিক্রি করার সুয়োগ পান।' ভেতরের খবর কী, কীভাবে তাকে এত ইনডেমনিটি দেওয়া হয়েছিল, আমরা জানি না। এজন্যই সন্দেহবাতিক মনে দুদকের 'ভট্টাচার্য গং'-এর বিস্তারের কথা নাড়া দেয়। এমনই 'ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগী' পালানোর ঘটনা এদেশে পত্রিকা ঘাঁটলে হরহামেশাই চোখে পড়ে। পি কে হালদারের কথা কি আমরা একটু স্মরণে আনতে পারি? স্বকীয় বুদ্ধি খাটিয়ে আর্থিক দুর্নীতির হেন কর্ম নেই, যার সবটুকু দেখিয়ে সে হাজার হাজার কোটি টাকা ভারতে পাচার করে ধরা পড়ার আগেই ওপারে পাড়ি দিয়েছিল। সেখানেও এদেশে তার সহযোগী কারা ছিল, তা উদ্ঘাটিত হয়নি। এই উদ্ঘাটন প্রক্রিয়া কেন বিলম্ব হয় বা কেন স্তিমিত হয়ে যায়, কেন এদেশের সম্পদ লুটপাট প্রক্রিয়া বহাল থাকে– এও এক চিরজিজ্ঞাস্য বিষয়। ইতিহাসে পড়েছিলাম, চেঙ্গিস খান, বর্গি প্রভৃতি লুটেরা এদেশের সম্পদ লুট করে তাদের দেশে নিয়ে যেত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, পশ্চিম-পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এদেশের সম্পদ শোষণ করে তাদের দেশ গড়েছে। দিন গেছে, কিন্তু সে-ধারা তো এদেশে এখনো বিদ্যমান। আমাদের 'সোনার ছেলেরা' এখনো এদেশ লুটে টাকা বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে কেন? পত্রিকার পরের খবরটা একটু পড়ি।

২৩ জুন ২০২৩ যুগান্তরের সংবাদ শিরোনাম, 'সুইস ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন– বাংলাদেশিদের টাকা উধাও!' বলা হয়েছে, 'সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংক (সুইস ব্যাংক) থেকে এক বছরে ১০ হাজার ১১৭ কোটি টাকা তুলে নিলেন বাংলাদেশিরা। ...এক বছরে হঠাৎ বিশাল অঙ্কের টাকা উধাও হয়ে যাওয়া নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন বিশ্লেষকরা। তাদের মতে, এর আগের নির্বাচনি বছরগুলোয় যেখানে আমানত বেড়েছে, এবার সেখানে আমানত কমেছে ৯৫ শতাংশ। প্রতিবছর আমানতের তথ্য ফাঁস করায় পাচারকারীরা সুইস ব্যাংকে টাকা রাখাও এখন আর নিরাপদ মনে করছে না। কিন্তু এই টাকা কোথায় গেছে,

কে নিয়েছে এর কোনো তথ্য ব্যাংটির বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ নেই। ...অর্থনীতিবিদরা বলছেন, সুইস ব্যাংকের বাইরে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশিদের অর্থ পাচার বাড়ছে। তাদের মতে, অনিশ্চয়তার কারণে বিত্তবানরা দেশকে নিরাপদ মনে করছেন না। ফলে বিভিন্ন উপায়ে অর্থ পাচার হচ্ছে। ঋণের নামে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের টাকা, বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ এবং ঘুষ-দুর্নীতির টাকা দেশ থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে। পরের দিন একই পত্রিকায় 'পাচারের টাকা ভিন্ন গন্তব্যে' শিরোনামে লেখা হয়, 'অর্থনীতিবিদদের অভিমত, সুইস ব্যাংক থেকে এক বছরে তুলে নেওয়া বাংলাদেশিদের ১০ হাজার কোটি টাকার গন্তব্য দেশের স্বার্থেই জানা অতিজরুরি। প্রভাবশালীরা জড়িত, রাষ্ট্রকাঠামো জিম্মি করে অর্থ পাচার।' বোঝা যায়, সুইস ব্যাংক ছাড়াও টাকা অনেক দেশেই পাচার হয়ে যাচ্ছে। এ টাকার অধিকাংশ দুর্নীতি থেকে আহরিত। কারা এর সাথে জড়িত? এসব খুঁজে বের করা কি খুব কঠিন? টাকা ফেরত আনাও কি সম্ভব? পত্রিকাতেই অনেক অর্থনীতিবিদ বলেন, 'বর্তমানে দেশে যেসব আইনকানুন রয়েছে, তা পাচার বন্ধ এবং আগে পাচার করা অর্থ ফিরিয়ে আনার জন্য যথেষ্ঠ। কিন্তু এসব আইন কার্যকরের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা জরুরি। যারা রাষ্ট্র কাঠামো নিয়ন্ত্রণে রেখে বা দখল করে অর্থ পাচার করছে, তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে। ...এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। উলটো এরা রাজনৈতিক সুবিধা পেয়েছে।' টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক বলেন, 'দেশ থেকে প্রতিবছর যে টাকা পাচার হয়, এটি তার আংশিক চিত্র। পুরো চিত্র আরও ভয়াবহ।'

বিভিন্ন প্রকার বড় বড় দুর্নীতির সাথে যারা জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কেন আমাদের এত আপত্তি? লালন গেয়েছেন, 'চাঁদের গায়ে দাগ লেগেছে, আমরা ভেবে করবো কী! চাঁদের গায়ে...'।

(প্রকাশ: ৪ জুলাই ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

এদেশের রাজনীতি– আত্মজিজ্ঞাসা ও বিবেকবোধ

(প্রকাশিত শিরোনাম: আত্মজিজ্ঞাসায় মিলবে সমাধান)

পুরো দেশের উপর দিয়ে এখন রাজনীতির ঝড়ো দমকা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। এতে তছনছ হচ্ছে সাধারণ মানুষের শান্তিপূর্ণ বসবাস, দেশের অর্থনীতি, সুস্থ সামাজিক জীবন। চারদিকে কোনো আশার আলো নেই; শুধুই সংঘাত ও জিঘাংসা। সত্য-মিথ্যার কোনো বাচবিচার নেই। 'মহান রাজনীতিবিদরা' তাদের স্বভাবসুলভ গলা উঁচিয়ে সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণে যুক্তি-তর্কের আসর বেশ ভালোভাবেই জমিয়েছেন। নেতারা গলা উঁচিয়ে একটা কিছু উচ্চারণ করতে পারলেই সমঝদাররা কথাটাকে লুফে নিচ্ছে। চায়ের দোকানে, পথে-ঘাটে চলছে বক্তব্য, পাল্টা বক্তব্য। চলছে জেদাজেদির পালা। আমরা নাচনেওয়ালারা সেই তালে তালে নাচছি। আমরা দেশ নিয়ে ভাবছি না, দেশের মানুষ নিয়েও ভাবছি না, পরিণতি নিয়েও ভাবছি না, পদ ও ক্ষমতা নিয়ে ভাবছি। 'পিরিতে মজেছে মন, কি-বা মুচি, কি-বা ডোম।' ন্যায়-অন্যায় বোধও আমাদের কারো কারো লোপ পেয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে অনেকে প্রলাপ বকছি। সালিস-দরবার করতে ভিনদেশি মোড়লদের আহ্বান করছি, কখনোবা তারা স্বেচ্ছায় আসছেন। কেউ কেউ দূতিয়ালি করতে তলে তলে কোনো না কোনো দলের পক্ষাবলম্বন করছে, ন্যূনতম নীতিবোধের তোয়াক্কা করছে না। আমরা সাধারণ মানুষ 'চেয়ে চেয়ে দেখলাম, বলার কিছু ছিল না'। দীর্ঘ বছর ধরেই ভোটের রাজনীতি এলেই তৃতীয় পক্ষের সালিস-দরবার আমাদের দরকার হয়। অধিকাংশ সময় সে সালিসেও কাজ হয় না। যে যার অবস্থানে কথার মারপ্যাচ দেখিয়ে অনড় থাকি। এটা আমাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। বিদেশী সালিসদারদের কারো আগমন ও প্রস্থান নিয়েও কথার প্যাচ লাগিয়ে মুখরোচক কথা তৈরি করে যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিই। আত্মমর্যাদা ও আত্মজিজ্ঞাসার জায়গাটা ফাঁকা রয়ে যায়। কোনো কোনো দেশ নিজের স্বার্থবিরোধী কিছু বললে গায়ে জ্বালা ধরে। আবার অন্য কোনো দেশ নিজের পক্ষে কিছু বললে খুব ভালো লাগে। অগতির গতি ভাবি, আশায় বুক বাঁধি। নিজেদেরকে অন্যদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করতে একটুও কুণ্ঠিত বোধ করি না; আত্মশ্লাঘায় অটুট থাকি। মানবিক চরিত্রের এ আবার কেমন বৈশিষ্ট্য!

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক জোট হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছিল। এখন আর তারা তা পারতপক্ষে করে না। তারা আশাহত হয়েছে। 'নেড়া একবারই বেল তলায় যায়।' তারা এখন মিথ্যার বিরুদ্ধে ততটা

প্রতিবাদী হয়ে ওঠে না। তারা এখন বুঝতে শিখেছে, গণতন্ত্র থাক বা না-ই থাক, সাধারণ মানুষের কোনো লাভ নেই, অল্প কিছু লোকের লাভ। এদেশে রাজনীতি মানেই 'বিশাল জনগোষ্ঠীর আত্মত্যাগে মুষ্ঠিমেয় কিছু সুযোগসন্ধানী লোকের পোয়াবারো'। তাই সত্য-মিথ্যা তাদের কাছে গা সওয়া হয়ে গেছে। তাদের গতর খাটিয়ে উপায় করেই জীবন চালাতে হবে– এ নিদেন বুঝ তাদের মধ্যে দিনশেষে চলে এসেছে। আপনি বাঁচলে বাপের নাম বুঝতে শিখেছে। তাইতো এখন যে দলই হোক কাউকে মিটিং-মিছিল শ্লোগানে নিতে গেলে দুপুরে বিরানির প্যাকেট হাতে ধরিয়ে দিতে হয়, নগদও কিছু দিতে হয়। এছাড়া শ্লোগানে লোক পাওয়া যায় না। এসব কথার আরেকটা দিকও আছে। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, বাঙালির বৈশিষ্ট্য এমন যে, আমরা বাঙালিরা সহজে মানুষকে বিশ্বাস করে ফেলি, কাউকে সহজেই আপন ভাবতে শিখি। প্রয়োজনে প্রাণখুলে ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিই। আবার পরক্ষণেই অপাত্রে ফুলের মালা দেওয়া হয়েছে এমন মোহভঙ্গ হলে মালা কেড়ে নিয়ে তাকে আঁস্তাকুড়েও বিনা দ্বিধায় নিক্ষেপ করি। সবক্ষেত্রেই বাঙালির বৈশিষ্ট্যকে মাথায় রেখে এগিয়ে চলা দরকার। এসব ভাবনা মাথার মধ্যে অবিরাম ঘুরপাক খেলে রাজনীতি বাদে শিক্ষা বিষয়ে কোনো কিছু লিখতে কলম চলে না। যদিও শিক্ষা নিয়ে আজকের লেখাটা লিখতে চেয়েছিলাম, শেষে ব্যর্থ হয়ে এ লেখার অবতারণা। উদাসী মন বাগ মানে না। মন বাস্তব অবস্থার দিকে টানে। আবার পাঠকও শিক্ষা বিষয়ে লেখা পড়তে আগ্রহী হবেন কিনা, মনে সংশয়। তাই আজকের শিক্ষাভাবনা শিঁকেই উঠেছে। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু লিখে পৃষ্ঠা ভরছি। বলতে দ্বিধা নেই, এই বায়ান্নটা বছরে আমরা অশুদ্ধিকৃত রাজনীতির পাঁক-কাদায় আটকা পড়ে একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছি। খাঁড়া হয়ে দাঁড়াতে পারছি না, সামনেও এগোতে পারছি না। নেই বিবেকের সামান্যতম দংশন। রাজনীতি এখন পথ হারিয়ে পেটনীতি, উদগ্র স্বার্থনীতি, দুর্নীতি, ভ্রান্তনীতিতে পর্যবসিত হয়েছে। তাই এত দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারা; বিবেক ও আত্মজিজ্ঞাসাকে রাস্তার চৌমাথায় জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে কুরবানি দিয়েছি। রাজনীতির মান যত নিম্ন পর্যায়েই নামুক না কেন, আমরা যে রাজনীতিপ্রিয় জাতিতে পরিণত হয়েছি, আমাদের আত্মমর্যাদা বিশ্ববাসীর কাছে ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে, ক্ষমতার মোহে আমরা তা ভুলে যাই। এটা বিশ্বের কাছে সর্বজনবিদিত। আমাদের বিবাদ মিমাংসা করা তাই অনেক কঠিন। আমরা বিচার মানি, কিন্তু তালগাছটা আমার এই শর্তে। আমরা যার যার অবস্থানে দাঁড়িয়ে মহামহিম। রাজনৈতিক পক্ষগুলোর একটা না-বলা কথা বেশ ভালো লাগে, 'আমরা যা করি তা তোমরা কোরো না, বরং আমরা যা বলি তা তোমরা পালন করো'। এদেশের সাধারণ মানুষের অন্তরের ভাষা আমরা

বুঝতে চাইনে, বুঝেও না বোঝার ভান করি। নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে, বিদেশী প্রভু ও স্বার্থবাদী পক্ষকে খুশী করতে কতটুকু পেরেছি, সেটা ভাবতে পেরেই মহাখুশী। বিদেশী পক্ষকে ইনিয়ে-বিনিয়ে বুঝ একটা দিয়ে দিতে পারলেই আত্মতুষ্ট হই। এসবই আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

জেগে ঘুমানো লোককে জাগানো কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। আমার এই চাঁচাছোলা কথায় অনেকে রুষ্ট হন জানি, কিন্তু আমি অনন্যোপায় হয়েই বলি। পক্ষ-বিপক্ষ সব দলকেই বলতে ইচ্ছে করে, 'যে পথ দিয়ে চলে এলি, সেপথ এখন ভুলে গেলি রে, কেমন করে ফিরবি তাহার দ্বারে, মন মন রে আমার'। এতটা বছরে রাজনীতি যে পথ তৈরি করেছে, তা কালিমামাখা মনুষ্যত্ববোধের ধ্বংসলীলা, মিথ্যার দাপট, বলদর্পিত আচরণ, দুর্নীতির চারণক্ষেত্র ও আত্মঅহমিকা ছাড়া আর কিছু নয়। অনেক মানুষ তাদের মনুষ্যত্বসুলভ বৈশিষ্ট্য থেকে সরে এসেছে। ভুগছে দেশ ও দেশের মানুষ। এসব কথা আমরা কানে তুলি না। দেশের মান থাকলো, কি গেল– তা নিয়ে একটুও ভাবি না। আমার কথার ভাষায়, একগুয়ে মনোভাবে কারো হাস্যরসের পাত্র হলাম কি-না, তাও ভাবি না। শুধু ভাবি, কে কোন দল করে। নিজের দলের সাপোর্টার হলে যত খারাপ কাজই করুক না কেন, সে ভালো লোক। 'তুমি তাই, তুমি তাই গো, আমারো পরাণ যাহা চাই।' আমার কথাতে সায় দিতে না পারলেই তুমি যত ভালো কথাই বল না কেন, তুমি খারাপ লোক। সামাজিক মূল্যবোধ ও সামাজিক শিক্ষাকে পুরো ধ্বংস করে ফেলেছি। এসব দেখা ও ভাবার মতো লোকের সংখ্যাও নগণ্য। 'করিতে পারিনা কাজ, সদা ভয়, সদা লাজ, সংশয়ে সংকল্প নাহি টলে, পাছে লোকে কিছু বলে।' সত্য ভাষণ ও আইনের শাসনের বড্ড অভাব। মানুষের মনুষ্যত্ব যখন লোপ পায়, আমার লোক, নাকি অন্য দলের লোক, এ বিভাজন ছাড়া আর কোনো বিশ্লেষণ গত্যন্তর থাকে না। আমরা সেখানেই আছি। এ সবই আমাদের কূপমন্ডূকতা অথবা মানসিক দেউলেপনা। দলাদলির উর্ধ্বেও যে কেউ-না-কেউ থাকতে পারে, আমরা স্বপ্নেও তা ভাবি না। নিজেকে দিয়ে সবাইকে ঢালাওভাবে বিবেচনা করি। গলা উঁচিয়ে সর্বৈব মিথ্যা বলতেও কারো রুচিতে বাধে না। আত্মজিজ্ঞাসা তো অনেক আগেই রাজনীতির মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছে। বলতে গেলে, সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মূল স্তম্ভই উপেক্ষিত। সমাজ ও পরিবেশ থেকে শিক্ষা ও মানবিকতার গুণ উঠে গেছে। উপরিগত শিক্ষাকথা সেজন্য এখন 'মাথায় মেরে টাকের যত্নের' শামিল। ছাত্রছাত্রীরা বাস্তবতা ও সমাজ থেকে শেখে এক, আর বইতে পড়ে আরেক। এই বৈপরীত্যই আমাদের কাল হয়েছে। আমরা সাধু হই না, সাধু সাজি। আমরা মুখের জোরে স্বীকার না করলেও সত্য হচ্ছে– দেশের

শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার উন্নয়ন বিদ্যমান রাজনীতির ওপর নির্ভর করে। দেশের অর্থনীতি, আর্থিক লুটপাট, সাধারণ মানুষের দুর্দশাও রাজনীতির দশার ওপর নির্ভরশীল।

রাজনীতিবিদরা (?) ভাবতে শিখেছেন, দেশটাই তাদের। তাদের দেশ, তারা যা ইচ্ছে তাই করবেন। তারা রক্ষক হতে গিয়ে ভক্ষক হয়ে বসেছেন। তাদের দৃষ্টিতে হয়তো স্বপক্ষের রাজনীতি, নইলে বিরুদ্ধপক্ষের রাজনীতি– এর বাইরে আর কীইবা থাকতে পারে! এই বায়ান্ন বছরে রাজনীতিবিদরা এদেশ নিয়ে যে খেল দেখালেন, তাতে রাজনীতি-বিতৃষ্ণ দুচোখওয়ালা একটা পক্ষও যে এদেশে গড়ে ওঠা স্বাভাবিক, তারাও কিছু না কিছু বোঝে, এদেশের অবস্থা নিয়ে তাদেরও কিছু কথা আছে– এটা পুরোটাই ভুলে যান অথবা অস্বীকার করেন। রাজনীতিবিদদের ধারণা, রাজনীতিবিদ ছাড়া দেশ চলে না। আমাদের কি ভুলে যাওয়া উচিৎ যে, শ্রদ্ধেয় বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ, বিচারপতি হাবিবুর রহমান ও বিচারপতি লতিফুর রহমানের মতো লোক, যারা আজীবন রাজনীতির ধারে কাছেও ছিলেন না, তারাও সুযোগ পেয়ে এদেশ চালানোর মতো যথেষ্ঠ যোগ্যতা দেখিয়েছেন। তাদের মুখেও তো রাজনীতিবিদরা যতটুকু সম্ভব কলঙ্কের কালিমা মেখে দিতে একটুও দ্বিধা করেননি। আমি নিশ্চিত যে, তাদের মতো অরাজনৈতিক দক্ষ ও যোগ্য লোক এদেশে এখনো অনেক আছেন। রাজনীতিবিদদের দিয়েই যে দেশ চালাতে হবে, এটা কি অবশ্যম্ভাবী? আমরা জানি, জন্ডিস রোগী বিশ্বের সবকিছুকে হলুদ দেখাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিশ্বটা কি আসলেই হলুদ? নইলে এই বায়ান্ন বছরে এদেশের এই গোলে-হরিবোল অবস্থা কেন? তাতে কারো কিছু বলার থাকতে পারে না। তারা যা বোঝেন, অন্য আরো কেউ তা বোঝেন না– এ ধারণা কেন? 'পদ আছে তাই পদাঘাতের জন্য, পৃষ্ঠদেশও হন্যে হয়ে খোঁজেন, ত্রিকাল অজ্ঞ বায়স কূলপতি, সকল কিছু বোঝেন'– ধারণাটা আদৌ ঠিক না।

বিএনপি দেশ পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে ৩১ দফা সম্বলিত সংবিধান সংশোধন ও রাজনৈতিক নীতিমালা প্রকাশ করেছে। অনেক দফা পড়তে খুব ভালো লাগলো। অনেক কথা গঠনমূলকও বটে। তবে অনেক বিষয় নিয়েই আমার চিন্তার ভিন্নতা আছে। এদেশের রাজনীতি যেখানে পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, সেখানে রাজনীতিবিদদের স্বভাবের পরিবর্তন না করে শুধু কাজের কিছু পরিবর্তন করলেই যে সব ঠিক হয়ে যাবে, একথা মেনে নেওয়া যায় না। আমার মনে হয়, বিগত পঞ্চাশ বছরে তো সংবিধান কম পরিবর্তন হলো না, লাভের লাভ কতটুকু হলো! রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও তো কম হলো না। এসব অভিজ্ঞতার আলোকে

পরিবর্তনগুলো এমনভাবেই করা প্রয়োজন যে, রাজনীতিবিদদের যাতে জবাবদিহিতা থাকে। রাজনীতিকে কেউ যেন লাভজনক পেশা হিসেবে না নিতে পারে। এজন্য রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে একটা ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা থাকতে হবে। আগামী আরো একশ বছর যাতে দেশটা সুন্দরভাবে চলে। কোনো পক্ষ যেন দেশটাকে নিজেদের সম্পত্তি ভাবতে না পারে। মানুষ মঙ্গলগ্রহে পাড়ি জমাচ্ছে, আর বাংলাদেশের মতো এত সুন্দর ছোট্ট একটা দেশ পরিচালনা করা কি কঠিন কোনো কাজ? এদেশের মানুষ দিয়েই সবকিছু সম্ভব। প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট পক্ষের আন্তরিক ইচ্ছাশক্তি ও তার বাস্তবায়ন। চিন্তাধারায় সততা ও স্বচ্ছতা। ছোটবেলায় রামপ্রসাদি শুনতে যেতাম। সুর করে গাইতো 'মক্কা-কাশী-শ্রীবৃন্দাবন, অকারণ ঘুরে ঘুরে মরণ, আগে নিজের স্বভাব সুন্দর কর, তারপর ...'। এদেশের রাজনীতি যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, তার চিকিৎসায় ব্যবস্থাপত্র দিতে আক্রান্ত রোগীদের না নেওয়াই ভালো। ব্যবস্থপত্র দিতে দুচোখওয়ালা অরাজনৈতিক চিকিৎসক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। রাজনীতিবিদরা নিজেদেরকে যতই অপরিহার্য অংশ ভাবুক, এদেশে যোগ্য লোক অনেকই আছেন, যারা দেশের ভালো-মন্দ নিয়ে ভাবেন, আবার দেশটা চালাতেও সক্ষম। তারাও এদেশের সুশিক্ষিত নাগরিক। দেশাত্ববোধ তাদেরও আছে। লালন গেয়েছিলেন, 'অমৃত মেঘের বারি মুখের কথায় কি মেলে, চাতক স্বভাব না হলে।' এদেশের রাজনীতিবিদদের মধ্যে ক'জনের সেই চাতক-স্বভাব আছে, কেউ কি গণনা করে দেখেছেন? আমরা এদেশে সুস্থ রাজনৈতিক ধারা চাই, দেশের মানুষের কাছ থেকে সুস্থ চিন্তার বিকাশ চাই, চাই মিথ্যা ও চটকদার বুলিমুক্ত চলে-ফিরে শান্তিময় একটা সমৃদ্ধ দেশ।

(প্রকাশ: ২০ জুলাই ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

'আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা'

গ্রাম এলাকার অনেক রোগীই আমার ঢাকার বাসাতে আসেন। অবস্থা জিজ্ঞেস করলে বলেন, রাতে রাতে ঘুষঘুষে জ্বর হতো, ওজন ক্রমেই কমে যাচ্ছে। শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। হাঁটাচলার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। তাদের কেউ কেউ ভাবেন আমার নামের আগে 'ড.' শব্দটা থাকাতে চিকিৎসাবিদ্যা আমার করায়ত্তে, রোগের চিকিৎসাটা ভালো হবারই কথা। অথবা অন্য কোনো ভালো ডাক্তারের কাছে যেতে পরামর্শ দেবো। তাদের মাথায়ই আসে না যে, সব জ্বরই প্যারাসিটামল চিকিৎসায় ভালো হয় না। অথচ প্যারাসিটামল এক বছর ধরে খেয়েই চলেছে। জ্বর রোগের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। রোগীর সচেতনতার অভাব। মনে মনে জীবন শেষের পর্যায়ে চলে গেছে। জীবনঘাতি রোগ তৃতীয় পর্যায় পেরিয়ে গেছে। এক রোগ শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে রোগগ্রস্ত করে বিকল বানিয়ে ছেড়েছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অনেক চোর-ডাকাতকেও আমি অস্ত্র হাতে যুদ্ধে নামতে দেখেছি। চোর-ডাকাতের মধ্যেও দেশাত্মবোধ দেখেছি। দেখেছি দলমত নির্বিশেষে দেশমাতৃকার কল্যাণে ঝাঁপিয়ে পড়তে। পরবর্তীতে তাদের কাউকে পুরোনো পেশায় ফিরে যেতেও দেখেছি। কম লোককে দেখেছি মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য হারাতে; ডাহা মিথ্যা নির্লজ্জের মতো প্রকাশ্য বলতে। আশা ছিল জীবনের এই পড়ন্ত বিকেলে এদেশের উন্নতি ও উৎকর্ষ দেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারবো। এখন এদেশের মানুষের ভিন্নরূপে দেখছি। দায়িত্বপূর্ণ পদে বসেও অনেকের প্রতারণামূলক কথা বলতে মুখে বাধে না। এত হালকা প্রতারণা যে, রাজনীতি-না-করা লোকও এসব বোঝেন। আমরা নিজেদেরকে এতই 'ঊর্ধ্বলোকের মানুষ' ভাবি যে, নিজ দেশের কর্মজীবী মানুষগুলোকে বোকা ভাবি। কোনোভাবে ফন্দি-ফিকির করে, উচ্চপদের লোকদেরকে নানান সুবিধা দিয়ে ম্যানেজ করে, নামিদামি ধাপ্পাবাজ ব্যবসায়ীদের অবৈধ ব্যবসার সুবিধা করে দিয়ে, নিকটের ও দূরের বিদেশীদের পাওনামতো বুঝ দিয়ে ক্ষমতায় থাকতে বা ক্ষমতায় যেতে পারলেই পোয়াবারো। 'এদেশের সাধারণ মানুষ, যাদের সেবার জন্যই রাজনীতি, তারা আবার কোন ছার!' এটা মহান রাজনীতিকদের অব্যক্ত মনোভাব। আমাদের রাজনীতির ধারা এমনটাই শুরু হয়েছে।

'সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই' কথাটার বাস্তবায়ন দেখতে চেয়েছিলাম। যে রাজনীতি দিয়ে রোগ সারবে, সোনার মানুষ গড়ে উঠবে ভেবেছিলাম, সে রাজনীতিই এখন দিনে দিনে জটিল রোগে আক্রান্ত। কুইনাইনের জ্বরে ধরেছে। এদেশের সকল রোগের সুতিকাগার এই দিকভ্রান্ত রাজনীতি এবং

রাজনীতিকদের নীতিভ্রষ্ট চিন্তাচেতনা ও আচরণ। প্যারাসিটামল দিয়ে বেশ ক'বার জ্বর সারানোর চেষ্টা করা হয়েছে, (যেমন– ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১, ২০০৬ সাল)। এতে রোগের সাময়িক উপশম হয়। রোগ যায় না। ঘুষঘুষে জ্বর থেকেই যায়, আবার ফিরে আসে। তাই দেশ বাঁচাতে এখন রোগগ্রস্ত রাজনীতি থেকে পরিত্রাণই মুখ্য বিষয়। রাজনীতির খোলনলচে বদলানোর সময় চলে এসেছে। রোগীর ভিতরটা পুরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার। এ রোগের চিকিৎসা নিয়ে আমি কমপক্ষে পঞ্চাশ বছর ধরে কাজ করছি। অসুবিধে হচ্ছে আমার কোনো মেডিকেল বোর্ড নেই। প্রয়োজনে বোর্ড গঠন করে নেওয়া যায়। আমি কিন্তু গ্যারান্টি দিতেও রাজি। রোগের উপসর্গ ও ওষুধ আমার জানা। কঠিন রোগের নিরাময়ে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রয়োজনে আরো বড় অপারেশন, অঙ্গচ্ছেদন। কষ্ট লাগলেও জীবন রক্ষার তাগিদে এ অপারেশন মেনে নেওয়া ভালো। বিষয়টাকে হালকা করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। রাজনীতি ভালো হোক, খারাপ হোক, প্রতিহিংসাপরায়ণ হোক– এতে সাধারণ মানুষের কিছু যায়-আসে না। আমরা এই প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতি থেকে নিয়মের মাধ্যমে বেরিয়ে আসতে চাই। আমাদের প্রতিনিধি নির্বাচনে আমার গণরায় আমি দিতে চাই। সাধারণ মানুষ স্বাধীনভাবে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে সম্প্রীতির সাথে বসবাস করতে চায়। বিভাজন, প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ কখনো বসবাসে শান্তি আনতে পারে না। এগুলো করে 'মজা মারছে ফজা ভাই, আমাদের কেবল ঘুম কামাই' সার হয়েছে।

সাধারণ মানুষ অসহায়। যদিও অনেককে বলতে শুনি, দেশটা না কি জনগণের। আমি ক্রমশই বিশ্বাস হারাচ্ছি। কারো মুখের কথার প্রতি তো আস্থা রাখতেই পারছি না, কাগজ-কলমের প্রতিও বিশ্বাস হারাচ্ছি। অনেক রাজনীতিক দেশটা তাদের তালুক বলে গণ্য করেন। কোনটা সঠিক? আমি সন্দিগ্ধমনা। দিন যতই যাচ্ছে রাজনীতির রোগ প্রকট আকার ধারণ করছে। এদেশে সমাজ-সংসার, দুনিয়াদারি, মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য সব কিছুই আজ রাজনীতি নামের সম্মোহনী একচোখা দানবের করালগ্রাসী। এই সর্বনাশা রাজনীতি সত্য, সুনীতি, মানবতা, লজ্জাবোধ, বিবেকবোধ, আত্মজিজ্ঞাসা ক্রমেই ধ্বংস করে ছাড়ছে। মনুষ্যত্ববোধের এসব কথা এখন শুধু অভিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। রাজনীতি মানেই সকল অপকর্ম, মিথ্যা ও লুটপাটের আঁখড়া। এর থেকে কোনো সুস্থ মানুষ এবং দেশ নিরাপদ নয়। যখনই শুনি কেউ রাজনীতি করে, তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে মনের মধ্যে খটকা লাগে, একটা ঘৃণা মনের অজান্তেই ভেসে ওঠে। এর যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়। কিন্তু ব্যতিক্রম দিয়ে তো দেশ ও সমাজ চলে না। রাজনৈতিক

চিন্তাধারা ও কর্ম এত ঘৃণ্য ও জঘন্য হলো কেন? এদেশের যত সামাজিক অবক্ষয়, অপকর্ম, অপচিন্তার জনক এই দিগ্‌ভ্রষ্ট রাজনীতি। আমার কথায় কষ্ট না পেয়ে বাস্তবতার সাথে কেউ এদের কর্মকাণ্ড ও প্রতারণাপূর্ণ কথার তুলনা করলেই সত্যতা পাবেন। আর যারা রাজনীতির আশির্বাদপুষ্ট হয়ে কোনো না কোনোভাবে পদ, আর্থিক সুবিধা, ক্ষমতা ইত্যাদি অর্জন করতে পারছে, অথবা অর্জনের ধান্দায় আছে, তারাই এ বিষবৃক্ষ-সদৃশ দুর্গন্ধভরা রাজনীতির সমর্থক সাজছেন। ভাষার আখরে এত খারাপ কথা লিখতেও কষ্ট লাগে। না লিখেও গত্যন্তর থাকে না; অসহায় হয়ে পড়ি, তাই অবশেষে লিখি। আমি বলি, এদেশে মনুষ্যত্ববোধের সর্বগ্রাসী ও সর্বনাশী রাজনীতি। এদেশের সাধারণ কর্মজীবী মানুষ, যার যার কর্ম সে করে খাচ্ছে। খারাপ পরিবেশের ছোঁয়া এদেরকেও স্পর্শ করছে। তবে লেখাপড়া জানা পেশাজীবীদের অনেকেই রাজনৈতিক দলের সাপোর্ট করতে গিয়ে কেউ অতি সন্তর্পণে, কেউবা প্রকাশ্যে অন্যায়, দুর্নীতি, মিথ্যাচার নিঃসংকোচে ও নির্দ্বিধায় চালিয়ে যাচ্ছে। যিনি দেখছেন ও বলছেন, তার জীবন কন্টকাকীর্ণ। আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নেই, কোনো সামাজিক বিচার নেই, নিয়ম-নীতি নেই। সমাজ কাঠামোও ভেঙে পড়েছে। জোর যার মুল্লুক তার। সর্বত্র পেশীশক্তির প্রাধান্য। আজকের পত্রিকাতেও দেখলাম, 'নিয়ন্ত্রণের বাইরে খেলাপি ঋণ, বিশেষ ট্রাইবুনালে বিচার জরুরি: প্রকৃত খেলাপি সাড়ে চার লাখ কোটি টাকার কম না। সর্বোচ্চ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সময় এসেছে' (যুগান্তর, ৩.১০.'২৩)। আবার একই পত্রিকায় পড়লাম, 'বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন জাতিসংঘ'। আরো পড়লাম, 'বাংলাদেশের মানুষ যেন স্বাধীনভাবে নেতা নির্বাচন করতে পারে সে জন্য ভিসানীতি: মিলার'। আমি কিন্তু একবারও ভাবি না যে, নেতা নির্বাচন হয়ে গেলেই দেশের উন্নতি আর কেউ ঠেকাতে পারবে না। সবই অন্তঃসারশূন্য কথাবার্তা। বায়ান্ন বছরের অভিজ্ঞতা বলে, এসব সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করা ও সময়কে দীর্ঘায়িত করার ফন্দি।

প্রতিটা মানুষের বিবেক তাকে পাহারা দেয়। সমাজের দিকে তাকালে বোঝা যায়, অনেকেরই বিবেকবোধ লোপ পেয়েছে। আমরা কোথায় চলেছি? মানুষ মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে ফেলল কেন, এবং কীভাবে? এ নিয়ে পর্যবেক্ষণে নেমেছি। আমরা মানুষ, না কি মানুষ নামে অন্য কোনো প্রাণিতুল্য। এসব অনাচার, অবিচারের মূলে দেখছি মনুষ্যত্বের কূলনাশা দেশীয় রাজনীতি এবং তার মূলে আছে শিক্ষাহীনতা, যা অন্ধকার যুগকেও হার মানায়। যার শুধুমাত্র অক্ষরজ্ঞান আছে, কিছু টেকনিক্যাল দক্ষতা আছে, তাকেই আমরা শিক্ষিত মানুষ বলে

আখ্যায়িত করছি। বিষয়টা আসলে তা নয়। সমাজে গাওয়া ঘি এবং ডালডা কিংবা পাম-অয়েল একই দামে বিক্রি হচ্ছে। কখনো গাওয়া ঘি-এর বাজার মন্দা। আবার কখনো ডালডা বা পাম-অয়েলের সাথে কেমিক্যাল মিশিয়ে তৈরি কৃত্রিম ঘি-কে গাওয়া ঘি বলে চালিয়ে দিচ্ছি। কখনো গাওয়া ঘি-কে বাজার থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করে দেওয়ার জন্য অপপ্রচারে নামছি, বিজ্ঞাপন প্রচার করছি; এবং মানুষ তা বিশ্বাসও করছে, লুফে নিচ্ছে। আগুনকে মুঠিবদ্ধ করা যত কঠিন, তার থেকে বেশি কঠিন সততা, সত্য ও ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে এ সমাজে কর্ম করে খাওয়া ও বসবাস করা।

বাতাসের মধ্যে থেকেও আমরা যেমন বাতাসের অস্তিত্ব অনুভব করতে ভুলে যাই, তেমনি এমন ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট পরিবেশের সাথে থেকেও আমরা তা না ভাবলে অনুভব করি না, আমরা বোধহীন হয়ে পড়ি। এই বায়ান্নটা বছরের ব্যবধানে পরিস্থিতির এত অবনতি হলো কেন? অথচ আমাদের অনেকেই এ নিয়ে আদৌ ভাবছি না, স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে কোনো এক অজানার উদ্দেশ্যে বোধহীন অবস্থায় ভেসে চলেছি। চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ ও কর্মে মনুষ্যত্বের ছোঁয়া নেই বললেই চলে, যদিও আমরা সবাই নিজেকে মানুষ বলে দাবি করি। মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় কে উৎকৃষ্ট বা কে নিকৃষ্ট– এ বিচারবোধ সমাজ থেকে উঠে গেছে। কে কোন দল করে, কে কোন দলের সাপোর্টার– এটাই ভালো-মন্দ বিচারের প্রধান মাপকাঠি। আর অল্প দিনের মধ্যেই আমরা দল বিবেচনা করে কারো জানাজায় শরিক হব। তখনই বোঝা যাবে এদেশে ন্যায়বিচার নেই। এদেশে সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষাও নেই। মানুষে মানুষে বিভেদ ও প্রতিহিংসা ছড়িয়ে সমাজ ও দেশকে ধ্বংস করা ছাড়া কী লাভ আমরা পাই! নিশ্চয়ই আমরা কোনো না কোনো অদৃশ্য শক্তির ক্রীড়নক হয়ে কাজ করছি।

যৌবনের প্রারম্ভে হাইস্কুল পেরোনোর শেষের দিকে জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' বলতে বুকের ছাতি দুই ইঞ্চি ফুলে উঠতো। এখন জীবনের চাওয়া-পাওয়ার বিশাল গরমিল হওয়াতে কেন যেন বুকের ছাতি আর ফুলে ওঠে না। ভালোবাসার সে অনুভূতি জীবন, ঘটনা ও পরিস্থিতির কোন এক অজানা চোরাবালিতে আটকিয়ে গেছে। আমি আমার এ অপরাধ নিজেই স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু এমনটি হলো কেন? এক দলের মিছিলে গিয়েও অর্ন্তদ্বন্দ্বে সেখানেই মারামারি চলছে। দয়া-মায়া মানুষের মন থেকে উঠে গেছে। আমি তো দেখি রাজনৈতিক আদর্শ বলতেও কিছু নেই। সরকারের কোনো

সেক্টরের কোনো কাজে নিয়মানুবর্তিতা ও আইনের শাসনও নেই। প্রতিটা পদে পদে হ-য-ব-র-ল। আমরা আমাদের চরিত্র (সৎপ্রকৃতি) হারিয়ে ফেলেছি। সকল ক্ষেত্রে স্বার্থপরায়ণতা ও কৃত্রিমতা আমাদের সঙ্গী। আমরা সর্বজনীনতা ও সামষ্টিক মানসিকতার অভাবে ভূলুণ্ঠিত, ধ্বংসের পথে ধাবমান। নেতা নির্বাচন করলে আপত্তি নেই। তবে নেতাদের মধ্যে এবং জনগোষ্ঠীর মধ্যে চরিত্র (সৎ প্রকৃতি), মনুষ্যত্ববোধ ফিরিয়ে আনতে হবে। নইলে যত কথাই বলি, প্রতিজ্ঞা করি দেশ ও জাতির উন্নয়নে ফলপ্রসূ কিছু হবে না; সময় ক্ষেপণ হবে মাত্র। কাজটা সময়সাপেক্ষ বিষয়। তবে কোথাও না কোথাও থেকে শুরু তো একবার করতেই হবে। এজন্য প্যারাসিটামলে জ্বর সারার সময় শেষ। এখন রোগীর জীবন বাঁচাতে প্রথমেই এন্টিবায়োটিক অথবা প্রয়োজন মোতাবেক বড় রকমের অপারেশন জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমার এক সহকর্মী, ধানমন্ডিতে দশ কাঠা জমির উপর ষাটের দশকে বাপের তৈরি স্মৃতিবিজড়িত দোতলা বাড়ি। ছাদ রসে গেছে। বৃষ্টি এলে ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে। বার বার মেরামত করেও কাজ হচ্ছে না। বসবাসে শান্তি নেই। বললাম: দিন যত সামনে যাবে, ঐ পুরোনো বিল্ডিং তত অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর দেরি নয়। ধানমন্ডিতে সেই দোতলা বাগানবাড়ির যুগ কি আর আছে! আপনার দোতলা বাড়ি জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। কবে না-জানি আপনার গায়ের ওপর ভেঙে পড়বে! ভালো একজন ইঞ্জিনিয়ার ডাকুন। প্রথমে বাড়িটা ভেঙে চুরমার করে ধ্বংসস্তুপসহ সরিয়ে ফেলুন। এখানেই শেষ নয়; এ দশ কাঠা জায়গার মাটি কমপক্ষে পনেরো হাত খুঁড়ে উঠিয়ে দূরে কোথাও ফেলে দিন। অতপর নীচে পনেরো তলার ফাউন্ডেশন দিয়ে চার বছরের মধ্যে আবার পনেরো তলা নতুন বিল্ডিং গড়ে তুলুন। শান্তিতে বসবাস করুন। রবি ঠাকুরের সে কথা কি আপনার মনে পড়ে? 'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা, ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা'।

(প্রকাশ: ১১ অক্টোবর ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

‘সেওনা কাজেরো কী–না হলো হে?’

সকালে মনে হলো একটা নিবন্ধ লেখার কথা। প্রসঙ্গ হাতড়াচ্ছিলাম। দেশের অবস্থা কোন দিকে যাচ্ছে অনুমান করতে পারলেও, নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তাই সে প্রসঙ্গ এড়াতে চাচ্ছিলাম। বাসার বাইরে একটু কাজ ছিল। ভাবলাম, কাজটাও করে আসি, আবার অবরোধটাও নিজ চোখে দেখে আসি। টিভি চ্যানেলের ছবির ওপর তো বিশ্বাস হারিয়েছে অনেক আগেই। বিশ্বাস যে কোথায় আছে তাও তো জানি না! আচ্ছা, নির্বাচন নিয়ে যে এত কিছু হয়ে যাচ্ছে, সব কিছুই মনে হয় নির্বাচন কমিশনের গা-সওয়া হয়ে গেছে। রংপুরের উপনির্বাচনে সিসি ক্যামেরা লাগাতে পারলো, আর বি-বাড়িয়া ও লক্ষ্মীপুর উপনির্বাচনে কেন তা পারলো না। বি-বাড়িয়া ও লক্ষ্মীপুর উপনির্বাচনে যে বার্তা বয়ে আনলো তা কি আগামী নির্বাচনের জন্য সুখকর? কি বার্তা এলো? কথায় বলে ‘ইল্লত যায় ধুলে আর স্বভাব যায় ম’লে’– কথাটা মিথ্যে নয়। প্রবাদ তো আর এমনিতে চালু হয় না। যাহোক, চলতে পথে লেখার উপাদান পেয়ে গেলাম। ‘পড়বি পড় মালির ঘাড়েই, সে ছিল গাছের আড়েই।’ আজ আর নিবন্ধ-টিবন্ধ লিখতে ভালো লাগছে না। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে গল্প করি। আসলেই জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা।

তখন বয়স পনেরো-ষোলো হবে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের আগে আন্দোলন চলছে, চলছে গণজাগরণের প্রস্তুতি। এলো সত্তরের নির্বাচন। আমি তেমন কিছু বুঝতাম না। হাইস্কুলের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে গেছি। মিছিলে যেতাম। ছাত্রনেতাদের বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। শুনতাম, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর আমাদের প্রতি চাপিয়ে দেওয়া বঞ্চনার কথা, শোষণের কথা; পূর্ব-পাকিস্তানে উৎপাদিত চিনির দামের তুলনায় পশ্চিম-পাকিস্তানে চিনির দাম সস্তার কথা। কর্ণফুলি মিলের কাগজের দাম দিস্তা প্রতি এদেশে ১৪ আনা, অথচ সেখানে ১০ আনায় পাওয়া যায়, সে কথা। আমাদের এখানে মানুষ গরিব, তিন বেলা খেতে পায় না, অনেকেই পুরো লুঙ্গিও পরতে পারে না। আরো অনেক কথা– সবই সত্য। বিভিন্ন রকম শোষণের কথায় মনটা খারাপ হয়ে যেত। মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠতো। বৈষম্যের মধ্যে শুনতাম– অর্থনৈতিক বৈষম্য, বাজেট ভাগাভাগিতে বৈষম্য, ধনী-গরিবের বৈষম্যসহ অনেক বৈষম্য। যাহোক, নির্বাচনের পর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা হস্তান্তর হলো না এবং নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের কারণে এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে নামলেন। নয় মাসের যুদ্ধে দেশ স্বাধীন হলো। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উদ্দেশ্য লেখা হলো– সাম্য বা সমতা (রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদ বণ্টনব্যবস্থায় সমতার ভিত্তিতে বণ্টন; সামাজিক সমতা,

রাজনৈতিক সমতা, অর্থনৈতিক সমতা, আইনগত সমতা, ব্যক্তিগত সমতা), সামাজিক ন্যায়বিচার (প্রতিটা নাগরিকের ন্যায়বিচার পাবার অধিকার রয়েছে), মানবিক মর্যাদা (মানবিক অধিকার বা স্বাধীনতা)। ১৪ই এপ্রিল প্রবাসী সরকারের নির্দেশাবলীতে আরো উল্লেখ আছে– "বাঙালির অপরাধ তারা অবিচারের অবসান চেয়েছে। বাঙালির অপরাধ তারা মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততির জন্য অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও চিকিৎসার দাবি করেছে। বাঙালির অপরাধ তারা আল্লাহর সৃষ্ট পৃথিবীতে আল্লাহর নির্দেশমত অন্যায়-অবিচার ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছে।"

স্বাধীনতা অর্জন বায়ান্ন বছর পেরিয়ে গেছে। এতটা বছরে আমরা কি দেখে আসছি? সমাজের মুষ্টিমেয় মানুষের কাছে অধিক হারে সম্পদ পুঞ্জিভূত হচ্ছে, সিংহভাগ মানুষ উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে না। আমরা এমন একটা সমাজ গড়ছি যা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সমাজের চেয়েও বৈষম্যপীড়িত। সমাজে হিংসা-বিদ্বেষের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। ন্যায়-অন্যায় বোধ লোপ পেয়েছে। আমরা কি শোষণের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি? আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কোষাগার লুটপাট করে বিদেশে নির্দ্বিধায় অর্থ পাচার চলছে। সরকারের আশপাশে যারা থাকেন তারাই লাভবান হন। অথবা বলা যায় সুবিধা অর্জনের জন্যই ক্ষমতাসীনদের পাশে একটা শ্রেণি ঘুরঘুর করেন, রাজনীতিতে যোগ দেন, মোসাহেবি করেন, ফায়দা লোটেন। 'ওস্তাদ দাঁড়িয়ে কীর্তন গাইলে শিষ্যরা পাক দিয়ে নেচে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।' নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য যে বাজেট বরাদ্দ হয়, তা মাঝপথেই 'সিস্টেম লসে' হারিয়ে যায়। উন্নয়ন বাজেটও তথৈবচ। খাতওয়ারি দেখা দরকার। প্রতিটাতে নিজস্ব অর্থায়নে কত এবং ধার-কর্জ অর্থায়নে কত? কত বছরে পরিশোধযোগ্য? প্রোপ্রাইটি অডিট (যথার্থতা পরীক্ষা) করা দরকার। এতে সত্য বেরিয়ে আসে। ন্যায়বিচার খুঁজতে গেলে বইয়ের পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। সকল অন্যায়-অবিচার এদেশের সামাজিক কালচারে পরিণত হয়েছে। সমাজে সব রকমের অন্যায়-অত্যাচার সহনশীল হয়ে গেছে; বদ্ধমূল হয়ে গেছে। ভুক্তভোগীর জাঁকান্দানি শোনার কেউ নেই, অবিরাম চলছে। আমি যত কথাই লিখি না কেন, পড়ার লোক নেই, কিংবা 'চেয়ে চেয়ে দেখলাম, বলার কিছু ছিল না' অবস্থা। আমার মতো শত শত প্রাবন্ধিক প্রতিনিয়ত এগুলো লিখতে লিখতে হাত ব্যথা করে ফেলেছেন। 'কাজির গরু খাতায় পাওয়া যায়, গোয়ালে নেই'। তাই আজ প্রবন্ধ না লিখে গল্প লিখতে বসেছি।

আজ আমার কাজ শেষে বাসায় ফেরার পালা। রাস্তা পার হয়ে একটা রিক্সা নিলাম। রিক্সাওয়ালা হালকা-পাতলা গড়নের, মুখে দাড়ি। বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের

কোঠায়। অতটা লক্ষ্য করিনি। কিছুদূর এসে তাকে থামতে বললাম। উদ্দেশ্য–পথের দোকান থেকে বাসার জন্য এক ডজন দেশী কলা ও এক কেজি পেয়ারা কেনা। পথের দুধারে এমনই শত শত ফুটপাথ-দোকানি। সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা পরণের কাপড় ও মুখ দেখলেই বোঝা যায়। কায়ক্লেশে জীবন নির্বাহ করছে। কলা ও পেয়ারা কিনে রিক্সায় ওঠার আগেই রিক্সাওয়ালাকে একটা পেয়ারা ও দুটো কলা হাতে দিয়ে খেতে বললাম। উনি না খেয়ে রেখে দিলেন। মনে হলো ওনার রিক্সা প্যাডেল করতে কষ্ট হচ্ছে। বাসার সামনে নামার সময় আমাকে নামতে সহায়তা করলেন। আমি তার গ্রামের বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, চাঁদপুর। ভাড়া কত বলেছিলাম এতক্ষণে ভুলে গেছি। তাকে জিজ্ঞেস করতেই বললেন, তিনি চল্লিশ টাকা চেয়েছিলেন, আমি ত্রিশ টাকা দিতে চেয়েছিলাম। ভাড়াটা চল্লিশ টাকা দিতেই উনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন। দেখলাম, একটা মলিন রোগা মুখ। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি অসুস্থ না-কি? বললেন, হ্যাঁ। পেটের কাপড়টা সরিয়ে দেখালেন, অপারেশনের রোগী। পেটে বেশ বড় একটা কাটা, অনেকগুলো সেলাইয়ের দাগ। দাগ শুকিয়ে গেছে। সংসারে বড় দুটো মেয়ে, লেখাপড়া তিন-চার ক্লাস পর্যন্ত করেছে। টাকা যোগাড়ের অভাবে বিয়ে দিতে পারছেন না। ছোট একটা ছেলে। হয়তো লেখাপড়া শিখতে পারবে না। তিনিও লেখাপড়া জানেন না। তার বাপও লেখাপড়া জানতেন না, শুনেছি। বংশপরম্পরা এমনটিই চলে আসছে। সংসারে উপার্জনের আর কেউ নেই। তাই রিক্সা নিয়ে বেরোতে হয়। রিক্সা ভাড়াটা ফেরত নিয়ে টাকা বাড়িয়ে হাতে দিলাম। নিজের থাকার জায়গাটা দেখিয়ে বললাম, মেয়ের বিয়ে ঠিক হলে আমার সাথে একবার দেখা করে যাবেন। বাসায় এলাম। বাসার সবাই কলা ও পেয়ারা পেয়ে খাওয়া শুরু করে দিলো। আমাকেও দিলো। মুখে তুলতেই লোকটার সেই মুখচ্ছবিটা অবিকল ভেসে উঠলো। স্বাধীনতা সংগ্রামের কিছু স্মৃতি মনে পড়লো। নেতাদের দেওয়া কথাও মনে পড়লো। কলাটা মুখে না দিয়ে নামিয়ে রাখলাম। খাবার টেবিল ছেড়ে নিজ রুমে চলে এলাম। এমন ক'জনকে সাহায্য করে পারা যায়। এরা সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ, এমনকি কোটিতেও ঠেকতে পারে। আমাদের উন্নতির চিৎকারের শব্দে ওদের কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ। আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, সে কাজের কি হলো?

রুমে এসে যুদ্ধের আরো আগের একটা গল্প মনে পড়লো। একটা গ্রামে কয়েক ঘর নিম্ন-সম্প্রদায়ের লোক বাস করতো। গ্রামের ভাষায় তাদের মুচি সম্প্রদায় বলা হতো। গ্রামে তখন বিনোদনের তেমন ব্যবস্থা ছিল না। তারা কয়েকজন মিলে জারি গানের দল তৈরি করলো। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে সন্ধ্যার পর জারি গানের আসর

বসে। মরা গরুর চামড়া ছুলে বাজারে বিক্রি করে কিছু টাকা উপার্জন ওদের অন্যতম পেশা। একদিন সন্ধ্যার ঘণ্টা দেড়েক আগে দুরের গ্রামে ৬/৭ জনের দল বেঁধে জারি গান গাইতে চলেছে। নিজ গ্রাম পেরোতেই একটা মাঠ। কিছুদূর যেতেই একজন দেখলো, একটা নাদুসনুদুস গরু চার পা সটান করে মরার মতো শুয়ে আছে। একজন অন্যজনকে ইশারা করে দেখালো– শিকার পড়ে আছে। ক্ষুর, চাকু, উকো (ফাইল) ও একটা বড় থলে ওরা সব সময় সাথেই রাখে। কি করা যায় সবাই বসে পরামর্শ করলো। দলনেতা দু-জনকে চামড়া ছাড়ানোর কাজে রেখে বাকিদের নিয়ে জারির আসরে যোগ দিতে চলে গেল। সন্ধ্যা শেষে জারির আসর শুরু হয়ে গেছে। চারদিকে লোকের ভিড়। ঢোল ও খঞ্জনির তালে তালে জারির আসর মাত। বেশ পরে রেখে-যাওয়া দুজন আসরে যোগ দিল। দুজনকে দেখে বয়াতির আর ধৈর্য্য ধরছে না। জানতে ইচ্ছে করছে, সে কাজের কী হলো? গান রেখে আলাদাভাবেও জিজ্ঞেস করা সম্ভব হচ্ছে না। অগত্যা ঢোল ও খঞ্জনির তালে তালে নেচে নেচে সুর করে গেয়ে চললো, 'সেওনা কাজেরো কী-না হলো হে'? তার বারবার এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কতক্ষণ আর চুপ থাকা যায়! অন্য দুজনের মন খারাপ।

শীতের বিকেলে অনেক গরুই ঘাস খেয়ে পেট ভরে গেলে রোদ পোহাতে চার পা ছড়িয়ে দিয়ে জমিতে শুয়ে থাকে। কারো মনে হতে পারে কোনো চাষী মরা গরু জমিতে ফেলে রেখে গেছে। দুজন প্রথমেই ফাইলে ছুরি-চাকু ধার দিয়েছে, বিড়ি ফুঁকেছে। আনন্দের সাথে গরুর পায়ের কাছে গিয়ে যেই-না পায়ে ছুরি চালাতে গেছে, গরুটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে ঘাস খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। ঐ দুজনের চমকে উঠে মনঃক্ষুণ্ন. হয়ে ফিরে আসা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। তারাও দেরিতে হলেও আসরে যোগ দিয়েছে। বয়াতির বারবার 'সেওনা কাজেরো কী-না হলো হে?' প্রশ্নের উত্তর দিতে ঐ দুজন উঠে দাঁড়িয়ে ঢোল ও খঞ্জনের তালে তালে হাত ও পাছা দুলিয়ে গাওয়া শুরু করলো, 'চাখাইতে-চোখাইতে, চরণো ধরিতে, উঠে ঘাসো খেলো হে'। নিম্ন-সম্প্রদায়ের ঐ জারি-গানের দলের সকলে নিশ্চয়ই এতদিনে স্বর্গ পেয়েছেন। তারা এতদিন এদেশে বেঁচে থাকলে কি জারি গাইতেন, তা আমার জানতে ইচ্ছে করে।

(প্রকাশ: ২১ নভেম্বর ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

এ সহিংসতার জন্য কি রাজনীতিকরাই দায়ী নন?

কোনো একটু কিছু হলেই গাড়ি ভাংচুর, গাড়িতে আগুন দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থ উদ্ধার করার রেওয়াজ আমাদের দেশে অনেক পুরোনো। যে কেউ যত সুন্দরভাবেই এর অতীত যৌক্তিকতা ও প্রেক্ষাপট তুলে ধরে নিজেকে ভালোমানুষের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করাতে চাক, বাস্তবতা ভিন্ন কথা বলে। বিষয়টি নিয়ে যতই 'নটের গুটি চালাচালি' হোক না কেন, আমরা মুখের জোরে নিজেদের 'শ্রেষ্ঠ বাঙালি' কিংবা 'শ্রেষ্ঠ জাতি'র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করি না কেন, এসবই দুচোখওয়ালা মানুষের কাছে জঘণ্য কাজ বলে বিবেচিত এবং চাঁদের কলঙ্ক বলে মেনে নেওয়াই শ্রেয়। আমরা যতই এসব কাজে প্রতিপক্ষের কাঁধে দোষ চাপিয়ে পার পেয়ে যাবার চেষ্টা করি, 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' চাপিয়ে পার পেয়ে যাই, কোনো পক্ষই ধোয়া তুলসীপাতা বলে নিজেকে দাবি করতে পারবো না। একাজ আমাদের স্বদেশি সংস্কৃতিতে পরিণত হতে চলেছে। কারণ সাধারণ মানুষ নীরব দর্শক হিসেবে খোলা দু-চোখ ভরে পক্ষ-বিপক্ষ উভয়কেই তো দেখছে। যা কিছু ঘটছে, সাধারণ মানুষের চোখের সামনেই ঘটছে। মূল কথা হচ্ছে, এহেন কুসংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসা উচিত। তাতে 'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি' বাক্যের কলঙ্ক ঘোচার সম্ভাবনা থাকে; দেশের সাধারণ মানুষ ও ভুক্তভোগীরাও দারুণভাবে উপকৃত হয়।

আমি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে এর প্রতিবাদ করতে পারি। এদেশের কোনো রাজনৈতিক জোট, যারা কখনো-না-কখনো ক্ষমতায় ছিল অথবা আছে, প্রতিপক্ষ কোনো জোটকে এর জন্য খারাপ বলা, তিরষ্কার করা বা প্রতিবাদ করা মানায় না। এতে আত্মজিজ্ঞাসায় প্রত্যেকেই ধরা খেয়ে যাবে। কথায় আছে 'আপনি আচারি ধর্ম পরকে শেখাও'। আচ্ছা বলুন তো, একজন পকেটমার কি অন্য একজন পকেটমারকে পকেটমারার অপরাধে পেটাতে পারে? একজন ঘুষখোর অন্য আরেকজন ঘুষখোরের ঘুষ খাওয়ার অভিযোগে তাকে চাকরিচ্যুৎ করতে পারে? আমরা সাধু সাজি, অন্তর থেকে সাধু হই না। এটা আমাদের জাতিগত স্বভাব। হোমিও চিকিৎসাবিদ্যায় বলা হয়, রোগ মানুষের দেহে নয়, মনে। এদেশের রাজনীতিকদের মন কঠিন রোগে আক্রান্ত। দিন যত সামনে যাচ্ছে, রোগের সংক্রমণ তত বাড়ছে। রোগটা কিন্তু নিশ্চিতভাবেই ছোঁয়াচে। রোগটা পুরো সমাজে ছড়িয়ে যাচ্ছে। যদিও রোগটাকে নিরাময়যোগ্য করা কঠিন কিছু নয়, এটা আমার বিশ্বাস। গাড়ি ভাংচুর, আগুন সন্ত্রাসসহ সব ধরনের বিকৃত কর্মকাণ্ড– সবই এদের মানসিক রোগের বহিঃপ্রকাশ। সাধারণ মানুষ চায়, এ রেওয়াজ বন্ধ হোক। এ ছাড়াও 'মহান রাজনীতিকরা' বিকৃত কর্ম ও চিন্তা দিয়ে তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য

যতই দেশটাকে অন্ধগলির মধ্যে ঠেলে দিতে প্রস্তুতি নিক না কেন, আজ হোক আর কাল হোক, সাধারণ শান্তিকামী মানুষের জন্য তো দেশটাকে বাসযোগ্য করে তুলতেই হবে। দেশ ছেড়ে পালানো তো এর সমাধান নয়। তাই রাজনৈতিক গোষ্ঠীর যত তাড়াতাড়ি চৈতন্যোদয় হয়, দেশের জন্য ততই ভালো। আইনের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ প্রয়োগ এদেশে নেই জানি। থাকলে অসুবিধা কী? দেশকে যাদের দেওয়ার অনেক কিছু আছে, তাদের করার ক্ষমতা নেই, কর্তৃত্বও নেই। যারা লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান, আগুন নিয়ে খেলে, বিবেকের কোনো দংশন নেই, কাণ্ডজ্ঞান রহিত, ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার ইচ্ছা, ধরাকে সরা জ্ঞান করার অধিকার ও কর্তৃত্ব তাদের। তারা সব ক্ষমতার উৎস। দেশটাও তাদের। আমাদের মতো ক্ষুদে মাস্টারসাহেব উচিত কথাটা বললেই জীবন বাঁচানো দায়। পদে পদে বিপদ। এসব কথা না বলে যে আর কোনো পথ নেই, ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাই বলতে বাধ্য হই। এ বিষয় নিয়ে আমি ব্যক্তিগত দুটো ঘটনা তুলে ধরবো। ঘটনা দুটো আমার অতিশয়োক্তি কিংবা ‘ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া’ হবে না বলে বিশ্বাস।

বেশ ক’বছর আগে ইউরোপিয়ান কমিশনের স্কলারশিপ পেয়ে পোস্ট-ডক্টরাল রিচার্স করতে ইউরোপের একটা দেশে অনেকদিন থাকতে হয়েছিল। আমার সুপারভাইজার ও বিভাগীয় প্রধান ছিলেন খুব ঘনিষ্ঠ। মাঝে-মধ্যেই বসে আড্ডা দিতাম, চা খেতাম। তাদের সাথে তাদের গ্রামে-গঞ্জে ঘুরতাম। উদ্দেশ্য তাদের সমাজ, সামাজিক বুনন, অনুভূতি, সংস্কৃতিকে চোখে দেখা ও উপলব্ধিতে আনা। একদিন সকালে বাসা থেকে ইউনিভার্সিটিতে যেতে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দেখি ২০ মিনিট পর পর বাস আসছে, যা প্রতি ৫ মিনিট পর পর আসার কথা। মেট্রো আসে প্রতি ৫ মিনিট পর পর, সেটাও আসছে আধা ঘন্টা পর পর। ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছতে আধা ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। দেরির কারণে নিজে অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। সুপারভাইজারকে জিজ্ঞেস করলাম, বাস ও মেট্রোর এ অবস্থা কেন। তিনি বললেন, ‘ভাড়া বাড়ানোর দাবিতে বাস ও মেট্রো কোম্পানি ধর্মঘট ডেকেছে। কোম্পানির মালিকপক্ষ বেশ শক্ত লোক, ভাড়া এবার বাড়িয়েই ছাড়বে। জনদুর্ভোগ কমানোর জন্য কোম্পানি ২০ মিনিট ও আধাঘণ্টা পর পর বাস ও মেট্রো ছাড়ছে’। বললাম, ‘পথে তো ব্যক্তিগত ট্যাক্সি, মটরভ্যান ও গাড়ি নির্বিঘ্নে অনেক চলছে, সরকার এ দাবি সহজে মেনে নেবে না’। এ বিষয়ে অনেক কথাই হলো। মাঝপথে রসিকতা করে বললাম, ‘দাবি মানানোর কৌশল আমি জানি। বাস ও মেট্রো কোম্পানিকে আমাকে পরামর্শক পদে নিয়োগ দিতে বলুন। একটা ব্যক্তিগত ট্যাক্সি ও গাড়িও পথে চলতে দেব না। কিছু সন্ত্রাসীকে টাকা দিয়ে ভাড়া করবো। কোম্পানির লোকজন পথে স্লোগান দিতে থাকবে। পথে যে কোনো যানবাহন বেরোলেই ভাংচুর করবে ও আগুন জ্বালিয়ে দেবে। সরকার দাবি মানতে

বাধ্য হবে'। নিজের দেশ থেকে অর্জিত টাটকা অভিজ্ঞতাটা চেপে গেলাম। আমি জানি, কিভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে দাবি মানতে বাধ্য করাতে হয়; নিজে দই খেয়ে কিভাবে অন্যের মুখে হাত মুছে দিতে হয়। অনেক বছর থেকে দেখতে দেখতে 'এ্যান এক্সপার্ট হেডমাস্টার' হয়ে গেছি। অন্তত এ অভিজ্ঞতা তাদের তুলনায় আমার ঢের বেশি। তিনি বললেন, 'আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তোমাকে জেলে পুরে রাখবে'। আমাদের দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দলীয় বাহিনী হিসেবে দল-নিরপেক্ষ হয়ে কাজ না করার কথাও তাকে আর খুলে বললাম না। বললাম না আমাদের দেশের নির্বাহী বিভাগ ও আইন বিভাগের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের তুলনায় দলীয় আনুগত্যের কথা। বুঝলাম, বাঙালির কুটকৌশল, চাতুরতা ও কুটবুদ্ধি সম্বন্ধে তারা কতই না অজ্ঞ! তারা এ কুটবুদ্ধির সংস্কৃতিটাই বোঝে না! এ বিষয়ে আমার মতো বিশাল অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে তাদেরকে অনেক বছর এদেশের সমাজে বাস করতে হবে। বাঙালিকে চিন্তা ও কাজে চিনতে হবে।

একানব্বই সালের জাতীয় নির্বাচনে প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে ঢাকা শহরের পূর্বাঞ্চলের এক সেন্টারে ডিউটি পড়লো। বড় দু-দলেরই নেতারা আমার সাথে এসে দেখা করলেন। ভোট ভালোই হলো। ছিয়ানব্বই সালের নির্বাচনেও একই অঞ্চলের পাশের সেন্টারে ডিউটি পড়লো। এলাকার অনেকেই আমার চেনাজানা, এতে বেশ সুবিধা হলো। রুমে রুমে ঘোরাফেরা করছি। ঐ এলাকার মাঝারি পর্যায়ের এক ভদ্রলোক নেতা এসে আমাকে আমার নির্ধারিত রুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বললেন, 'স্যার, আপনি শিক্ষক মানুষ। একটা কথা আপনাকে না বলে আমি শান্তি পাচ্ছি না।' তিনি বলে চললেন, "একানব্বইয়ের নির্বাচনে আমরা বড় দুটো দল এক হয়ে নির্বাচন করেছি। কে কোন দলের কর্মী বাচ-বিচার করিনি। আমার বাড়ির পাশের জমিতে ঘর উঠিয়ে একঘর গরিব লোক বাস করে। তার ছেলেটার বয়স তখন তেরো-চৌদ্দ। আমি ওকে প্রায়ই স্লোগানে নিয়ে যেতাম। ওকে দিয়ে 'জর্দার কৌটায় তৈরি হাত বোমা' ছোড়াতাম। আমি ওকে খুব স্নেহ করতাম। এবার গত তিন দিন আগ থেকে নির্বাচনে স্লোগান বন্ধ। আমরা সেদিন মিছিল করছি। আমি দেখলাম, 'ও আমাদের স্লোগান লক্ষ্য করে বোমা ছুড়ে পালালো'। মিছিল থেকে ফিরে এসে আমি ওকে ডাকলাম। ও এলো। আমি ওর কান ধরে দু-তিনটা থাপ্পড় মারলাম। ও কাঁদতে কাঁদতে বাসায় চলে গেল। কিছুক্ষণ পরই দেখছি ওর বাপ ওকে সাথে নিয়ে আমার কাছে হাজির। আমার কাছে কৈফিয়ত চেয়ে বললো, 'আমার ছেলেকে তো আপনিই সন্ত্রাসী বানিয়েছেন। ওকে থাপ্পড় মারার আপনি কে? গত নির্বাচনে আপনারা বড় দু-দলই ছিলেন এক। ওকে কাজে লাগিয়েছিলেন। আপনারা ক্ষমতায় গিয়ে ওকে গত পাঁচ বছর আর খোঁজ নেননি। ও এখন বড় হয়েছে। ও গত পাঁচ বছরে অন্য বড় দলে

ভিড়েছে। ওরা এখন আপনাদের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। ও এখন বড় সন্ত্রাসী। যেখানে সুবিধা পায় সেখানেই কাজ করে। বোমা ছোড়ার শিক্ষাটা তো আপনারাই ওকে দিয়েছেন। এখন আপনি আমার ছেলের গালে চড় মারার কে?' স্যার, ঐ লোকটা এভাবে না বলে আমার গালে যদি স্যান্ডেল দিয়ে দুটো বাড়ি দিত, তবুও আমি এত অপমানিত হতাম না। আমরাই তো আমাদের ছেলেগুলোকে নিজ হাতে নষ্ট করে ফেলছি। কাজটা তো ভীষণ অন্যায় হচ্ছে। ঐ লোকটা আমার চোখ খুলে দিয়ে গেছে। আমি কোনো জবাব দিতে পারিনি। এ তিনদিন বড্ড চিন্তার মধ্যে আছি। রাজনীতি করবো কি না ভাবছি। আমরাই তো আমাদের দেশকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বানাচ্ছি। যখন আমার বাইরে যাচ্ছে, তখন তাকে খারাপ বলছি। জেলে দিচ্ছি, বিচার করছি।"

আমি নির্লিপ্তভাবে তার কথাগুলো শুনে গেলাম। আমার মনটাও এদেশের রাজনীতির প্রতি ঘৃণায় ভরে গেল। আমি তো জানি, আমাদের আদর্শ বা মান হচ্ছে, 'আমি যা বলি তা তোমরা শোন, আমি যা করি তা তোমরা কোরো না'। আজ এ লেখাটা যখন লিখছি তখন 'তিপ্পান্নতম মহান বিজয় দিবস'। দেশের অন্য ভালো কোনো দিক ও বিষয় নিয়ে লিখতে পারলে আমার ভালো লাগতো। সে দিকে কলম চলছে না। দেশ নিয়ে বড্ড হতাশার মধ্যে পড়ে গেছি। দেশের মানুষকে আমরা পুরো দু-ভাগে ভাগ করে ফেলেছি। একপক্ষ অন্যপক্ষকে ঘোর শত্রু বলে গণ্য করছি। মনুষ্যত্বের দাবিকে উপেক্ষা করে চলেছি। সবই আমাদের গোষ্ঠী স্বার্থপরতা, বিকৃত মানসিকতা ও জঘণ্য আত্ম-অহমিকার ফসল। আজ সকালে অন্যদিনের মতো পত্রিকা পড়িনি। টিভির সামনেও বসিনি। স্বাধীনতার এতটা বছর পরও বিশ্বের বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা এদেশ নিয়ে অনেক আপত্তিকর বাস্তবতার কথা বলে যাচ্ছে। প্রতিবাদ করতে পারছি না, ভেতর থেকে বাধা আসছে। এতদিনে ক্রমে ক্রমে দেশটা বিশ্বের নিম্নমানের দেশের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হতে চলেছে। আমাদের মূর্খতা, গুমরাহি (পথ গুম হয়েছে) ও পেশীশক্তির কাছে জাতীয় চেতনাবোধ, দেশপ্রেম, বিবেকবোধ ও জ্ঞান হার মানছে। আমরা নিকট ও দূরের পরাশক্তির পুতুলে পরিণত হয়েছি। এর পরিণতি এদেশের ভাবুক জ্ঞানীজনেরা একটু চোখ বুঝলেই নিশ্চয়ই তাদের অন্তর্দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে। আল কুরআনের কথা মিথ্যা হতে পারে না, 'কালের কসম। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে' (আল আসর, ১০৩: ১-৩)।

(প্রকাশ: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

অবচয় ও অপচয়

যুগান্তরের উপসম্পাদকীয় কলামে (৩১/১২/২৩) 'বাজেট সংকোচনের সময়ে ব্যয়বহুল নির্বাচন' শিরোনামে নিবন্ধটি পড়লাম। দেখলাম, এবারের নির্বাচনে খরচের জন্য দুই হাজার দুইশ কোটি টাকার বেশি চাইছে নির্বাচন কমিশন। নাচতে গিয়ে তো আর ঘোমটা দেওয়া চলে না, নাচার মতোই নাচতে হয়। কথায় আছে 'শয়তানকেও তার পাওনাটা দাও'। খরচের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনেরই-বা কী করার আছে! খরচ করে বিভিন্ন ধরণের কাজের ব্যয় তো নির্বাহ করতেই হবে। এ খরচকে তো আমি টাকার 'অপচয়' বলতে পারি না। তবে একই খরচ বার বার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই করতে হলে তাকে 'অপচয়' তো বলতেই হবে। দেশের 'গণতন্ত্র' রক্ষায় অন্তত এ খরচটুকু তো করতেই হবে। দেশের 'গণতন্ত্রের (?) লাইসেন্স নবায়নে' এটা তেমন বেশি কিছু নয়। তার চেয়ে শত গুণ বেশি অবৈধ টাকা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে, ব্যাংক লুট হচ্ছে, কিংবা 'রাজনৈতিক ব্যবসায়ীরা' দেশীয় অর্থ বিনা-আয়করে আত্মসাৎ করছে। জনসাধারণ নিয়ে ভাবনার তেমন কিছু নেই। এদের সহ্যসীমা অনেক বেশি। ডলারের দাম বেড়েছে, দ্রব্যমূল্য ব্যাপকভাবে বেড়েছে– এতে আমি যতটা না উদ্বিগ্ন, তার চেয়ে পুলকিত যে, বর্ধিত অসংখ্য পণ্যমূল্যের উপর অব্যাহত নির্দিষ্ট হারে ভ্যাট কর্তনের ফলে সরকারের আয়ও বেড়েছে। সে অর্থে কিংবা অধিক হারে সুদে টাকা ধার-দেনা করে আনা অর্থে নির্বাচনব্যয় মেটানো যাবে। খরচে স্বাচ্ছন্দ্য আসবে।

'অবচয়' ও 'অপচয়' শব্দযুগল নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত বিষয়টা চলে এসেছে। এগুলো সম্পর্কযুক্তও বটে। শব্দযুগলকে আমি ছাত্রজীবনে প্রায়ই গুলিয়ে ফেলতাম। এখন মোটামুটি বশে এসেছে। এখানে আমি একাউন্টিংয়ের ছাত্রছাত্রীদের পড়াচ্ছি না। পাঠকমহলকে এদেশের বাস্তবতার আলোকে বিষয় দুটোকে তুলে ধরছি। অবচয় (Depreciation) কোনো স্থায়ী সম্পদের মোট আয়ুষ্কালের খরচকে প্রতি ছোট ছোট সময়ের মধ্যে (যেমন প্রতি বছর) ব্যবহারজনিত ক্ষয়ের ফলে একটা নির্দিষ্ট ভিত্তিতে ভাগ করে দেওয়া। অসুবিধা অন্য কোথাও। এ অপবাদ (না-কী মতবাদ?) আমাদের চিরন্তন যে, 'সরকারকা মাল, দরিয়ামে ঢাল'। আমিও একমত পোষণ করি। সরকারি মাল দরিয়ায় ঢালবো না তো নিজের মাল দরিয়ায় ঢালবো নাকি! বাঙালিদের মধ্যে এত পাগল কেউ আর আছে বলে মনে হয় না। ধরুন, সরকারি বাস কোম্পানির কথা। অনেক কোটি টাকা ব্যয় করে বিদেশ থেকে 'ভলভো' নামের দোতলা দামি বাস অনেকগুলো কিনে আনা হলো। কার্যকরী আয়ুষ্কাল ধরা হলো প্রতিটির ১২ বছর করে।

কোম্পানির কর্মচারীরা বাসের সামনের গ্লাস ছাড়া পাশের বা পেছনের গ্লাসগুলো তেমন একটা মোছে না। সরকারি হাতের স্নেহ-মমতা সরকারি সম্পদকে স্পর্শ করে না। অযত্নে-অবহেলায় এমনই অবস্থা হয় যে, এক বছর যেতে-না-যেতেই গ্লাসগুলো স্পটেড হয়ে যৌবন হারিয়ে বুড়ো হয়ে যায়। অতি তাড়াতাড়ি লক্কড়মার্কা হয়ে যায়। গাড়ির ভেতরের অবস্থাটাও এ অবহেলা থেকে রক্ষা পায় না। কখনো যন্ত্রাংশ হারাতে থাকে। ১২ বছরের আয়ুষ্কাল যদি পাঁচ বছরে নেমে আসে, প্রতিবছরের অবচয় বাবদ খরচ কত বাড়বে? আবার এক টাকার জিনিস যদি তিন টাকায় কিনি। অবচয় বাড়বে, না কমবে? দু-জায়গায় ফাঁকি। সুবিধা হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি কিনতে পারি ততই অতিরিক্ত মূল্যের লাভটা পকেটে আসে। প্রতিটা সরকারি হাসপাতালের কোটি কোটি টাকা দামের যন্ত্রপাতি কতগুণ বেশি দামে কেনা হয়? যন্ত্রপাতির ভেতরের পার্টস (যন্ত্রাংশ) কেমন মানের দেওয়া হয়? প্রতিনিয়ত পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে, জেনে নিন। ছয় মাস না যেতেই নষ্ট ও বিকল হয়ে পড়ে থাকে। হাসপাতালে যন্ত্রপাতি ঠিকই থাকে, কিন্তু অব্যবহার্য। (রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রের একটা বালিশ নীচ থেকে ওপরতলায় উঠাতে কত টাকা ব্যয় হয়েছিল?)। কারণ ও অবচয়ের পরিমাণ জানার জন্য চোখ-কান খোলা একজন বাঙালিই যথেষ্ঠ, বিদেশ থেকে গবেষক ভাড়া করে আনার দরকার আছে কি? সংশ্লিষ্ট প্রশাসন বিষয়গুলো আমলে নেয় কি না? হ্যাঁ, নেয়। মুখরক্ষার জন্য সাময়িকভাবে নেয়। বিষয়গুলোর 'লোম বাছতে গেলে কম্বল উজাড় হবে' সে-ভয়ে চুপ করে যায়। সরকারি প্রতিটা দপ্তরে, প্রতিটা সেক্টরের একই দশা, কিছু কম-বেশি। 'খেলা চলছে হরদম! হরদম! হরদম! এ কী খেলা চলছে হরদম? এক দিকে নিরন্ন মানুষ, আরেক দিকে (দুর্নীতি নামের) এটম'। যে দেশের মানুষের সব কিছু সয়, নির্বাচনব্যয়ই-বা সইবে না কেন? গণতন্ত্র আসুক বা না আসুক, নির্বাচনের নামে টাকার অবস্থানের পরিবর্তনের হার (বেগ) (Velocity of money) তো অন্তত বাড়ছে। অনেককেই নির্বাচন নিয়ে ভাবতে দেখি। আমি কিন্তু একটুও ভাবি না। আমার ভাবনা দেশের সার্বিক অবস্থা নিয়ে। এদেশ কীভাবে চলছে ও চলবে– তা নিয়ে। আমি ভাবি, আমার তো বিদায় নেবার পালা চলে এসেছে, আমার স্নেহধন্য ছেলেমেয়ে ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভবিষ্যৎ কী দশা অপেক্ষা করছে, তা নিয়ে।

এবারের নির্বাচনে হরতাল-অবরোধ, সামাজিক বিশৃঙ্খলা বেশি হওয়াতে ঢাকার বাইরে যেতে পারিনি। ঢাকার রাজপথে বেশি ঘোরাফেরা করছি। একটা বিষয় জঘণ্য মানসিকতার পরিচায়ক বলে মনে হয়েছে। যে এলাকা থেকে যে বা যারা নির্বাচন করছেন, সেখানকার রাস্তার দুপাশ বরাবর ওপর-নীচের সারি, কখনো

আইল্যান্ডের উপর-নীচের সারি ধরে মাইলের পর মাইল একই দড়িতে পাঁচ-ছয় ইঞ্চি পর পর পোস্টারের মালা গেঁথে টাঙানো হয়েছে। পাঁচ-ছয় ইঞ্চি পর পর পোস্টার টাঙানোর যৌক্তিকতা কী? এদেশের লোক কি এতটাই কানা যে, দূরে দূরে পোস্টারিং করলে তারা চোখে দেখতে পেতেন না! এটা বিকৃত রুচির পরিচায়ক নয় কি? এতে দেশের কত কোটি টাকার কাগজ ও প্রিন্টিং খরচ বাহুল্য দিতে হয়েছে? অথচ এদেশের লক্ষ লক্ষ শিশু টাকা ও কাগজের অভাবে পড়াশোনা করতে পারছে না। দেশের কোটি কোটি মানুষ দারিদ্রপীড়িত। এভাবে টাকাগুলো অযথা অপব্যয় করে, টাকার গরম না দেখিয়ে জনকল্যাণমূলক কোনো কাজে টাকাগুলো ব্যয় করলে সাধারণ মানুষ অনেকভাবে উপকৃত হতে পারতো। তারা জনসাধারণের সেবার নাম নিয়েই তো পদপ্রার্থী হয়েছেন! পদপ্রার্থীদের জনসেবার মানসিকতা কোথায়? এ আবার কেমন জনসেবার মানসিকতা? কারো কামেল-ফকির হওয়ার দরকার নেই, এরা নির্বাচনে পাশ করে ভবিষ্যতে জনসাধারণের কেমন সেবা করবে– তা কি কেউ পূর্বানুমান করতে পারে না? এরা নির্বাচনে পাশ করে জনকোষাগার থেকে কতগুণ টাকা ফেরত নেওয়ার কৌশলে মেতে উঠবে? কত দেশের নির্বাচনই তো জীবনে দেখেছি, কিন্তু এত অপচয়ের (Misuse) মানসিকতা তো কোথাও দেখিনি।

আরেকটা কথা বলি বলি করে বেশ কিছুদিন থেকে বলা হচ্ছে না। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। কথাটা শুনলে এদেশের অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষ হয়তো আমার ওপর নাখোশ হতে পারেন, কিন্তু না বলে পারছি না। তাই এ অবাঞ্চিত কথার অবতারণা। এ পর্যন্ত এদেশে প্রায় ৩০০ টি 'মডেল মসজিদ' হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে তৈরি করা হয়েছে। আরো তৈরি হবে। এর মোজেজা কী? এদেশে কি এমন কেউ আছেন যিনি মসজিদের অভাবে নামাজ আদায় করতে পারেননি? মসজিদের কথা শুনলে নামাজি-বেনামাজি প্রত্যেকেই সাধ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। আমরা ছোটবেলায় দেখেছি, আমাদের পাঁচটা গ্রাম মিলে একটা মসজিদ। মানুষগুলো ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। তারপর প্রতিটা গ্রামে ক্রমশ একটা করে মসজিদ হলো। দলাদলির ফলে মসজিদের সংখ্যা বাড়া শুরু করলো। বর্তমানে প্রতি গ্রামেই চার-পাঁচটা করে মসজিদ। এমনকি পাঁড়ায় পাঁড়ায় মসজিদ। মুসলমানদের মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে, দলে দলে শত্রুতা, হিংসা, অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। নৈতিকতার উন্নতি ও অহিংস ঈমানি-শিক্ষা ছাড়া এসব দূর হবে না।

সমস্যা আরো অন্য জায়গায়। গ্রাম এলাকার অধিকাংশ মসজিদে জুমআর দিনে একটা কাতারও পুরো হয় না। ওক্তীয় নামাজে উপস্থিতির বেহাল দশা। নামাজি

লোকের অভাব। আবার নামাজি লোক যেনতেন, মুসলমানি জীবনবিধান ও চিন্তা-চেতনাসমৃদ্ধ লোকের আরো অভাব। এদেশে খাতা-কলমে নব্বই শতাংশ লোক মুসলমান। কুরআন ও হাদিস ঘাঁটলে দেখা যায় মুসলমান নামে নয়, পোশাকেও নয়, মুসলমান তার চিন্তা-চেতনা, বৈশিষ্ট্য ও কাজে। সমাজে এমন লোকের খুব ঘাটতি। এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার লোকও কম। কয়েক বছর আগে একটা লেখা পড়েছিলাম। সেখানে লেখা ছিল, 'নবীর যুগে মানুষ গড়েছে গড়েনি তো মসজিদ, আমাদের যুগে মসজিদ গড়েছে মানুষ হয়নি ঠিক।' কথাটা আমার ভাবনার উদ্রেক করেছিল। বর্তমানে যে মসজিদেই যাই, দামি লাইলস চারদিকে লাগানো। অনেক মসজিদে এসির ব্যবস্থাও আছে। আমি মনে মনে জিজ্ঞেস করি, তোমাদের সবার ঈমানের হালত কী? কোনো উত্তর পাই না। মসজিদের দেওয়ালে শক্ত প্লাস্টারের প্রলেপ না দিয়ে, দামি টাইলস ফিটিং না করে ঈমানের দেওয়ালে শক্ত সিমেন্টের প্লাস্টার ধরালে, এর জন্য টাকা খরচ করলে কতই না ভালো হতো! মুসলমানি চরিত্রে টাইলস ফিটিং করলে এদেশের যত মিথ্যা, শঠতা ও মোনাফেকি অতি অল্প সময়ে দূর হয়ে যেত। প্রশ্ন জাগে, আগে মডেল মসজিদ গড়বো, না কি আগে মানুষ গড়বো? প্রয়োজন ইসলামের সাম্য-ভ্রাতৃত্ববোধ ও ইমানি শিক্ষা, মনুষ্যত্ব-জাগানিয়া শিক্ষা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া। এর জন্য টাকা ব্যয় করা। তারা তাদের প্রয়োজনমতো মসজিদ গড়ে নেবে। আমরা টাকা খরচ করে মুসলমান তৈরি করবো। অথচ আমরা যাচ্ছি স্রোতের বিপরীতে। মসজিদ কখনো মুসলমান বানায় না, মুসল্লিও তৈরি করে না, মুসল্লিরা মসজিদ বানায়। আমাদের প্রয়োজন মুসল্লি তৈরি করা। ইসলাম শান্তির ধর্ম। শান্তির বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া। নামধারী মুসলমানকে ইসলামি আদর্শে শিক্ষা দেওয়া।

এদেশে কওমি ও আলিয়া মাদ্রাসায় লাখ লাখ গরীব-অসহায় ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করে। শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজনানুযায়ী সীমিত। তারা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও সুবিধা বঞ্চিত। এলাকার বিভিন্ন দাতা ও সহায়তাকারীদের আর্থিক সহায়তায় তাদের চলতে হয়। তাদের জীবনযাপনের অবস্থাও উন্নত নয়। অনেক ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে জীবনে টিকে থাকতে হয়। শুধুমাত্র কুরআন ও হাদিস পড়ে এদেশে জীবন গড়া যায় না। বেশি বেতনে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও হয় না। বড় হয়ে রুজি-রোজগার কতটুকু করতে পারে তা আমরা সমাজের প্রতিটা সচেতন মানুষই জানি, যদিও তাদের মধ্যে অসংখ্য মেধাবী ছাত্রছাত্রীর জীবন আধা-প্রস্ফুটিত ফুল হয়েই অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। দেশের প্রয়োজনেই তাদেরকে উন্নত জনশক্তিতে পরিণত করা বাঞ্ছনীয়। যথাযথ সুযোগ পেলে তারাও দেশের সম্পদে পরিণত হতে পারে।

তারাও বৃহৎ জনগোষ্ঠীর একটা অংশ। কুরআন ও হাদিস শিক্ষার পাশাপাশি কেউবা টেকনিক্যাল শিক্ষায় যাবে, কেউবা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হবে। তারা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মানব সেবায় মনোনিবেশ করতে পারে। এভাবে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে মডেল মসজিদ তৈরির পরিবর্তে মাদ্রাসার অসহায়-দরিদ্র ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের গড়ে তোলা, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাজে ব্যয় করলে অসংখ্য গরিব-মেধাবী ছাত্রছাত্রী জীবনের দিশা পেত এবং সমাজের কল্যাণ সাধিত হতো। এজন্য খরচ করাকে খরচ না ভেবে মানবসম্পদ তৈরিতে বিনিয়োগ বলে ভাবতে পারতাম। সংশ্লিষ্ট পক্ষ বিষয়টা ভেবে দেখতে পারে, হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে মডেল মসজিদ গড়া অপচয়, না কি অবচয়, না কি সৌখিনতা। আমরা এদেশের মানুষ কিন্তু ইসলামি জীবনবিধান ও কর্ম ভুলে অতি সহজে, সহজ বুদ্ধিতে বিনা-বাধায় বেহেশতে যেতে সব সময় প্রস্তুত থাকি এবং সে ব্যবস্থায় বেশি মনোযোগী হই।

(প্রকাশ: ৬ জানুয়ারি ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

‘ও মুর্শিদ পথ দেখাইয়া দাও, আমি যে পথ চিনিনা গো...’

ছোটবেলায় শেখা গানের কলি এখনও কিছু কিছু মনে পড়ে। একটা গানের প্রথম কলি হলো: ‘ও মুর্শিদ পথ দেখাইয়া দাও, আমি যে পথ চিনি না গো সঙ্গে কইরা নাও, মুর্শিদ...’। গানের কলিগুলো আজও পাথেয় বলে মনে হয়। এদেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে দেখি, আত্মরক্ষার সব পথ যখন সংকুচিত হয়ে আসে, তখন মুর্শিদের কাছে সাহায্য চাওয়া ছাড়া বিকল্প তো আর কিছু থাকে না। এটা বাঙালি মুসলিম সমাজের শাশ্বত আকুতি ও রীতিনীতি। তাই আমার এই গানের কলির অবতারণা। শিক্ষকতা পেশায় থাকাতে অন্য কোনো খারাপ ধান্ধায় না জড়িয়ে জীবনের এইসব গান আঁকড়ে ধরে এদেশে জীবন সাগর পাড়ি দিচ্ছি। এই জীবন-গানের যতটুকু মনে পড়ে আজ গেয়ে শুনাবো। যুগান্তর পত্রিকার উপসম্পাদকীয় ছাড়াও বেশ কয়েকটা সংবাদ ক'দিন ধরে পড়ছি। ‘সুবর্ণচরে আবারও দলবদ্ধ ধর্ষণ– পৈশাচিকতার শিকার মা-মেয়ে: আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার (৭.২.’২৪)।’ ‘কারা ওদের বখাটে বানাল? (উপসম্পাদকীয়, ৬.২.’২৪)।’ ‘জাবি শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের চার দফা– নিরাপদ ক্যাম্পাসের দাবিতে আন্দোলনের ডাক (৭.২.’২৪)।’ ‘গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন– প্রকল্পের অর্থছাড়ে অবৈধ লেনদেনের ছড়াছড়ি (৬.২.’২৪)।’ ‘গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে ভারত পাশে ছিল: পররাষ্ট্রমন্ত্রী (১০.২.’২৪)’। ‘চিকিৎসাব্যবস্থা সেবার জায়গা থেকে চলে এসেছে ব্যবসায় (১০.২. ’২৪)’ ইত্যাদি। এছাড়াও নিজের জীবন থেকে সদ্য নেওয়া একটা চলমান ঘটনার কিয়দংশ কেস-স্ট্যাডি হিসাবে এখানে তুলে ধরবো।

বারবার এসব শিবের গীত গাইতে জীবনের এই বেলাশেষে আর ভালো লাগে না। তবু না গেয়ে উপায়ও থাকে না। উপরে মাত্র কয়েকটা বিষয় উল্লেখ করলাম। পত্রিকা পড়লেই হাজার হাজার এসব সংবাদ গোচরীভূত হয়। দেশের ভবিষ্যত ঠিকানা নিয়ে মনের কোনে সংশয় জাগে। সব কিছুতেই প্রমাণিত হয় জনগোষ্ঠী ক্রমেই নৈতিকতা ও মানবিকতা হারিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; জন-আপদে পরিণত হচ্ছে। দুর্নীতি প্রতিটা পর্যায়ে মহামারির মতো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। কথায় ভেজাল, চিন্তায় ভেজাল, কর্মে ভেজাল, ধর্মে ভেজাল, বিবৃতিতে ভেজাল, ভেজালের ঢেউ এদেশের ‘বেহেশতনামি বাগানের’ প্রতিটা জীবনের মন্দাকিনী তীরে আছড়ে পড়ছে। আবার ‘বেহেশতের এ বাগান’কে কোনো একজন বিচারপতি ‘জাহান্নামের’ সাথে তুলনা করছেন। তাই দেশ কেমন চলবে সবাই আমরা বুঝতে পারি। এ নিয়ে ভাবার কেউ নেই। দেখার কেউ নেই। প্রত্যেকে যার

যার ব্যক্তিগত কিংবা গোষ্ঠীগত ধান্ধায় মত্ত। যারা ভাবছেন, তাদের কথার কোনো গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না এবং পরিস্থিতি উন্নতির পরামর্শ কোনো আসরেই পাত্তা পাচ্ছে না। মানুষের জন্য সমাজ, রাষ্ট্র। মানুষই এর রক্ষাকর্তা, মানুষই সুরাসুর। সেই মানুষের বৃহদংশ দুর্নীতিবাজ, অমানুষ, মিথ্যাবাদি, স্বার্থপর, ধাপ্পাবাজ, চুগলখোর, 'চাটার দল', পশুসাদৃশ কৃতকর্ম ও চিন্তা-চেতনাসমৃদ্ধ হয়ে গেলে দেশ ও সমাজ চলে কীভাবে! পত্রিকার খবরগুলোতে তো এসবেরই প্রমাণ মেলে।

কেবল নির্বাচন হয়ে গেল। অবৈধ টাকা লেনদেনের আখড়া জমেছিল, একথা আমরা কে না জানি! এটাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। অবৈধ এসব লেনদেন প্রমাণ করে নিকট ভবিষ্যতে আমরা ভালো পথে চলবো না। শত শত কোটি টাকার লেনদেন করে যদি নির্বাচিত হই কিংবা কোনো পদে বসি, অবশ্যই কমপক্ষে তার পাঁচ-দশগুণ টাকা দায়িত্বে থাকাকালীন যে কোনো উপায়ে ফেরৎ নিতে চাইবো। ধরার কেউ নেই, বলারও কেউ নেই। যিনি সেচ্চাবিপদ ডেকে আনতে চান, তিনিই প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেন। আমি ক্ষুদ্র-নগণ্য মাস্টার মানুষ, স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, প্রতিবাদের সক্ষমতা আমার নেই। তখনই বলতে হয়, এদেশে রাজনীতি একটা লাভজনক ব্যবসা, যার কারণে দেশ ও দেশের সাধারণ মানুষ বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে; দেশের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাগুলো ত্রুটিযুক্ত কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিকল হয়ে পড়ে আছে। মনে পড়ে একই গানের কিয়দংশ, 'অন্ধকারে পইড়া ডাকি আমায় নিয়া যাও, মুর্শিদ আমায় নিয়া যাও/ তুমি যে নিদানের বান্ধব বাঁচাইয়া দাও নাও, মুর্শিদ...'। আমাদের 'করিতকর্মা রাজনীতিক ব্যবসায়ী'দের কাছ থেকে সমাজের প্রতিটা পেশার মানুষ অপকর্ম, অনাচার, জিব ঘোরানো-প্যাচানো, ডাহা মিথ্যার বেসাতি ইত্যাদিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই সমাজ গেছে পচে। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধারের সময় সব দল এক। যদিও মুখের বচন—'উন্নয়ন'; নিরেট বাস্তবতা হচ্ছে: অমানবিকতা, গলাবাজি, মিথ্যাচার, ধ্বংসের হাতছানি, আধিপত্যবাদের চাটুকারিতা, দেশ শোষণ, অবৈধ টাকার পাহাড় গড়া ইত্যাদি।

এ সমাজে সব অন্যায়-অত্যাচার, দুর্নীতি তো ওপেন-সিক্রেট হয়ে গেছে। শুধু 'ভাসুরের নাম' মুখে বাধে বলে বলা নিষেধ। অসুবিধার মধ্যে এটুকুই যে, আমরা নিজের চিন্তা ও কর্মকে অস্বীকার করি, তার পরও টিকে থাকি; কারণ 'হাম্ভিও কাঁঠাল খাইয়া, তুম্ভিও কাঁঠাল খাইয়া, তুম হামারা দোস্ত' গল্পের বাস্তব প্রয়োগ হয়ে যায়। এগুলো আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা সাধু সাজি, সাধু হই না। আমরা নিজেদের বড্ড চালাক-চতুর, খুব বুদ্ধিমান ভাবি। কিন্তু প্রকৃতির প্রতিশোধ থেকে নিজেকে এবং আমাদের ওপর নির্ভরশীল দেশ, সমাজ ও ব্যক্তিদের রক্ষা

করতে পারিনে। দেশ ও সাধারণ মানুষ ভোগে । ইদানীং একটা প্রবণতা গড়ে উঠেছে বলে বাতাসে চাউর হয়েছে। হয়তো ঘটনাটা ঠিক নয়, বাতাসেরই দোষ, দুর্গন্ধময় বাতাস। বিষয়টা এরকম 'গুলি মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে'। কথাটা সম্ভবত পরলোকগত পীর হাবিবুর রহমানের লেখায় পড়েছিলাম। বিষয়টার বাস্তবায়ন এরকম: টাকা দেবো 'অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে', পার্শ্ববর্তী দেশে তৃতীয় পক্ষকে, পদ নেবো এদেশে। তাও অল্প টাকা নয়, শত শত কোটি টাকা। বড্ড লজ্জা ও বিপদের কথা! আমরা কি আমাদের অস্তিত্ব হারাতে বসেছি? স্বাধীনতাপ্রিয় দেশপ্রেমী শক্তিকে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে।

উপরের খবরগুলো এ-কথাই প্রমাণ করে, দেশে আইনের শাসনের দারুণ অভাব, শক্তিমানের দাপট বিদ্যমান, মনুষ্যত্ববোধ ও নীতি-নৈতিকতা অপসৃত, লুটপাটের কৌশলে ক্ষমতাধররা টেইনিংপ্রাপ্ত, পক্ষপাতদুষ্ট সমাজ, দুর্নীতিবাজরা সুযোগের পরিবেশ তৈরিতে ব্যস্ত। এমন হলে দেশ চলে কীভাবে? মুর্শিদের কাছে পথের সন্ধান চাওয়া ছাড়া গত্যন্তর কী?

বেশ কিছু পরিচিতজন, আত্মীয়-স্বজন হাসপাতালে। তাদের দেখতে হাসপাতালে যেতে হচ্ছে। আরো শত শত রোগীর সন্ধান পাচ্ছি। প্রতিটা হাসপাতাল জনাকীর্ণ। অধিকাংশ রোগী জীবনঘাতি রোগে আক্রান্ত। ভেজাল বাতাস ও খাদ্যে ভেজালের ফলে অকালেই কিডনি ফেইলিউর, ক্যান্সারের মতো রোগে ভূগছে। আমরা রোগগ্রস্ত, পঙ্গু ও দুর্বল জাতিতে পরিণত হচ্ছি। কে এদের খোঁজ নিচ্ছে? রোগের প্রতিবিধানের কোনো ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি কি-না? আমাদের চিন্তা ও কর্ম প্রতিবিধানের দিকে, না-কি সেখানকার পরিবেশ ও অবস্থার সুযোগ নিয়ে যতটা পারা যায় উপায়-রোজগারের দিকে? এদেশের যত অপকর্ম ও পৈশাচিকতার সাথে যুক্ত কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের পোষ্যপুত্ররা। এদেশে এদের কোনো জবাবদিহিতা নেই। এদের ক্ষেত্রে আইনও অকার্যকর। সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে? জবাবদিহিতা নেই বলেই অনেক সুযোগসন্ধানি রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় এসে অপকর্ম করে। এর কি কোনো নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা করা যায় না? এবার নিজের সদ্য-অর্জিত অভিজ্ঞতাকে কেস-স্ট্যাডির নামে তুলে ধরি।

ঢাকার অদূরে গাবতলী বাস টার্মিনাল পেরিয়ে আমীনবাজারের পশ্চিম দিকে 'মধুর স্বাদে ভরা' একটা হাউজিং প্রকল্প গড়ে উঠেছে। মালিক পক্ষের রেষারেষিতে প্রকল্প যথাসময়ে সরকারি অনুমোদন পেতে ব্যর্থ হয়। জমি বিক্রি প্রায় শেষ। কোর্টের রায় আসে জলাভূমি ভরাটের বিরুদ্ধে; যদিও ঢাকা শহরের বিস্তার-লাভ ও বিশালতা

জলাভূমি ভরাট দিয়েই হয়েছে ও হচ্ছে। তিন থেকে চার হাজার সাধারণ প্লটক্রেতা মহাবিপদে। অনেকেরই জীবনের সম্বল শেষ। আশার আলো এটুকুই যে আদালতের রায়ে প্লটক্রেতাদের স্বার্থরক্ষার কথাও বলা হয়েছে। প্রকল্পের মূল মালিক বিদেশ পাড়ি দিয়েছে। বর্তমানে প্রজেক্ট-মালিকের অভাব নেই, হযবরল অবস্থা। ব্যবস্থাপনার নামে বিভিন্ন পক্ষের বেশ কিছু সুযোগসন্ধানী লোকজন প্রজেক্ট লুটপাট, জমিদখল ও অবৈধ রুজি-রোজগারের আখড়া জমিয়ে তুলেছে। এখানে আমারও একটা পাঁচ কাঠার প্লট আছে, মাসিক কিস্তিতে কিনেছিলাম। একাধিকবার বেদখলও হয়েছে। প্লট ক্রেতাদের সংগঠনের অভাব নেই, ঠিক এদেশের রাজনৈতিক দলের সংখ্যার মতো। কারো পূর্ণাঙ্গ গঠনতন্ত্র নেই, প্লট প্রতিনিধি নির্বাচনে কোনো গতিশীলতা নেই। অনেকের বিরুদ্ধেই তহবিল তসরুপ ও অবৈধ জমি দখলের অভিযোগ। কেউ কেউ পানি ঘোলা করে মাছ ধরে টাকা বানাচ্ছে। সেখানে এদেশের অনেক কাক ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করেছে। কারো 'মুখে মধু, পেটে বিষ'। এমনই একটা জগাখিচুড়ি অবস্থায় প্লটমালিকদের একদল লোক আমাদের নয় জনকে অনুরোধ করলো: প্লট-প্রতিনিধি নির্বাচনে গতিশীলতা আনতে হবে, ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম ও ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রোল সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রজেক্টকে আইনের মাধ্যমে সাত বছরের মধ্যে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। আমরা অবৈতনিক কাজে বহাল হয়ে গেলাম। সব পক্ষের সাথে মিলে লিখিতভাবে সকলের স্বাক্ষর নিয়ে উদ্দেশ্যের নীতিমালা (ToR) তৈরি করলাম। সবাই সম্মত। কয়েকদিনের মধ্যে মতলববাজ ও মিছরির-ছুরি লোকগুলো ঠুনকো অজুহাতে বিরোধিতা ও অপপ্রচার শুরু করলো। এদেশে ওদের পোয়াবারো। চামড়ার জিহ্বা ঘোরে ফেরে। আমরা তাদের শত্রু নই। তারাও এটা মনে মনে জানে। শত্রু হচ্ছে প্রতিনিধি নির্বাচনে গতিশীলতা আনার চেষ্টা। তাদেরকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করলেই তো হয়; আবার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কেন! শতেক বাহানা। বাইরে নিজেকে ফেরেশতা হিসেবে দেখানো; মনে ও কাজে টাকা হাতানো স্বভাব। টাকা-পয়সা ও ব্যবস্থাপনায় কোনো জবাবদিহিতা নেই; প্রজেক্টের 'মহান নেতারা' কাজ করবে; তার জন্য আবার 'ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম' ও 'ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রোল সিস্টেম' প্রতিষ্ঠা কেন! কন্ট্রোলিং সিস্টেম তৈরি করার চেষ্টার সাথে তাদের শত্রুতা। তারা যেমন খুশি খাবে, গাইবে, নাচবে। আমার মতো একজন মাস্টার সাহেব 'কন্ট্রোল সিস্টেম' তৈরি করার কে! এখন আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সীমা-পরিসীমা নেই। 'খলের ছলের অভাব হয় না'। সাধারণ প্লটমালিকরা এক দিকে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে; খলরা ক্ষমতাধর, লাঠিয়ালবাহিনীর নেতা, আত্মপ্রবঞ্চক, ডাহা মিথ্যাবাজ, প্রতারক, অপপ্রচারকারী, খাদকগোষ্ঠী আমাদের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে। নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এখন যত নিন্দা ও

দোষের দায়ভার আমাদের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে দুর্নীতিবাজরা অভায়ারণ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে। সাধারণ প্লটমালিক নির্বিকার। 'ক্ষমতাধরদের কাছে তারা 'ঠেলার নাম বাবাজী' হয়ে বসে আছে। এই আমাদের সমাজ!

আমি পেশায় একজন সার্টিফায়েড ম্যানেজমেন্ট ও ফাইন্যান্সিয়াল কন্সালটেন্ট। আজ তেতাল্লিশ বছরে যেখানে গিয়েই দুর্নীতি বন্ধ করার চেষ্টা করেছি, যথাযথ ম্যানেজমেন্ট ও ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রোল সিস্টেম চালু করার চেষ্টা করেছি, ছোট-বড় কোম্পানি বাদে সরকারি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে আমাকে পাল্টা 'দুর্নীতিবাজ পদবীর' মালা গলায় পরে সম্মান বাঁচিয়ে নীরবে সরে আসতে হয়েছে। এমনই হাজার হাজার ঘটনা আমি স্বচোক্ষে দেখছি। এদেশে মানুষের সামাজিক সুশিক্ষা, বিবেচনা বোধ বাড়েনি, কুটিল স্বার্থবাদী বুদ্ধি বেড়েছে। জিব ঘোরানো-ফেরানো, উল্টানোর জন্য কোনো শাস্তি পেতে হয় না। বিবেক, মনুষ্যত্ব ও পরিবেশ গেছে বেশি নষ্ট হয়ে। পরিবেশ-পরিস্থিতির দ্রুত ক্রমাবনতি হচ্ছে।

এদেশের কথায় আসুন। যখনই জবাবদিহিতা, রাজনীতিকদের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা, ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রোল সিস্টেম এদেশে চালু করতে যাবেন, তখনই দেখবেন সব দল এর বিরুদ্ধে কথা বলবে। তারা জবাবদিহির বাইরে থাকতে চাইবে। পুরোনো ত্রুটিপূর্ণ জবাবদিহি সিস্টেম বহাল রাখতে চাইবে। বিভিন্ন অজুহাত দেখাবে। 'সব শিয়ালের এক রা' হয়ে যাবে। আপনি তখন অচ্ছুৎ সম্প্রদায়ের কেউ বলে পরিগণিত হবেন। বলা হবে, আপনি কথা বলার কে? আপনি তখন একটা ফুটবল। একদল লাথি মেরে অন্য দিকে পাঠাবে, অন্য দল লাথি মেরে বিপরীত দিকে পাঠাবে। আপনার কোনো দল নেই, আপনি সত্য কথা বলার দলে। সবার লাথি আপনার মাথায়। যতদিন এদেশে রাজনীতির জবাবদিহি সিস্টেম আইনের মাধ্যমে চালু না হবে, মানুষকে নীতিবান-স্বদেশপ্রেমী শিক্ষায় শিক্ষিত করে না তোলা যাবে, আমাদের দেশোন্নয়ন চাওয়া অধরাই রয়ে যাবে। তখনই গানটার শেষাংশ মনে পড়বে, 'মাঝ দরিয়ায় উঠলে তুফান পথের লাগলে ভুল, আমি কোন নামেরি দোহায় দিয়া, হায় রে কোন নামেরি দোহায় দিয়া, আমি পাইবো নদীর কূল, মুর্শিদ পথ দেখাইয়া দাও'।

(প্রকাশ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ,
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

মুক্তির পথের অ্যারো চিহ্ন কে দেখাবে?

জীবনের এই পড়ন্ত বিকেলে এসে ছোটবেলার অনেক স্মৃতি মনে পড়ে। বলতে পারলে ভালো লাগে। বয়স তখন বারো থেকে চৌদ্দ। গ্রামের বেয়াড়া গোছের বাল্য জীবন। রাখালদের সাথে মাঠে খেলতাম। মা বলতেন, তুই কি রাখাল হবি? বড় হয়ে রাখাল আমি হয়েছি ঠিকই, ছাত্র-ছাত্রী চরাণোর রাখাল। সে-সাথে আমি মানুষ, মানুষের জীবন ও প্রকৃতি এবং এই সমাজকে দু-চোখ ভরে দেখি; এটা আমার রাখালিয়া পর্যবেক্ষণ। বলা যায়, পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা। আব্বার চোখ ফাঁকি দিয়ে রাতে রাতে ধুয়ো-জারি গান শুনতে যেতাম। এক বয়াতি গাইলেন, 'তুমি এ কথা পেলে কোথায়, হলুদ খেলেই রাঙা ছেলে হয়'? কথাটাতে আজো আমার কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। আমি এটা অসম্ভব বলেই জানি। অথচ এদেশের প্রতিটা কাজে আমরা তাই দেখি। মানুষের মতো মানুষ গড়বো না, আবার ত্রুটিযুক্ত, বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ দিয়ে দেশ ও সমাজ চালাবো। তাই যদি হয় দেশটা ভালোভাবে, ভালোপথে চলবে কীভাবে? কথাটা বলছি এই কারণে যে, নির্বাচন একটা হওয়ানো মানেই দেশ গণতন্ত্রে ভরপুর হয়ে যাওয়া নয়। গণতন্ত্রের নতুন সংজ্ঞা দেওয়া এখন এই নব্য-কৌশলী যুগে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। সারা দুনিয়ায় একই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ যুতসই নাও হতে পারে। পদ্ধতি গড়ে তোলা উচিত একটা দেশের মানুষের মানসিকতা, জননেতাদের মানসিক অবনতি, জন-শিক্ষার অবস্থা, দেশীয় মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, মননশীলতা ইত্যাদি বিবেচনা করে। আমাদের এ গণতন্ত্রে জনসাধারণ উপেক্ষিত। বিদ্যমান সব দলের ক্ষেত্রেই একই কথা খাটে। রাজনৈতিক জবাবদিহির যে তকমা আমরা চলমান গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কাছ থেকে পেতে চাই, এ পদ্ধতি তা দিতে পারে না। সেজন্য এ চলমান পদ্ধতি বাস্তবানুগ নয়। তাই ব্যর্থ হতে বাধ্য; হয়েছেও তাই।

আমি সমাজকে সব সময় অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে দেখতে চাই। যে দিকে তাকায় 'জোর যার মুল্লুক তার' ভাব। পেশিশক্তিধারীদের দৌরাত্ম্য, চোরের মা-র বড়ো গলা, ডাহা মিথ্যাবাদির জয়-জয়াকার; সমাজে যারা ধোপদুরস্ত কাপড় পরে চলাফেরা করে, তাদের অনেকেরই মুখের কথার কোনো মূল্য নেই, অন্তরটা কর্দমাক্ত, মনুষ্যত্বেরও বড় অভাব। এমন কি কোথাও স্বাক্ষর করে কোনো কথাকে স্বীকার করে নিলেও অল্প সময় অতিক্রমণে বিভিন্ন অজুহাতে ভোল পালটে তা অস্বীকার করে। বিবেকের কোনো দংশন না থাকলে এমনটিই হয়। আবার বিবেকের দংশন না থাকলে তাদের মানুষও বলা যায় না। পশুত্ব প্রাধান্য পায়। বর্তমান সমাজের দিকে কেউ যদি নির্মোহ হয়ে তাকায়, আমরা কি দেখবো? মিথ্যা বলা বা প্রচার করার কোনো সীমা-

পরিসীমা নেই। বিবেক ও লজ্জার বালাই নেই। প্রতারণার প্রকাশ্য দাপট বাঁধ ভেঙে সমস্ত সত্যকে মিথ্যার প্রবল স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এগুলো নিয়ে আমরা ভাবছি না; ভাবছি রাজনীতি নিয়ে, রাজনীতিকে মুখের কথায় ভালো করার সস্তা দাওয়াই নিয়ে। যদিও লালন গেয়েছেন, 'পাবে সামান্যে কি তার দেখা? বেদে নাই যার রুপরেখা ও রে...'। দুর্নীতি করে তিন বার কান-কাটা লোক রাস্তার মাঝ বরাবর বুক ফুলিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। মনে হয়, সে যেন বড় একটা কৃতিত্বের কাজ করেছে। সাধারণ মানুষকে নির্বোধ ভাবে। অথচ সে নিজেই বড় নির্বোধ। অগণিত সোস্যাল টাউটরা রাজনীতিতে ঢুকেছে। পুরো সমাজটাই চলে গেছে মুখোশধারীদের দখলে। তাই রাজনীতি পচে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। রাজনীতিক ও তাদের দোসররা কথা বলে মৌসুমী ভাষায়, বাতাস বুঝে, স্বার্থ উদ্ধারে, যা তাদের মনের কথা নয়। কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা মতিভ্রম ঘটে। কথার ওপর নির্ভর করা যায় না। সময় ফুরালেই সব কথা বাতাসে হারিয়ে যায়। মুখের কথা ও মনের মধ্যে পুষে রাখা গোপন উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'মুখে মধু, পেটে বিষ'। কথা সবাই দেয়, কথা অনেকেই রাখে না। সমাজে মেকির ছড়াছড়ি। মিথ্যার বেসাতি। সত্যবাদিদের বড় দুর্দিন। সত্য কথন ও সত্যের প্রতি অবিচল আস্থার দিন ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে। সমাজ থেকে সত্য প্রায়ই অপসৃত। এ নিয়ে আমরা কথায় কথায় রাজনীতিকে দোষারোপ করি। এ দোষারোপ মানায় না, সর্বাংশে সত্য নয়, হেতু আছে। আসলে সমাজ পরিচালনায় ব্যস্ত মানুষের মনুষ্যত্বের যত গুণ, সেগুলো লোপ পেয়েছে। এরা মানুষ না, মানুষ নামের ধূর্ত-প্রতারক। এরা মানুষ নামের কলঙ্ক। এদের বোধশক্তি হারিয়ে গেছে, মনুষ্যত্বের গুণ বিলীন হয়ে গেছে; যদিও ডাকছি মানুষ নামে। সমাজের মানুষগুলো যতটা পারা যায় ভালো করে মনুষ্যত্বসম্পন্ন-বোধের আদলে গড়তে পারলে, এদের রাজনীতিতে আনতে পারলে রাজনীতি আবার ভালো হয়ে যাবে। সমাজে আবার শান্তি ফিরে আসবে। রাজনীতিতে ইদানীং ভালো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের লোক আসতে চায় না, তো রাজনীতি ভালো হবে কী করে? সমাজ পরিচালনায় চরিত্রবান লোকের পদচারণা নেই বললেই চলে।

আমরা ময়লা-আবর্জনা থেকে সুগন্ধির ঘ্রাণ আশা করি। এটা অবাস্তব। সুগন্ধিযুক্ত ঘ্রাণ পেতে গেলে এদেশে গুণসম্পন্ন ফুলের চাষ শুরু করতে হবে। এছাড়া ভিন্ন কোনো পথ আমার জানা নাই। এই ভালো বানানোর প্রথম প্রক্রিয়া হচ্ছে মনুষ্যত্ববোধ-সঞ্চারক শিক্ষা। এছাড়া 'রাজনীতি ও প্রশাসনিক কন্ট্রোল সিস্টেম' এবং প্রতিটা পর্যায়ে 'ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রোল সিস্টেম' চালু করা। কন্ট্রোল সিস্টেম ছাড়া জাহাজকে নির্বিঘ্নে বাঞ্ছিত ঘাটে ভেড়ানো কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। বর্তমান উন্নত টেকনোলজির যুগে মানুষ যখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চষে বেড়াচ্ছে, সুষ্ঠু কন্ট্রোলিং

সিস্টেম তৈরি ও এর বাস্তবায়ন কঠিন কিছু নয়। অথচ এতে আমাদের বড়ই আপত্তি। ইচ্ছে থাকলে সবকিছুই সম্ভব। এখনই শুরু না করলে পরিণতি আরো খারাপ হবে। আমাদের ব্যামো হচ্ছে রোগীকে রোগের প্রেসক্রিপশন করতে দিই। এতে রোগীর বেঁচে থাকা দায় হয়ে পড়ে। ডাক্তারকে রোগীরা ভয় পায়। এজন্য বিভিন্ন অজুহাতে, রোগীর পরামর্শে ডাক্তারকে দূরে রাখি। পেশাব দিয়ে বেশি করে ধুয়ে-মুছে জায়গাকে পূতঃপবিত্র করতে বদ্ধপরিকর হই। সবকিছুই অরোণ্যে রোদন হওয়া বৈ আর কিছু নয়।

এদেশের ঘাপটি মেরে থাকা ভিত্তিহীন ও মনুষ্যত্বহীন ভোগবাদে নিমজ্জিত জোট কোনোভাবেই মানবিক গুণ-সঞ্চারক শিক্ষা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হোক, চায় না। ন্যায়নিষ্ঠার চর্চাও তারা করে না। তারা চায়, 'খাও-দাও ফূর্তি কর, আগামীকাল বাঁচবে কি-না বলতে পারো, হেই দুনিয়াটা মস্ত বড়...'। তারা চায়, পানি ঘোলা করে দেশ ও মানুষ শোষণের পরিবেশ তৈরি করতে। তারা চায়, দেশীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ ঝেটিয়ে বিদায় করে দিয়ে পরদেশী সংস্কৃতি ও মতবাদ এদেশে চালু করতে; নিজেদের অস্তিত্বকে বিসর্জন দিতে; এদেশকে ভিনদেশি গোলামে পরিণত করতে। এদেশ ওদের খপ্পরে পড়ে গেছে। এখান থেকে বেরিয়ে আসা অতটা সহজ নয়। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বিশ্বব্যাপী থিও-পলিটিক্যাল কনফ্লিক্ট। এদেশের রাজনীতি এই থিও-পলিটিক্যাল কনফ্লিক্টের হাতের পুতুল। তাই দলমত নির্বিশেষে সাধারণ সুশিক্ষিত দেশ-সচেতন মানুষকে জেগে উঠতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। তবে আমরা রোগীকে প্রেসক্রিপশনের দায়িত্ব কোনোভাবেই দেব না, এটাই হবে আমাদের প্রতিজ্ঞা। প্রয়োজনীয় আইনের সংশোধন করতে হবে। প্রয়োজনে জনগণের রায়ে সংবিধানও সংশোধন করা লাগতে পারে। জীবন বাঁচাতে প্রয়োজনে কোনো না কোনো অঙ্গচ্ছেদনও করতে হতে পারে।

আমরা প্রথম চেয়েছিলাম ব্রিটিশ শোষণ থেকে দেশ বাঁচাতে। তারপর চেয়েছিলাম পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে, তাদের গোঁয়ার্তুমি কর্মকাণ্ডের কারণে তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল। স্বাধীনতার উদ্দেশ্য আমরা ভুলতে বসেছি। আমরা খুব আত্মবিস্মৃত জাতি। এখন 'বাঘের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভুত বলে পেলাম কাছে' অবস্থা। এখন আমরাই আমাদের শোষক। মাঝখান থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে গণতন্ত্র, সাম্য, মানবিক মর্যাদা, ন্যায়বিচার ও আত্ম-অহংবোধ। পরিশেষে পেলাম 'মানব-আপদ' নামে বৃহৎ জনগোষ্ঠী, যদিও এদের 'মানব-সম্পদ' হবার কথা ছিল। এখন সম্বল আমাদের পাশের গ্রামের পাগলা রহমের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে পথে পথে গান গেয়ে বেড়ানো সেই গানের উক্তি, 'আমি

যা চেলাম তা পেলাম কই, তুমি ক্যানো মজালে সই বাজারে এনে' । এসবকিছুর জন্য অপরিণামদর্শী ও সুযোগসন্ধানী বিকৃতমনা-মতলববাজ রাজনীতিকরাই দায়ী । যে দলই নিজেকে ধোয়া তুলসীপাতা ভাবুক না কেন, এ দায় কোনো রাজনৈতিক দলই এড়িয়ে যেতে পারে না। আমরা এখন আর সামষ্টিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো কাজে আনন্দ পাই না; সামষ্টিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যেও কৌশলে ব্যক্তিস্বার্থ বা গোষ্ঠীস্বার্থের পরিবেশ তৈরিতে মত্ত হয়ে পড়ি। সব কৌশল 'ওপেন-সিক্রেট' হয়ে গেছে। এসব আমাদের নব্য সমাজদর্শন। আমরা মানি আর না মানি কঠিন বাস্তবতাকে তো কেউ অস্বীকার করতে পারি না। তাও কেউ কেউ অমূলক তর্ক শুরু করে দেয়। জীবনসায়াহ্নে এসে এখন এটাই বড় চিন্তা। আমাদের সন্তান-সন্ততিরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে! কোথা থেকে তারা সুশিক্ষা পাবে! মানুষের মতো মানুষ হবে! ফিলিস্তিন ও রহিঙ্গাদের বাস্তব অবস্থা দেখলে ভয়ে প্রাণটা ধপ করে কেঁপে ওঠে।

এদেশের রাজনীতি নিয়ে আমার এক পরলোকগত জ্ঞানজ্যেষ্ঠ সহকর্মী অধ্যাপক ড. এম. এইচ. রহমান (মার্কেটিং বিভাগ, ঢা.বি.) একটা গল্প বলেছিলেন, সেটা আজ বড্ড মনে পড়ছে। একদিন সকালে সদ্য বিবাহিত এক মেয়ে স্বামীর সাথে রাত কাটিয়ে ঘুম থেকে উঠেই হাসি হাসি মুখে মাকে বলছে, 'মা, তোমাদের নতুন জামাই আজ রাইতে কইছে, আমাদের সংসারে দুঃখ-কষ্ট আর কিছুই থাকবো না। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সবই সে সমাধান কইরা দেবে' । নতুন জামাইয়ের দেওয়া কথাটা বলতে পেরে মেয়ে খুব উৎফুল্ল। মাকে উত্তরে কিছু না বলতে দেখে মেয়ে বললো,'মা তুমি কি চাওনা আমাদের সংসার সচ্ছল হয়ে উঠুক'? মা এবার মুখ খুললেন। বললেন, 'হ্যাঁ মা, জামাই কি তোকে পেরথম রাইতে কথা দিছিল, নাকি শেষ রাইতে কথা দিছিল'? মেয়ে বললো, কেন মা'? মা বললেন,'তোর বাবাও আমারে পেরথম রাইতে অনেক কথা দিছিল। পেরথম রাইতে সবাই কথা দেয়, শেষ রাইতে কেউ কথা দেয় না। সকাল হইলে হগলেই ভুইলা যায়'। আমাদের রাজনীতিকদের অবস্থাও তাই। কর্ম উদ্ধারের জন্য সবাই 'পেরথম রাইতে' অনেক কথা দেয়। সকাল হতে না হতেই মুখসর্বস্ব কথা ভুলে গিয়ে নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় মশগুল হয়ে পড়ে।

(প্রকাশ: ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

‘পিপীলিকার পাখা গজায় মরিবার তরে’

প্রবাদবাক্যটির উৎপত্তি আমার জানা নেই। তবে অনেক বছর ধরে সমাজ-সংসারে আমি প্রবাদটি ব্যবহার হতে দেখি; আমার লেখায়ও মাঝে-মধ্যে প্রবাদটি ব্যবহার করি। প্রবাদটি মনে পড়াতে প্রাসঙ্গিক অনেক বিষয় ও বাস্তব ঘটনা মনের কোণে উঁকী দিচ্ছে। সবগুলো লিখতে না পারলেও কয়েকটা ঘটনা এখানে উল্লেখ সম্ভব। আমি ছোট ছোট বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই চলার পথে ব্যবহার করতে চাই। সবগুলোই আমাদের দেশ ও সমাজ নিয়ে। চারদিকের ঘটনা বলে দেয় আমাদের পরিণাম কোন দিকে যাচ্ছে। আমরা ধ্বংসের পথ বেছে নিচ্ছি, না উন্নতির পথে যাচ্ছি? এদেশের পরিণতি ধ্বংসোম্মুখ হওয়া মানে সাধারণ মানুষের চিন্তাধারা নষ্ট হওয়া নয়; ওপর থেকে নীচে যারাই সমাজের যে স্তরে বা কাজে ক্ষমতাধর পরিচালক, তাদের বৃহদংশের চিন্তাধারা নষ্ট হওয়া। মানবজাতির উন্নতি বা ধ্বংস তার চিন্তাধারার উন্নতি-অবনতির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। দেশ ও সমাজ-পরিচালকদের চিন্তা-ভাবনার গন্ডি যত সঙ্কুচিত, বিকৃত ও নিম্নমানের হবে, দেশ তত অধঃপাতে ও রসাতলে যাবে, এটাই প্রকৃতির নিয়ম। মানুষের মগজে আগে বিকৃত কুটিল চিন্তা-ভাবনা গজায়, মনুষ্যত্বের বিচ্যুতি ঘটে; তারপর তা কাজে প্রকাশ পায় এবং কাজগুলো সামষ্টিক বা আত্ম-ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করে। আমরা মুখের জোরে, মিডিয়ার বদৌলতে কখনো ডাহা মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হই। সামাজিক মিডিয়ার তো কোনো নিয়ন্ত্রণ ও দায়দায়িত্ব নেই। যার মনে যা চায় তা-ই বলে ও লেখে। কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা সমাজ-সচেতন লোক তা বিচার-বিবেচনা করে বুঝতে পারে। কিন্তু সাধারণ ‘হুজুগে বাঙালি’র কি দশা হয়? ভুক্তভোগী সব মিথ্যার জবাবও দিতে পারে না, দেওয়াটা বাস্তবানুগও নয়। তা-ই উন্নয়নপ্রয়াসী লোকগুলোর ভালো কাজ, সমাজ-উন্নয়ন করার ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও অনেককে পিছিয়ে আসতে হয়। বর্তমান পরিবেশ ভালো কাজের অনুকূল ভাবনা-চিন্তা ও কর্ম মেনে নেয় না। ভালো কাজ করতে গেলে কায়েমী স্বার্থবাদী লোকগুলোর স্বার্থে আঘাত লাগে। তারা খুব ধুরন্ধর। তাদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করা অতটা সহজ নয়। তাদের শিকড় সমাজের অনেক গভীরে প্রথিত। তাদের হারানো স্বার্থের কথা ভেবে ডাহা মিথ্যা প্রচার করে উন্নয়নপ্রয়াসী লোকদের পিছু লাগে, শেষে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। সমাজের রক্তচোষা লোক তাদেরকে সমর্থন করে। বাকিরা নির্বিকার হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। উন্নয়নপ্রয়াসীরা সম্মান বাঁচাতে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যেতে বাধ্য হয়। এটাই বিদ্যমান পরিবেশ।

অনেক আগের একটা ঘটনা বলি। ঘরে ফেরার জন্য কয়েকমাস পর দূরগামী বাস থেকে কেবল নামলাম। দূর থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে আমার এক নাতি সামনে এসে একটা সালাম দিলো। বললো, 'নানা, আমাদের স্কুল থেকে এবার এসএসসি পরীক্ষায় আরো বারো জনসহ আমি ফেল করেছি।' সন্ধ্যার পর ভাগ্নি ও জামাইকে নাতিসহ ডাকলাম। নাতিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোদের স্কুল থেকে পাশ করেছে কতজন?' বললো,'তা প্রায় সত্তর-আশি জন হবে।' বললাম, 'ওদের নামগুলো তোর চোখে পড়লো না কেন? শুধু ফেল-করা ছাত্রদের নামগুলো তোর মুখস্ত হলো কি করে? সে যে একা ফেল করেনি এটাই সে যুক্তি দেখিয়ে আমাকে প্রথমেই বোঝাতে চাচ্ছিল, একটা আত্মতৃপ্তিও খুঁজছিল। কত 'সুন্দর' বুদ্ধি! আমাদের বোঝা দরকার, দেশ ও সমাজ-পরিচালকদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির পতন হয়েছে কী না? এরাই যত অধঃপতনের মূল।

দীর্ঘ বছর ধরে এদেশ দুর্নীতিতে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন, কখনো রানার্স-আপ হয়ে আসছে। উন্নতির কোনো চেষ্টা নেই। কোনো ভাবনাও নেই। যেহেতু পদে মধু আছে, ভাবনাটা পদ আঁকড়িয়ে থাকা বা পদে যাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোন বছর দুর্নীতিতে কয়টা দেশের উপরে অবস্থান সেটাই বড় মুখ করে প্রচারে ব্যস্ত। শত দেশের নাম তো ওপরে আছে। সেদিকে দৃষ্টি পড়ে না। ঠিক আমার নাতির দশা। একটা নামের ওপর-নীচ তো স্যাম্পলিং এরোরের কারণেও হতে পারে। আমরা সাধু হতে চাই না, সাধু সাজতে চাই। এটা আমাদের মজ্জাগত ব্যামো। ব্যামো বলছি এই কারণে যে, নির্বাচন যেমন- তেমন, অবৈধ টাকার পূর্ণমাত্রায় শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। পদ-পদবি, প্রার্থিতা বাজার দরে কেনা-বেচা চলতে দেখলাম। বেড়ায় ক্ষেত খেলে ফসল টেকে কীভাবে? এদেশ তো সব সম্ভবের দেশ। প্রতিষ্ঠিত সত্য হচ্ছে: 'তুমি আমার কর্মকে সাপোর্ট করো না, মানে তুমি খারাপ লোক।' এটা আমাদের ভালো-মন্দ বিচারের অপ্রকাশিত মানদন্ড। সমাজের প্রতিটা পর্যায়ে গিয়ে একই মানদন্ড পাচ্ছি।

দ্বিতীয় ঘটনাটা এরকম, গত করোনার সময়ের কথা: আমার এক সহকর্মীর বলা গল্প। তার ভাগ্নে একসময় ভালো ছাত্র ছিল। এসএসসি পাশের পর বখে যায়। এইচএসসি-তে কোনোরকম পাশ করে। রাজধানীর যেনতেন এক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ প্রোগ্রামে ভর্তি হয়। প্রায় বিষয়ে ফেল। কিছু কিছু বিষয়ে নামমাত্র পাশ। গড়ে ফেল। চার বছরের প্রোগ্রাম, পাঁচ বছর কেটে গেছে, পাশ আর হয় না। মহাবিপদ। দেশে করোনা এলো। দূরশিক্ষণের মাধ্যমে ফাঁকিবাজি লেখাপড়া ও পরীক্ষা শুরু হলো। এক পরিচিত ভালো ছাত্রকে টাকার বিনিময়ে

নিয়ে এসে অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করিয়ে জমা দেওয়া ও তাকে দিয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরীক্ষাগুলোর খাতা লিখিয়ে এক বছরে কয়েকটা বিষয়ে ভালো নম্বর অর্জিত হলো। সর্বোচ্চ সিজিপিএ ৪ এর মধ্যে প্রায় ফেল ২.১৫ সিজিপিএ পেয়ে পরীক্ষায় পাশ করেছে। ভাগ্নে আনন্দে মামার বাড়িতে মিষ্টির প্যাকেট হাতে হাজির। সে যে কী আনন্দ! শিক্ষার রাজ্যে ঠন-ঠনাঠন, দামি কাগজে বাহারি সার্টিফিকেট। টিকে থাকাটাই ফলাও করে বলা। আমার প্রশ্ন, ভাগ্নেরত্নের এসএসসি পাশের পর পাখা গজিয়েছিল কেন? ছয়টা বছর তো জীবন থেকে চলে গেল, তার অর্জন কতটুকু? বাকি জীবনটা কীভাবে কাটবে? 'লস অব অপরচুনিটি' কত? আমাদের সুজলা-সুফলা সম্পদে ভরপুর দেশ, মরুময় কোনো দেশ নয়। এদেশের উন্নতি করা আদৌ কঠিন কিছু নয়। বেড়ার ক্ষেত খাওয়া বন্ধ করতে হবে। আমরা শুধু সামান্য অর্জনটুকু বিবেচনা করি, 'হারানো সুযোগ' কখনো বিবেচনায় আনিনে। তাই পিছে পড়ে থাকি। যে সুযোগ হারিয়েছি, তারও হিসাব করা যায়। আমাদের দশা হচ্ছে, 'একটুখানি খ্যাতি হলে খ্যাতির ভারে ন্যূয়ে, চলার পথে পিছলে পড়ি, ঠেকাই মাথা ভুঁইয়ে'।

আমার এটা বিশ্বাস যে, এদেশের 'মহান' রাজনীতিকরা দেশের জনগোষ্ঠীকে যেভাবে মোটাদাগে তিনভাগে বিভক্ত করে ফেলেছেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এমন বিভক্তি থাকলে দেশ কতদিনে স্বাধীন হতো তার প্রশ্ন থেকে যায়। দেশটা তো তখন ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সামষ্ঠিক স্বার্থ আদায়ে একজোট ছিল। সামষ্টিক স্বার্থ দেখার লোকের সংখ্যা যত কমবে, দেশ তত রসাতলে যাবে। সমাজটা তো এখন সামষ্টিক স্বার্থ বিবেচনার দিকে নেই, আছে ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধারের ধান্দায়। রাজনীতিকদের এই ক্ষুদ্র স্বার্থ-চিন্তা জনপদের প্রতিটা স্তরে ছড়িয়ে গেছে এবং তারা সমাজের প্রতিটা কাজে তা চর্চা করে চলেছে। ব্যক্তি বেশি শক্তিধর হতে পারছে না বলে সমরঙা পাখাওয়ালা পাখিগুলো একসাথে জড়ো হয়ে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী গড়ে তুলছে। সংখ্যায় এরা কম হলেও সমাজে এদের দাপট, ক্ষমতাও বেশি, সমাজ এদের করতলগত। উদ্দেশ্য একটাই– স্বার্থোদ্ধার। কেউ মাথা তুলে এদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলেই যত বিপত্তি। সামাজিক মিড়িয়ার মাধ্যমে মুখে মধু ঢেলে, ডাহা মিথ্যা অপপ্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। সামষ্টিক স্বার্থ বিবেচনার চর্চা না থাকলে, ধরো-মারো-খাও নীতি হলে, অবনতি ছাড়া উন্নতিই-বা হবে কীভাবে? সাধারণ মানুষের স্বার্থ ও ভালো-মন্দ দেখার লোক কোথায়? অথচ 'শিক্ষা-সেবা পরিষদ'-এর একজন কর্মী হিসেবে শিক্ষা ও সেবার উন্নতি নিয়ে এদেশের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে যে বাস্তব

অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করছি, তা এদেশের উন্নতির জন্য আদৌ সুখকর নয়। এই সত্যটা বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই। সমাজসেবা করার লোকের বড্ড অভাব। মানব সেবার কীর্তন গাইতে গাইতে যারা এগিয়ে আসছেন, তাদের অধিকাংশেরই কথার সাথে ভেতরের উদ্দেশ্যের কোনো মিল নেই। পত্রিকা ছাড়া কষ্টের কথা বলবো কোথায়?

চলতি এসব বিষয় নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের প্রচুর গবেষণার রসদ রয়ে গেছে। সামাজিক গবেষণা ও তার প্রকাশও এদেশে অপ্রতুল। সমাজ ও মানুষের গতি কোন দিকে ও এর পরিণতি কি, তা গবেষণায় বের করে নিয়ে আসা সম্ভব। আমি মাস্টারি করি ও দুচোখ দিয়ে অভিজ্ঞতার আলোকে পর্যক্ষেণ করি বলেই লিখি। এ পথহারা দেশ ও সমাজকে গড়তে গেলে এসব বিষয় নিয়েই বেশি ভাবা দরকার, লেখা দরকার, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। অথচ বিষয়গুলো নিয়ে আমরা নির্বাক। আমরা করণীয় দূরে ফেলে পরচর্চার যুদ্ধে নেমেছি। বাস্তবে আমরা উন্নতির ভাবনা এড়িয়ে যায়। দেশ স্বাধীন হয়েছে বায়ান্ন বছর পেরিয়ে গেছে। আমাদের অর্জন কত? এতটা বছরে সরকারি প্রতিটা সেক্টরে 'রেট অব রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট' কত? ক্ষমতাধররা কতটা দুর্নীতিবাজ হয়েছে? 'সিস্টেম লস' কত? হিসাব কষে কে দেখছে! আমরা তো সবাই আত্ম-বিজ্ঞাপনের দিকে মনোযোগী। শুধু বিজ্ঞাপনে কি কাজ হয়? বিশ্বের এমন কোনো ব্রান্ডেড কোম্পানি কি কেউ দেখেছেন, কোয়ালিটির সাথে আপস করে ব্রান্ডেড কোম্পানি হতে পেরেছে? আমরা শুধু অতি ক্ষুদ্র অর্জনটুকুই (ভাগ্নে-তত্ত্বের মতো) ফলাও করে সামনে আনবো কেন? আমাদের এ পর্যন্ত 'লস অব অপরচ্যুনিটি' কত? আধুনিক এই টেকনোলজির যুগে আমরা কি এক্সট্রাপোলেশনের মাধ্যমে আগামকে (আমাদের পরিণতি কী) মোটামুটি জানতে পারিনে? এ বিষয়ে যারা উন্নতির পথে দ্রুতবেগে ধেয়ে চলেছে, তাদের দেশের সাথে এদেশকে তুলনা করতে পারি। তা করিনে। আমরা বিশ্বে অধঃপতিত, অতি অনুন্নত দেশের সাথে আপন দোষে তুলনীয় হচ্ছি, সে কাতারে পড়ে যাচ্ছি। আমাদের এহেন ভাগ্নেরত্নের দশা কেন? আমাদের পাশেও তো একটা দেশ আছে। তারা জীবনমানের অনেক দিক দিয়েই পিছিয়ে, জানি। তারা তো ঋণ করে ঘি খায় না! তারা তো আর্থিকভাবে দেউলে হওয়ার পথে নেই? সেখানে তো প্রকাশ্যে রাজনীতি কেনা-বেচা হয় না! আমাদের এ ভগ্নদশা কেন? গলদটা কোথায়? তাদের জনগোষ্ঠীকে আইটি বিশেষজ্ঞ ও সুশিক্ষিত বানিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছেড়ে দিচ্ছে। অর্জিত জ্ঞান দিয়ে বিশ্বকে দখলে নিচ্ছে। আমরা তো রাজনৈতিক কূটচাল বিশেষজ্ঞ হচ্ছি। এদেশের জনগোষ্ঠীকে টেকনোলজি ও মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষায় শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ করে,

মানবসম্পদ বানিয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে কি আমরা পারতাম না? আমাদের সে চিন্তা-ভাবনা করার লোক কোথায়? তাদের 'ভাগ্নে-কৌশলী রোগে' ধরেছে। প্রকৃত পারঙ্গম ও সুশিক্ষিত লোকের গৌরচন্দ্রিকা দেওয়ার ও তোষামোদি করার গুণ নেই। তাই তারা বর্তমান সমাজে উপেক্ষিত।

তৃতীয় ঘটনাটা হলো: 'ও মুর্শিদ পথ দেখাইয়া দাও' শিরোনামে গত ১৬/২/২৪ তারিখের লেখায় সমাজসেবা করার উদাহরণ দিতে গিয়ে ঢাকার অদূরে গাবতলীর পশ্চিম দিকে 'মধুর স্বাদে ভরা' একটা হাউজিং প্রকল্পের কথা লিখেছিলাম। সেখানেও আমার অভিজ্ঞতা উপরে আলোচিত অভিজ্ঞতার সাথে হুবহু মিলে যায়। সমাজটা পরীক্ষিত দুর্নীতিবাজ, মিথ্যাবাদী, কুটিল বুদ্ধিতে মাথাভরা, 'বর্ণচোরা মধুচোর', সাধারণ মানুষের অনেকেই ভাওতাবাজদের দখলে। মধুচোরেরা মহামানব সাজে, বিবেকের কোনো দংশন নেই, স্বার্থের জন্য যে কোনো প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারে এমন ছদ্মবেশী সোস্যাল টাউটে প্রজেক্টটা ভরা। তাদের আবার গুরুও আছে। সাধারণ মানুষ এদের চিনতে ভুল করে। সেখানে আমার মতো মাস্টারসাহেবের মূল্য কোথায়? আমি না পারছি সাধারণ নিরীহ মানুষদের, যারা আমাকে অনুরোধ করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাদের ছেড়ে আসতে, না পারছি উপযুক্ত কন্ট্রোলিং সিস্টেম চালু করে তাদের মুক্তির পথ করে দিয়ে ফিরে আসতে। আমাদের সমাজসেবার চিন্তা শিকেয় উঠেছে। ভাবছি, প্রয়োজনে এ পত্রিকার মাধ্যমেই সরকারের সহযোগিতা চাইবো। এদেশের সাধারণ মানুষ তো অসহায়। লালনের সেই গানটা বার বার গাইতে চাই, 'আশা সিন্ধু তীরে বসে আছি সদায়, আশা...'।

(প্রকাশ: ৫ মার্চ ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

‘আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে’

কোনো এক ছায়াছবির একটা গান ছিল এমন: ‘চোখের নজর এমনি কইরা একদিন ক্ষইয়া যাবে, জোয়ার-ভাটায় পইড়া দুই চোখ নদী হইয়া যাবে-এ, পোড়া চোখে যা দেখিলাম তাই রইয়া যাবে, হো-ও-ও’। আমার কৈশোরের শেষে এসে আগুনঝরা মার্চ, স্বাধীনতার ঘোষণা ও অর্জন সবটুকুই গভীরভাবে দেখেছি। সবকিছুই দুচোখ দিয়েই দেখছি। স্বাধীনতা এখন রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন হিসেবেও ব্যবহৃত হতে দেখছি। মাঝখানে দীর্ঘ ৫৩ টি বছর জীবন থেকে পেরিয়ে গেছে। আমার কর্মময় জীবনের পুরোটাই নদীর ঢেউয়ের উত্থান-পতনের মতো দেশের উন্নতি-অবনতির ঢেউ সচোক্ষে গুনছি। রাজনীতিকদের কাজকর্মের ভালো-মন্দ পর্যবেক্ষণ করছি। সবার ভালো-খারাপ আমলনামা (কর্ম-বিবরণী) চোখে চোখে ভাসছে। সত্যটা হলো, এদেশের মানুষ স্বাধীনতা শব্দটাকে বিজ্ঞাপন হিসাবে ব্যবহারের জন্য যুদ্ধ করেনি। এমনকি যুদ্ধ করে যে সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে, সে আশায়ও যুদ্ধ করেনি। এ ধরনের ভাবনা তখন কারো মাথায় স্বপ্নেও আসেনি। পরবর্তী সময়ে আমার জানা অনেকেই সার্টিফিকেটও কোনোদিন নেননি। তাদের অহংকার ছিল– আমরা সার্টিফিকেটের জন্য মুক্তিযুদ্ধ করিনি; আমরা দেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেছিলাম। এদের অনেকে কথায় কথায় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত উদ্দেশ্যের কথাও তুলে ধরতেন। তাদের অনেকেই গত হয়েছেন। কিন্তু অর্জিত এই স্বাধীনতার মর্যাদাকে ব্যবহার করে কেউ রাজনীতির ব্যবসা ফেঁদে বসবে, এটা কোনোদিনই কেউ চাননি। দেশের স্বাধীনতা নিয়ে কোনো অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃশক্তির কারো কাছে আত্মমর্যাদা ও স্বাধিকার জলাঞ্জলি দিয়ে নতজানু হয়ে অন্যায় সহ্য করে বেঁচে থাকা যে কত কঠিন, তা প্রতিটা দেশপ্রেমী ব্যক্তি ভালো করে বোঝেন, এমনকি হৃদয় দিয়ে অনুভবও করেন। দলমত নির্বিশেষে এটা প্রতিটা দেশপ্রেমী লোকের মধ্যেই দেখে আসছি। তা এদেশের রাজনীতিকরা স্বার্থান্বেষী হয়ে খেয়ালখুশির বশে যে যাকে খুশি যতই কাদা ছোড়াছুড়ি ও ধোয়া-মোছা করুক না কেন। এটা অনস্বীকার্য যে, যত নোংরামি, রাজনীতি (নেতিবাচক অর্থে), কারো না-কারো তাবেদারি, রাজনীতি নিয়ে ব্যবসা, ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থ, মিথ্যা বচন প্রভৃতি সবই শুরু হয়েছে যুদ্ধে বিজয় অর্জন করার পর, যা এখনো অব্যাহত। নির্ভেজাল সত্য এই, এদেশের সকল অব্যবস্থা, দুর্নীতি, একদেশদর্শিতা, আশাহতের বেদনা ইত্যাদি ঘটে চলেছে রাজনীতির ছত্রছায়ায়। এত কথা দিয়ে গৌরচন্দ্রিকা দিচ্ছি মাসের নাম মার্চ বলে।

আমার সাথে রাজনীতিকদের একটাই বিরোধ, তাদের গঠনতন্ত্রে লেখা বক্তব্যের সাথে কাজ ও চিন্তার কোনো মিল নেই, তাই। তাদের চিন্তাধারা ও কর্ম এমনকি

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের সাথেও মিল নেই। সে চিন্তা ও স্মরণ মাথায় না থাকলে কাজের সাথেই বা মিল হবে কী করে? সেজন্য জীবনভর কারো দলে ভিড়ে কারো শ্লোগানে অংশ নিতে পারলাম না, অথচ জীবনের জোয়ার-ভাটায় পড়ে 'দুই চোখ নদী হইয়া' গেল। 'পোড়া চোখে যা দেখিলাম' শুধু তাই-ই রয়ে গেল। নিজের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগানোর পরিবেশ পেলাম না; অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেল বহুকিছু। সমাজটা যেন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেল।

মানুষের জন্য দেশ, মানুষের জন্যই সমাজ; দেশ ও সমাজ, এমনকি দেশ চালানোর জন্য যে সিস্টেম ও আদর্শ সবই মানুষের গড়ার কথা। সেই মানুষের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য যদি প্রকৃত মানুষের মতো না হয়, দেশ গড়ার উপযুক্ত না হয়; কীভাবে দেশ টিকে থাকবে? দেশ গড়ে উঠবে কীভাবে? ভিত্তি না থাকলে কল্পনার উপর ভর করে আকাশে অট্টালিকা গড়া যায় না। একটা শিশুকে অনেক কথা বিশ্বাস করানো যায়, পূর্ণাঙ্গ কোনো মানুষকেই নয়। মানুষকে উন্নতির বুলি মুখস্ত করাতে গেলে, তার অবচেতন মনে হলেও ভিত্তিমূল সে খুঁজবেই। গানের পরবর্তী কিয়দংশ 'চোখেরি নাম আরশিনগর, একে একে মনের খবর, সে-তো কইয়া যাবে-এ, পোড়া চোখে...'। তাই যতটুকু পারা যায়, একটা পত্রিকাকে অবলম্বন করে কখনো প্রবন্ধ আকারে, কিংবা কখনো বই আকারে এই লেখালেখির অবতারণা। কোনো ব্যক্তি, কোনো গোষ্ঠী বা কোনো দেশের তাবেদারি করার জন্যও আমরা বেঁচে নেই। আমরা 'চাটার দল'-এর কোনো অংশও নই। কারো হুকুমের গোলাম হতেও চাইনে। অধিকার এটুকুই যে, 'জন্মেছি এই নদীর চরে আমি এদেশের সন্তান, শ্যামলা মাটি-মায়ের বুকে সইপাতি পরাণ, আমি এদেশের সন্তান।' বেঁচে আছি সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার সুখ-সাচ্ছন্দ্য যতটা আশা করেছিল, তার কিয়দংশও যদি এদেশের কাউকে না কাউকে, কাথাও না কোথাও সাধ্যমতো দিয়ে যেতে পারি, সেজন্য। তা সাথে কেউ থাক, বা না থাক।

কয়েক বছর আগে পাসপোর্ট অফিস দালালমুক্ত করার অভিযানের কথা পত্রিকায় পড়েছিলাম। তার কিছুদিন পর বিআরটিএ অফিসেও দালাল মুক্তির অভিযান চালাতে দেখেছিলাম। বেশ ভালো কথা। আমার জানতে ইচ্ছে করে, ঐ জায়গাগুলো এখনও দালালমুক্ত অবস্থায় আছে কি-না? দালালমুক্ত না থাকলে কেন নেই? এত শুদ্ধি অভিযানের পরও দুর্নীতিবাজ ও দালাল আসে কোত্থেকে? সমস্যাটা কোথায়? কয়েকদিন আগে ঢাকার বেইলী রোডের এক আগুনে অনেক লোকের প্রাণনাশের খবর শুনলাম। দুর্বিপাকে আমাদের কাছের একজনের অপমৃত্যুকেও সহ্য করতে হলো। পরবর্তী সময়ে অসংখ্য হোটেল-রেস্টুরেন্টের

দরজা সংশ্লিষ্ট বিভাগ তালাবদ্ধ করে দিয়েছে। বেশ ভালো খবর। সমস্ত অবৈধ হোটেল-রেস্টুরেন্ট তালাবদ্ধ হয়েছে তো? কেন অবৈধ সবগুলো তালাবদ্ধ হলো না? যতগুলো তালাবদ্ধ হলো পাইকারী হারে করা হলো, না বেছে বেছে করা হলো– এটার বিস্তারিত তো কোথাও লেখা দেখলাম না। আচ্ছা, এই যে প্রতিটা সেক্টরে অব্যবস্থা, এর তো কোনো রাখঢাক-গুড়গুড়ি নেই। পত্রিকা পড়লেই বোঝা যায় সবকিছুই অপেন-সিক্রেট হয়ে গেছে। সবকিছুতেই বড় বড় কথা বলা হয়, কাজের বেলায় ঠনঠনাঠন। এই নীতির নাম কী? এটা আবার কোন তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত? জানি, সরষের মধ্যে নাকি ভূত থাকে। তাহলে সব সরষের মধ্যেই কি ভূত আছে? থাকেই যদি, সে ভূত আমরা বিতাড়িত করি না কেন? অসুবিধা কোথায়? দেশ তলে তলে, কখনো প্রকাশ্য দিবালোকে দিনে দিনে উচ্ছন্নে যাচ্ছে, তাকিয়ে দেখতে কতক্ষণ ভালো লাগে!

কিছুক্ষণ আগে খবর পেলাম সুপ্রিমকোর্ট বার কাউন্সিলের নির্বাচনে এক দলের দু-গ্রুপের মধ্যেই মারামারি, সে এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। গতবারও তেমনটিই শুনেছিলাম। জীবনের প্রতিটা পর্যায়ে একই অবস্থা দেখছি ও শুনছি। এর মাজেজা ও হকিকত কী? দেশ নষ্ট হয়ে গেছে, সরকার নষ্ট হয়ে গেছে, না মানুষের মানসিকতা নষ্ট হয়ে গেছে? মানুষের মানসিকতা নষ্ট হয়ে গেলে তার আর থাকে কী? তাকে আর মানুষ বলা যায় কী! আমি মাস্টার মানুষ হওয়ায় অনেকের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আমার দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো নাও মিলতে পারে। আমাদের সমাজে কি বুনো আবহ বিরাজ করছে? এগুলো দেখেও আমরা না-দেখার ভান করি কেন? এতে কি প্রমাণিত হয় না যে, আমরা মোটের উপর দুর্নীতিপরায়ণ (সুনীতির অভাব) ও জিঘাংসাপ্রিয় মনোভাবে বিশ্বাসী। যারা সামাজিক এ দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে পারছেন না, বা মেনে নিতে পারছেন না, তারা এদেশে খুব মানসিক কষ্টে দিনাতিপাত করে চলেছেন, প্রতিটা পদে অপমানিত হচ্ছেন। তারা না পারছেন মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যেতে, না পারছেন আত্মহত্যা করতে। কথাগুলো খোলামেলা বলাটাও ঝুঁকিপূর্ণ। আমার এ কথায় নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দল গোসসা করলে আমার প্রতি অবিচার করা হবে। এদেশের সব দলেরই একই অবস্থা। দেশটাই তো আমরা প্রায় পচিয়ে ছেড়েছি। খেটে খাওয়া মানুষ বাদে প্রায় সবারই তো একই অবস্থা। প্রতারকের সংখ্যাধিক্য ঘটেছে। মুখের কথার কোনো মূল্য নেই। এমনকি স্বাক্ষর করেও অস্বীকার করা হয়। আমি তো সমাজের যেখানেই যাচ্ছি একই বার্তা পাচ্ছি। আমি আমার নিজের চোখ ও কানকে অস্বীকার করি কী করে? এদেশের 'ঘরে ছুঁচোর কেত্তন, বাইরে কোচার পত্তন' অবস্থা। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের সহজ কোনো পথ নেই।

আমার স্কুল জীবন শুরু হয়েছিল 'পাক ছার জমিন ছাদ বাদ' দিয়ে। অর্থটাও জানতাম না। তারপর একসময় কিছুদিন এলো 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ'। পরে যখন সবশেষে এলো 'আমার সোনার বাঙলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন...'। তখন আমি হাই-স্কুলের শেষ পর্যায়ে। আমার কণ্ঠটা বরাবরই ভালো ছিল। আমাকে এসেম্বলির সামনে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীত গাইতে হতো। জাতীয় সংগীত গাইতে গিয়ে আমার বুকের ছাতি দুই ইঞ্চি ফুলে উঠতো। সত্যি বলতে কি, এই দীর্ঘ তেপ্পান্ন বছরের ঘটনাপ্রবাহে বর্তমানে এসে কখনো কখনো জাতীয় সংগীত গাইতে হয় সত্য, কিন্তু বুকের ছাতি আর ফুলে ওঠে না। কেউ কি বলতে পারেন, কেন আর ফুলে ওঠে না? সবাই হয়তো আমাকেই দোষারোপ করবেন। এদেশের রাজনীতিকদের ভালো-মন্দ সবাইকেই মোটামুটি চিনে ফেলেছি। দেখতে দেখতে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তাদের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়েছি। আমাকে নৈরাশবাদীর দলে ফেলতে পারেন, আমি প্রতিবাদ করবো না। তেপ্পান্ন বছর তো ধৈর্য ধরার জন্য যথেষ্ঠ। আর কত!

দেশের বিভিন্ন সেক্টরে লোকদেখানো শুদ্ধি অভিযান প্রায়ই পরিচালনা করা হয়। রাজনীতিকদের মধ্যে বা প্রতিটা দলে শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করা হয় না কেন? অসুবিধা কোথায়? সম্ভবত সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখায় পড়েছিলাম, 'কুইনাইনে জ্বর সারাবে, কিন্তু কুইনাইনকে সারাবে কে?' আসলেই তো! কুইনাইনের জ্বরে ধরলে আমাদের করণীয় কী? যুগের পর যুগ কি কুইনাইন জ্বরে কাতরাতেই থাকবে? বর্তমান অবস্থায় রোগের ট্রিটমেন্ট দুটো– একটি হলো রাজনীতি হতে দুর্নীতিবাজ ও সুবিধাভোগী লোকগুলোকে ছাটাই করা, আত্মপ্রবঞ্চকদের দূরে সরিয়ে দেওয়া, যাতে রাজনীতি প্রকৃত অর্থেই দেশসেবা ও জনসেবার কাজে নিয়োজিত হয়। আমার জানা মতে, এবং এইচআরএম আমার ভালোমতো পড়া আছে বলে জানি, এদেশে এখনোও দেশসেবা ও জনসেবা করতে চায় এমন লোক অনেক আছেন। তারা এখন সমাজচ্যুত, এটা বলা যায়। অনুকূল পরিবেশ দিলে তারা দেশসেবায় নিযুক্ত হবেন। আমরা মানুষকে বিভক্ত করেছি, কে কোন দল করে– তার ভিত্তিতে। আসলে বিভক্তিটা করা প্রয়োজন, কার মধ্যে সততা, সুশিক্ষা ও ন্যায়নিষ্ঠা আছে কি নেই, এর ভিত্তিতে। আমরা লিখতে ও পড়তে পারে এমন সার্টিফিকেটধারীকে শিক্ষিত লোক বলি। আসলে বিষয়টা আদৌ তেমন নয়। যার মধ্যে জীবনমুখী শিক্ষা, মনুষ্যত্ববোধ শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষা– তিন ধরনের শিক্ষাই বিদ্যমান, তাকেই শিক্ষিত লোক বলা উচিত। অথচ আমরা এই সাধারণ সত্য থেকে যোজন দূরে সরে গেছি।

আমার এ মাস্টারি বয়ানে কারো বোধোদয় হবে বলে কি মনে হয়? আমার বিশ্বাস হয় না। 'ছুঁচোর গায়ে আতর মাখালে কি ছুঁচোর গায়ের গন্ধ কখনো যায়? মনে হয় না। জে-জের 'যে', জে-জবর 'যা', ত-ইয়া-যবর 'তাই'। 'যে যা তাই'। জীবনের শুরুতে সুশিক্ষা ও সামাজিক পরিবেশ না দিয়ে, মানুষরূপে না গড়ে অমানুষ বানালে তার জীবনটাই বৃথা এবং সে রাষ্ট্রের জন্য বোঝা হতে বাধ্য। জীবনের শেষ বিকেলে নিজের ভাবনাটা লিখে প্রকাশ করতে পারি, এদেশে এটাই আমার শান্ত্বনা। আমার বয়ান শুনে মানুষ দলে দলে ভালোমানুষে পরিণত হয়ে যাবে, এটা ভাবতে আমি দ্বিধান্বিত। অন্তত রাজনীতিকরা হবেন না, নিশ্চিত জানি। তাছাড়া, বানু মোল্লার সায়েরিটা এরকম, 'ছাগল ধরিয়া যদি বল কানে কানে, চরিতে না যেও বাবা ফলের বাগানে'। যদি সে প্রাণিটা প্রকৃত ছাগলই হয়, কারো সহি নসিহত কখনোই শুনবে না। দেশের বেশিরভাগ রাজনীতিক ও সমাজ কাউকে কুশিক্ষা দেবে আর মাস্টারসাহেবরা স্কুল-কলেজে সেই শিক্ষার্থীকে ঝুড়িভর্তি সুশিক্ষার অমিয় বাণী শুনিয়ে মানুষের মতো গড়ে তুলবে, এটা অবাস্তব চিন্তা বৈ আর কিছুই না। সেজন্য দেশে 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' দরকার; আমরা যাকে আইনের শাসন বলি। এদেশে তা কতটুকু আছে? লালনের ভাষায় বলতে হয়, 'চাঁদের গায়ে দাগ লেগেছে, আমরা ভেবে করবো কী? চাঁদের গায়ে...'।

(প্রকাশ: ১৪ মার্চ ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)।

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

অশুভ চর্বিতচর্বণ আর কতদিন প্রয়োজন হবে?

চর্বিতচর্বণ শব্দটা শুনতে খুব একটা খারাপ লাগে না, কিন্তু গ্রাম্য ভাষায় 'জাবর কাটা' শব্দটা শুনতে অনেকটা তিক্ত-বিস্বাদ শোনায়। তখন বলতে হয় 'পূর্বে আলোচিত বিষয়ের পুনরালোচনা'। এটা আমাদের অদৃষ্টের লিখন, বারবার একই কথা লিখতে হয়। 'ভাগ্য' বিষয়টা যত বয়স হচ্ছে তত বেশি মানতে বাধ্য হচ্ছি। গত নিবন্ধে লিখেছিলাম, স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পর জাতীয় সংগীত গাইতে গর্ব ও আশায় বুকটা দুই ইঞ্চি ফুলে উঠতো, এখন অনেক বছর থেকেই তা আর ওঠে না। যদিও ধানে, মানে, প্রিয়জনের টানে-ভরা এই সীমাহীন সবুজের মাঝখানে জন্মে বারবার বিরক্তিকর কোনো গানে জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবো কোন ধ্যানে! জীবনে এই দেশ ছেড়ে তো অন্য কোথাও গিয়ে বারবার ফিরে আসতে হয়। জানি না কিসের টানে এটা হয়! আবার এসে অপ্রিয় বিষয় নিয়ে কথা বলতে হয়, কারো কাছে খারাপ হতে হয়, চর্বিতচর্বণ করতে হয়। কিসের মোহে? কেন এত পুনরালোচনা? এটা কেউ বোঝে না, কেউবা বুঝেও না বোঝার ভান করে।

আমি সাধারণত কোনো তত্ত্বকথা লিখতে চাইনে; বাস্তবতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে অপ্রিয় সত্য কথা লিখি, যে লেখায় অনেকের গা জ্বালা করে। এ সংসারে কেউ না কেউ তো কারো বিরাগভাজন হবেনই। একজন মানুষ সবার কাছে ভালো হতে পারেন না। 'উচিত কথায় খালু বেজার' তো হবেনই। লালন গেয়েছেন, অমৃত মেঘের বারি মুখের কথায় কি মেলে চাতক স্বভাব না হলে'। সেই চাতক স্বভাবধারী লোকদেরকে তো সামনে এগিয়ে আসতে দেখিনে, সেজন্য দেশের ভাগ্যে 'অমৃত মেঘের বারি'ও জোটে না। তাই 'ফুয়াদের গল্প বলা'র মতো জিজ্ঞেস করতে হয় 'এই ফুড়ুৎ আর কতক্ষণ চলিবে'? 'যতক্ষণ চড়ুই পাখি আসা-যাওয়া করিবে।' তখনই প্রশ্ন জাগে, 'চড়ুই পাখি কি জীবনে আসা-যাওয়া কখনো বন্ধ করিবে'? এমন বেওয়ারিশভাবে একটা দেশ বেশিদিন চলতে পারে না। কেউ কেউ দেশটা নিজেদের সম্পত্তি বলে দাবি করে, কিন্তু কাজের বেলায় লবডঙ্কা।

আমাদের পাশের গ্রামের রহম পাগলার গল্প তো প্রায়ই বলি। সে প্রথমে খারাপ পাঁড়ায় খুব যেত। অবশেষে কেউ হয়তো কথা দিয়ে কথা না রাখায় মাথা বিগড়ে যায়। তারপর রহম আলী রহম-পাগলা নাম ধারণ করে। পথে পথে মাথা নীচু করে শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বরে এই বলে গান করে বেড়াতো, 'সখি আমার মাথা গেল ঘুরে, সখি ...'। খারাপ পাঁড়ার কেউ কেউ খারাপ হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেশ চালকদের কথার মূল্য থাকবে-না কেন? দেশচালকদের কাজ-কারবার ও স্বভাব

দেখলে আমাদের মাথা ঘুরে যায় কেন? তাহলে আমরা কি দেশচালকদের খারাপ পাঁড়ার সাথে তুলনা করবো? গত নির্বাচনে তো তাই-ই দেখলাম। বেশি টাকার লোভে বেসরকারি অনেকেই তো নীতি-নৈতিকথা ভুলে ক্ষমতাসীন দলের হাতে ধরা দিলো। টাকা কিংবা পদের লোভে বলতে থাকলো, 'সখি আমার মাথা গেলো ঘুরে'। টাকা দিয়ে অনেক দেশচালক কেনা যায়। এখনো তো বিরোধী শিবিরের অনেক 'মাথা ঘোরা' অজানা কাহিনী বেরিয়ে আসছে। পরিস্থিতি উল্টো হলে উল্টো ঘটনাও ঘটতো, নিশ্চিত জানি। এই শেষ বয়সে এসে দেখছি এদেশের প্রতিটা জনপদে, দেশব্যাপী এই অসৎ, কথা-না-রাখার দলে লোক বেশি; বিশেষ করে দেশের হর্তাকর্তারা, তাদের সাগরেদরা; অফিস-আদালতের সুযোগ্য (?) পদধারীরা দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে প্রতিনিয়ত বিক্রি হচ্ছে। দেশ নিয়ে তারা স্বার্থের গেম খেলতে বসেছে। সব কিছুই উদ্দেশ্য-বিচ্যুৎ হয়ে গেছে; দেশের স্বার্থের তুলনায় ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থই প্রাধান্য পেয়েছে। শেষমেষ এদেশের সাধারণ মানুষকে কি সেই রহম পাগলার পরিণতি ভোগ করতে হবে? রহম আলী তো পাগল ছিল না, কেউ না কেউ ঘটনা ঘটিয়ে রহম-পাগলা বানায়। দেশপরিচালকরা তো এদেশের সাধারণ মানুষের সব স্বপ্ন আকাশের নীলিমায় উধাও করে দিয়ে গোষ্ঠী-স্বার্থের ডামাডোল বাজাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেছে। দোহাররা সুযোগ বুঝে কোরাস ধরেছে। তালে তালে দিন পার হয়ে যাচ্ছে।

এবার পত্রিকার পাতা থেকে কিছু চর্বিতচর্বণ করি। 'দখলে লাইনম্যান নেতা পুলিশ মস্তান– ফুটপাথে মিলেমিশে চাঁদাবাজি' (২১.৩.'২৪)। 'বায়ুদূষণের শীর্ষে বাংলাদেশ– উৎস চিহ্নিত, প্রতিকারে নেই কার্যকর উদ্যোগ' (২১.৩.'২৪)। 'হকার থেকে কোটিপতি অনেকে– নিউমার্কেট সায়েন্সল্যাব চাঁদাবাজদের স্বর্গরাজ্য' (২১.৩.'২৪)। 'ঠেকায়ে কারও কাছে কিছু নেইনি, কাউরে উপকার করে যদি...'– এসআই ওবায়েদুর রহমান (২১.৩.'২৪)। 'জাল-জালিয়াতির প্রভাব– গ্রাহক কমছে নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে' (২০.৩.'২৪)। 'পথে বসেছে লাখো বিনিয়োগকারী' (২০.৩.'২৪)। 'ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান– বড় ঋণ জালিয়াতরা কি ইচ্ছাকৃত খেলাপি?' (১৯.৩.'২৪)। 'ভুয়া ভাউচারে অর্থ লোপাট– ফুলছড়িতে এডিপির কাজ ভাগবাঁটোয়ারা' (১৯.৩.'২৪)। 'চাঁদপুর-ফরিদগঞ্জ-রায়পুর আঞ্চলিক সড়ক– নির্মাণের ছয় মাস না পেরোতেই উঠে যাচ্ছে পিচ' (১৯.৩.'২৪)। এগুলো মাত্র তিন দিনের কয়েকটা খবর। পুরোটাই যুগান্তর থেকে চর্বিতচর্বণ। খবরগুলো দুর্নীতিতে ভরা। দেশের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। বিস্তারিত পাঠকরা নিশ্চয়ই পড়েছেন। অন্য আরো দশটা পত্রিকা ঘাটলে এই তিন দিনে

হাজারে হাজার এ ধরনের খবর পাবেন, যার নাম দিতে পারেন 'হাজার রাতের কেচ্ছা'। এ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে, দেশের পরিণতির কথা ভাবলে আপনাদের মাথা রহম-পাগল হতে বাধ্য। দেশের সাধারণ মানুষ অনন্য সাধারণ রাজনীতিক, সরকারি বিভাগগুলো ও অসৎ ব্যবসায়ীদের কাছে দেশটা যেন দীর্ঘমেয়াদের ভিত্তিতে লিজ দিয়েছে। আমাদের প্রশ্ন, মূল গলদটা কোথায়? হোমিওপ্যাথিক ওষুধে দেখেছি রোগ নির্ণয় সঠিক হলে এক ওষুধের ব্যবহারে পাওয়ার বাড়াতে বাড়াতে একসময় রোগমুক্তি ঘটে। আমরা এই তেপ্পান্ন বছরেও সঠিক ওষুধটা চিনতে পারলাম না কেন ? অথচ অনেকবার ডাক্তার বদল করলাম। তাহলে আমরা কি রোগ পুষে রাখতে চাই? না কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' ছোটগল্পের মতো রোগ দেখিয়ে কামাই-রোজগার করার জন্য রোগের মূল চিকিৎসা এড়িয়ে যায়?

'প্রাগৈতিহাসিক' ছোটগল্পে দেখেছি কোনো কোনো মানুষের স্বভাবে অন্ধকার কোনোদিনই দূর হয় না, অন্ধকার দূর করার ইচ্ছাও তাদের থাকে না– তাতে তার আয়-রোজগারে ও মানসিকতার ব্যত্যয় ঘটে। এ গল্প ছাড়াও বানু মোল্লা তার সায়েরিতে বলেছেন, 'যার যে স্বভাব দোষ না যায় কখন, হাজার কষেতে ঘোল না হয় মাখন'। আমরা যতই লুটেরা শ্রেণির স্বভাব পরিবর্তনের কথা বলি না কেন, তা প্রকৃতিগতভাবেই অসম্ভব। বরং আমরা জানি, একরঙা পাখাওয়ালা পাখিগুলো সবসময় একজায়গায় জড়ো হয়। আমরা বার বার ভিন্নরঙা বনবিড়ালের কাছে মুরগি পোষানি দিচ্ছি। একবারও অতি কষ্টে অর্জিত মুরগির ভাগ্যে কী ঘটবে তা ভাবি না। আমাদের কোষাগার খালি হয়ে যাচ্ছে। জনসাধারণের সম্পদ জনসাধারণের কাজে ব্যয়িত হচ্ছে না। বেশিরভাগ বনবিড়ালে খেয়ে যাচ্ছে। এটাই আমাদের ব্যর্থতা, যাকে আমরা 'অদৃষ্টের লিখন' বলে চালিয়ে দিই।

এত কথা লিখছি শুধু এ মাসের গুরুত্ব বেশি বলে। মাসটা স্বাধীনতা ঘোষণার মাস, গণহত্যার মাস, ৭ মার্চের মাস, এই মার্চকে ঘিরেই আমাদের সব স্বপ্ন, জীবনের চাওয়া-পাওয়া। এই তেপ্পান্ন বছরে আমাদের এ দশায় ধরলো কেন? যাদের উপর দেশ ও সমাজের উন্নতি নির্ভরশীল, সেসব মানুষের মনুষ্যত্ব, বিবেকবোধ, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, মূল্যবোধ, মানবসেবা, দেশপ্রেম হারিয়ে গেল কেন? কারো কি বিশ্বাস হয়, এ গুণগুলো তাদের মধ্যে আবারও ফিরে আসবে? ব্যতিক্রম বাদে সবাই আত্মসেবা ও গোষ্ঠীসেবায় মত্ত। জানি রোজার মাস চলছে। গোপনে রান্নাঘরে ঢুকে দিনের বেলায় অনেকেই খাবার খেয়েও রোজা রেখেছি বলতে পারে, যদিও তা কেউ বলে না। আল্লাহ সব কিছু দেখেন সে-ভয়ে, না কি এটা আমাদের

সংস্কৃতি, না কি ইবাদত কবুল হবে না ভেবে? সমাজে খারাপ কাজ করলে, মজুতদারি করলে, জনগণের টাকা লুটপাট করে টাকার পাহাড় গড়লে, ঘুস খেলে, মিথ্যা বললে, দেশের মানুষকে শোষণ করলে, মানুষকে ফাঁকি দিলে, চুগোলখোরি করলে, দুর্বৃত্তায়ন করলে তখন কি আল্লাহ দেখেন না? তখন ইবাদতের উদ্দেশ্য কোথায় থাকে? শুধু রোজা রাখার সময় আল্লাহর ভয় আসে কোত্থেকে? বিভিন্ন কুকর্মের ফলে ইবাদত কি আসলেই ঠিক থাকে? হারাম উপায়ে অর্জিত উপার্জনে শরীরে রক্ত তৈরি হলে, মুখের কথার কোনো মূল্য না থাকলে, কুচক্রি মনোভাব হলে সে ব্যক্তির ঐ মুখ-দিয়ে-বলা কথা ও শরীরের মাধ্যমে ইবাদত কি কখনো কবুল হয়? এসব কথা তো আমরা সবাই বুঝি ও জানি, জানা মতো কাজ করি না কেন? এত খারাপ কথা বলছি রোজা ও ইফতারের বাজারে এবং রাজনীতির বাজারে হিড়িক দেখে। আল্লাহর সাথে চালাকি করা দেখে; প্রতিদিনের পত্রিকা পড়ে।

আমাদের সমাজে আমরা অনেক কিছুই ব্যাপকহারে লৌকিকতা ও লোক-লজ্জার কারণে করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। নিজ স্বার্থের কারণে নিজের পশুসদৃশ আসল রূপকে গোপন করছি। আমরা সাধু সাজি, কিন্তু আত্মত্যাগ ও আত্ম-সংযমের সময় এলেই সাধু থাকি না, কপটতা ধরা পড়ে। আমাদের মুসলমানিত্বে নিশ্চয়ই ভেজাল আছে। আমি কোনো কোনো বিষয়ের ভালো ভালো দিক তুলে ধরে সওয়াবের ভাগিদার হতে পারি না বলে দুঃখিত। গোলেমালে হরিবোল দিতে না পারা আমার বদভ্যাস। এজন্য পাঠকদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

এই যে আমি অধিকাংশ লেখায় রাজনীতিকদের অবিরাম ধোলাই করি, বিষোদগার করি, তাদের ওপর দেশের অনুন্নতি ও লুটের দোষ চাপাই, বিষয়টা আসলে সে-রকম নয়। আমি দোষারোপ করি রাজনীতিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিকৃত পরিবর্তনকে। অধিকাংশ রাজনীতিক তাদের বাঞ্ছিত গুণাবলির বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে পারেনি, বরং পতন হয়েছে, যার কারণে দেশ ও সমাজ দীর্ঘবছর ধরে ভুগছে। দেশটা ক্রমেই রাজনীতির ব্যবসায় পরিণত হচ্ছে। ভোগান্তির পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে। তাই বিষয়টা না লিখে, প্রকাশ না করে গত্যন্তর নেই। কবি নজরুল লিখেছিলেন, ‘হেরিনু, জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ! বন্ধু ওগো, আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে! দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে’। আমরা অসহায়; কাউকে না কাউকে তো এটা বলতে হবে। রাজনীতির পদ, পদবী, প্রার্থিতা পেতে, দল বদল করতে টাকার খেলা অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। দিনে দিনে এখন মহীরুহ ধারণ করেছে,

প্রকাশ্যে চলে আসছে, অর্থাৎ রাজনৈতিক পরিবেশের ক্রমাবনতি হচ্ছে। এটা তো এদেশের সাধারণ মানুষের চোখের সামনে হচ্ছে। তবে বিভিন্ন দলের কেউ কেউ আছেন যারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী, এটা আমারও জানা। তারা তো এ অধঃপতনের স্রোত বন্ধ করতে পারছেন না। তারা হয়ে গেছেন সংখ্যালঘিষ্ঠ। এই ব্যবসায়ী রাজনীতি এমনকি তাদেরকেও গ্রাস করছে। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে না আসতে পারলে পরিণতি অনেক ভয়াবহ হবে। এ জন্যই আমার এ বিষোদগার। আমাদের পরে স্বাধীনতা অর্জন করেও বেশ কিছু দেশ তরতর করে উপরে উঠে যাচ্ছে। এটা শুধু তাদের সফল নেতা-নেতৃত্ব ও সামাজিক উন্নত বৈশিষ্ট্যের গুণে। এটা মানতেই হবে।

সময় এসেছে বিষয়গুলো মনোযোগ দিয়ে উপলব্ধি করার। শুধু দেশ ও সমষ্টিগত মানুষের স্বার্থে অসৎ, দুর্নীতিবাজ, ফেরেববাজ, ধাপ্পাবাজ, চাটুকার, লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান, লুটেরা ব্যবসায়ী, ঘুসখোরদের পরিত্যাগ করা, তা তারা যত শক্তিশালীই হোক। সৎগুণের রাজনীতিকদেরই বিষয়গুলো আমলে নিতে হবে। শুধু নেতৃত্বের সততা, দেশপ্রেম, মুল্যবোধ, আধিপত্যবাদের দোসরমুক্ত একদল রাজনীতিকই পারেন আবার নতুন উদ্যোগে দেশ গড়া শুরু করতে। এদেশে সুশিক্ষিত, জ্ঞানী, দেশ চালাতে সক্ষম যোগ্যতাসম্পন্ন অসংখ্য মানুষ চাতক পাখির মতো অপেক্ষায় আছে, যারা সাথে থাকলে বিজয় অনিবার্য। তখনই হবে মার্চ মাসের স্বপ্নের প্রকৃত বাস্তবায়ন। এক যাত্রা প্যান্ডেলে বিবেককে টানা সুরে গাইতে শুনেছিলাম, 'পথিক আপন বুঝে চলো-ও, এ-এ-এই বেলা-আ'।

(প্রকাশ: ২৭ মার্চ ২০২৪ দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

ধার্মিকতা ও কপটচারিতা— এদেশে যে কথাগুলো বলাও বিপজ্জনক

(প্রকাশিত শিরোনাম: ‘প্রকৃত ধার্মিক বলতে কী বোঝায়’)

পবিত্র রমজান মাস চলছে। প্রত্যেক মুসলিম পরিবারে এ মাসে ধার্মিকতার আধিক্য আমরা প্রতিবছর দেখি। অনেকে সাধ্যমত দান-খয়রাত করেন। সামর্থবান অনেকেই এ মাসে ওমরাহ পালন করেন। অনেক সাওয়াব হাসিল করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। একজন মুসলমান তার সৃষ্টিকর্তার কাছে পুরো আত্মসমর্পণ করেছে, এটা ভেবে মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। দেশে বসেও সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে কোনো ধরনের ভালো কাজ (সৎকর্ম) দেশ, সমাজ ও মানুষের জন্য নিঃসন্দেহে কল্যাণকর। ইবাদত বলতে তো শুধু রোজা রাখা, ওমরাহ পালন, তারাবির নামাজ পড়া বোঝায় না, দুনিয়াদারির সব কাজ ও পেশা ভালোভাবে নির্দেশিত পথে চালিয়ে জীবনকর্ম নির্বাহকেও বুঝায়। ব্যবহারিক অর্থে ধার্মিকতা হচ্ছে আল্লাহভীতি, সত্যের প্রতি সচেতনতা ইত্যাদি। অন্যভাবে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে বেঁচে থাকা ও তাঁর হুকুম মেনে চলাই হলো তাকওয়া (আল্লাহ-সচেতনতা)। আবার সব ধরনের অন্যায় থেকে নিজেকে রক্ষা করে আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করাই তাকওয়া। সম্মানীত মৌলবি-মাওলানাদের কাছে রোজার মাসে ‘শয়তান নাকি বাঁধা থাকে’ বলতেও শুনেছি । কখনো মনে কোনো কোনো ঘটনায় খটকা লাগে, বাঁধা থাকা অবস্থায়ই যদি কপটচারীদের এই অবস্থা হয়, তাহলে অন্য এগারো মাসের অবস্থা কী?

এ মাসেও ফিলিস্তিনের মুসলমানদের বিশ্ববাসীর সামনে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে চিরতরে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এমনকি অধিকাংশ মুসলমান রাষ্ট্রনায়কও গদি রক্ষার তাগিদে মুখে কার্যত কুলুপ এঁটে বসে থাকছেন। কোনো কোনো নেতা মেপে মেপে কথা বলছেন, কপটচারিতা করছেন, তারাও তো নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করেন। আমাদের দেশের মৌলবি-মাওলানাদের কাছ থেকে এদেশের মুসলমানদের ধার্মিকতার বিষয়ে অনেক মূল্যবান পথনির্দেশক বক্তব্য ও চিন্তা-ভাবনা আশা করি। কিন্তু বিধি বাম। তাদের ওয়াজ-নসিহতের বিষয়বস্তু পালটে গেছে। ধার্মিকতা বলতে আমি নিরাশ হয়ে নিজেই দু-চার কথা না লিখে গত্যন্তর থাকছে না। একটা কথা প্রথমেই বলে রাখা ভালো, এদেশের মৌলবি-মাওলানাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অতি ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে অন্তর্বিরোধ ও বিভক্তি, অনেকের ধর্ম বিক্রি করার ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি, রাজনৈতিক দলের চাটুকারিতা আমাকে ভীষণভাবে আহত করে।

এতে মুসলমানরা মুসলমানিত্ব থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। অথচ মুসলমানিত্বের বৈশিষ্ট্য দুনিয়ার যত অকল্যাণকর চিন্তা-ভাবনা, প্রতারণাপূর্ণ মন-

মানসিকতা; দেশ-বিদেশের মানুষ, সমাজ ও দেশবিরুদ্ধ কাজ করার পথে একটা অন্তর্নিহিত বাধা। প্রকৃত মুসলমানদের জন্য সুস্থ চিন্তাধারাসহ দেশের আইন মেনে চলা আপনাআপনি পালিত হয়ে যায়। আমাদের মতো দেশে শুধু আইন প্রয়োগ করে মানুষকে অন্যায় পথ থেকে বিরত রাখা বাস্তবতার নিরিখে সত্যিই কঠিন। আমরা পদে পদে এর প্রমাণ পাচ্ছি। সামাজিক ও ব্যক্তির সুখ-শান্তি ভীষণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রতি বছরের রোজা মুসলমানদের জন্য আত্মত্যাগ ও সঠিক পথে চলার একটা ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ। বাস্তবতা হচ্ছে পুরো মাস প্রশিক্ষণ শেষে যা ছিলাম তাই থেকে যাচ্ছি, প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূ হচ্ছে না।

তেমনিভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামাজও ফলদায়ক হচ্ছে না। আজীবন নামাজ পড়ছি, আবার নামাজ থেকে উঠেই অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে যাচ্ছি, সব ধরনের মিথ্যা ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে ক্ষমতা ও অর্থ-সম্পদকে প্রাধান্য দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছি। আইনের শাসনহীনতা গাঁড়ের উপর বিষফোড়া হিসেবে দেখা দিয়েছে। যদিও নামাজের প্রতি রাকাতে আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি, 'আমরা শুধু আপনারই দাসত্ব করি (আমরা শুধু আপনার দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা করি) এবং শুধু আপনারই কাছে সাহায্য চাই। আমাদেরকে স্থায়ীভাবে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথে, যাদের আপনি অনুগ্রহ দান করেছেন। তাদের (পথ ব্যতীত) যাদের উপর (আপনার) গজব পড়েছে এবং তাদেরও (পথ) নয় যরা পথভ্রষ্ট (হয়েছে)' (সূরা আল ফাতিহা; ১:৫-৭)। সুস্থ মন নিয়ে বুঝে প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়ে সেই মতো দুনিয়াদারি করলেই তো জীবনে সব অন্যায়-অবিচার, কপটচারিতা, হিংসা-বিদ্বেষ, স্বার্থান্ধতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আমরা অধিকাংশ মুসলমান না বুঝে, নামাজে বলা কথা না-পালন করে নামাজকে গতানুগতিক ইবাদত তৈরি করে ফেলেছি, যা দুনিয়াদারির কোনো ভালো কাজে প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতেও পারছে না। আফসোস!

আমি মুসলমানিত্বকে কোনো সাজসজ্জা, লেবাস ও লৌকিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চাইনে। মুসলমানিত্ব সারা জীবনের চিন্তা-চেতনা ও কাজের বৈশিষ্ট্য এবং জীবন পরিচালনার সুনির্দিষ্ট পথধারা, যা কপটচারিতার সম্পূর্ণ বিপরীত, যা ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধিত করে। আজকের লেখায় বেশি ভনিতা না করে চলতি বাস্তবতা অল্প করে লিখছি। এদেশে কপটাচারী যতই মুখের জোর দেখাক না কেন, মনে মনে সে দুর্বল। সত্যের পথ চিরদিনই শক্তিশালী। তবে এদেশে সত্যের পথে টিকে থাকা অনেক শক্ত কাজ, কখনো পিঠে বস্তা বেঁধে

রাখতে হয়, নইলে কপটচারীরা পিঠের চামড়া উঠিয়ে ফেলে। একথা বলছি এ কারণে যে, আমার দেখায় এদেশ থেকে সত্য প্রায় অপসৃত-কোনঠাসা, মিথ্যার জয়জয়কার, মানসিক শান্তির পরিবেশ তলানীতে ঠেকেছে, ধার্মিকতা অনেকটাই আনুষ্ঠানিকতায় ভরা, চোরের মার বড় গলা সর্বত্র, রাজনৈতিক মানসিকতার বিপর্যয় ও সোস্যাল মিডিয়ার লাগামহীন স্বাধীনতাসহ মনুষ্যত্বহীন সার্টিফিকেটসর্বস্ব শিক্ষা আমাদের এ পর্যায়ে নিয়ে গেছে। গায়কও গেয়ে চলেছেন, 'মুখ দেখে ভুল করো না মুখটা তো নয় মনের আয়না, মানুষের ভিতরের খবর তো কেউ পায় না, সাধু আর শয়তানে রে ভাই দুনিয়ায় চলেছে লড়াই, কে সাধু কে শয়তান কিছুই বলা যায় না, দেখে-শুনে তাই করো না যাচাই...'।

ছোট্ট দুটো উদাহরণ দিচ্ছি, যা এদেশের বৃহত্তর অপকর্মের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রয়োগযোগ্য। গত সপ্তাহে ইফতার বাজারে গেলাম ইফতার কিনতে। দোকানের সামনে চরম ভিড়। একজন হঠাৎ বলে উঠলো 'পকেটমার'। মানুষ ধর ধর করে উঠলো। অমনি টুপি মাথায়, পাঞ্জাবি পরা এক লোক ভিড় ঠেলে দৌড়ে পালাতে লাগল। পিছু পিছু তিনজন ধর ধর বলে ধাওয়া করলো। পকেটমার তো পগার-পার। যারা ধর ধর করে পিছু ধাওয়া করলো তারাও আর ফিরে এলো না, তারাও যে পকেটমারের সাঙ্গপাঙ্গ নয়, এটা বুঝবো কীভাবে! আমরা ভালো মানুষের প্রতিও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। কপটচারীর সংখ্যা বেশি বলেই হয়তো এরকম হচ্ছে। এতে প্রকৃত ভালো মানুষ পদে পদে অসম্মানীত হচ্ছে। কপটচারীরাও অবস্থাভেদে পার পেয়ে যাচ্ছে। টুঙ্গির ইজতেমার ময়দানে টুপি-পাঞ্জাবি পরা এ-রকম জোচ্চর তো প্রতিবছরই কিছু ধরা পড়ে পত্রিকার শিরোনাম হয়। একটা দেশে ভালো-খারাপ লোক মিলেই বসবাস করবে এটাই স্বাভাবিক। খারাপ লাগে অন্য জায়গায়। কেউ খারাপ কাজ করলে করুক, কিন্তু ধর্মের নামে ও মুসল্লি সেজে করবে কেন? এরই নাম কি কপটচারিতা? কপটচারিতা মানে ধূর্ত, মিথ্যাচারী, ঠক, ছদ্মবেশী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকা। মনের হীন উদ্দেশ্যকে গোপন রেখে মুখোশ পরে জনসমাজে মানুষ ও নিজের জাগ্রত বিবেককে ঠকানোর জন্য কাছা মেরে নামা। যার গায়ের গন্ধে কাছে ঘেঁষা যায় না, সে আতর আলী বলে নিজেকে দাবি করে। এভাবেই দেশটা চলছে। এ রোগের প্রকোপ এদেশে বেশি, যার ফলে সাধারণ নিরীহ মানুষ প্রতারণার ফাঁদে পড়ে ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আমার মনে হয় রোজার মাসে রোজার দোহায় দিয়ে এদের পদচারণা বেড়ে যায়, যেমন অমাবস্যা-পূর্ণিমায় বাত-ব্যথা রোগীদের রোগ বেড়ে যায়; যে-কোনো কোথাও নির্বাচন এলেই সবাই জনদরদি সাজার চেষ্টা করে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে

গলাবাজি করে কিংবা সোস্যাল মিডিয়ায় লিখে ফলাও করে নিজেকে জাহির করে। অথচ আত্মশুদ্ধি ও আত্মজিজ্ঞাসার কোনো নাম-নিশানা নেই। কিন্তু আল্লাহতায়ালা তো সবকিছুই বোঝেন ও মনের খবর জানেন। এটা কিন্তু কপটাচারীরাও বোঝে। হয়তো ভাবে, 'শেষ বয়সে একবার, নইলে দু-বার হজ পর্ব সমাধা করে সব কিছুকেই মাফ করিয়ে শিশুসদৃশ পুণ্যাত্মা হয়ে বিনা বাধায় জান্নাতুল ফেরদাউসে পোঁছে যাবে। যাহোক মনে মনে একটা নিদেন বুঝ ও বুদ্ধি ওদের অবশ্যই আছে। আমরা ক্রমেই লোকদেখানো মুসলমান হয়ে যাচ্ছি না তো!

এ ছাড়াও একটা শ্রেণি এদেশে বিদ্যমান। এরা সবকিছুতে গা বাঁচিয়ে চলে। তারা চুপ থেকে সত্য গোপন করে। ঝামেলামুক্ত থাকতে চায়। অন্যের উপকারে সত্যকে সাথে নিয়ে এগিয়ে আসতে চায় না। এটা আমাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। আমাদের মুসলমানি স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য ক্রমেই দূরীভূত হচ্ছে। মিথ্যাকে জ্ঞাতসারে মেনে নিচ্ছি, আত্ম-প্রবঞ্চনা করছি। সামনাসামনি কথা না বলে গোপনে চুগোলখোরি করছি। দুই বিরোধী পক্ষের কাছেই ভালো মানুষ হবার চেষ্টা করছি। অধিকাংশের কথা ও কাজের উপর ভরসা করা যায় না। এটা আবার কেমন মুসলমানিত্ব? কোনো মৌলবি-মাওলানাকে জিজ্ঞেস করলে কিছু না ভেবেই সোজা উত্তর 'এগুলো কিয়ামতের আলামত'। উত্তরটা দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকে। 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ' কথাটা হয়তো তার জানা নেই, অথবা জানা থাকলেও মুখস্ত আছে, অভাবিত রয়ে গেছে। এসবই আমাদের নিজ হাতে তৈরি সমস্যা। নাস্তিক বাদে সব মুসলমানই কমবেশি পরকালের ভয় করে। যাদের ধর্মীয় বক্তৃতা দেওয়ার দায়িত্ব, তারা কি বিষয়গুলোর গুরুত্ব ও ভুলগুলো বারবার মানুষের সামনে কুরআনের ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরতে পারে না? এতে সমাজ থেকে অনেকটাই কপটচারিতা দূরীভূত হয়। বারবার রমজান আসে, রমজান যায়; প্রশিক্ষণটা অধরাই রয়ে যায়। এটাও আনুষ্ঠানিকতায় রূপ নিয়েছে। প্রতি বছর অন্য মাসগুলোর তুলনায় ইফতার মহফিলেই বেশি খরচ। অন্য কোনো ভিনজাতি দেখলে 'ফুড ফেস্টিভ্যাল' বলে ধারণা করবে। অথচ নিজে অল্প খেয়ে, অপচয় না করে সম্পদটা গরিব-দুঃখীকে দান করলে একদিকে ইবাদত, অন্য দিকে গরিবের টিকে থাকার সম্বল বাড়ে। এদেশে যে-কোনো ভালো কাজ করার জন্য একদল সুস্থ-মানসিকতাসম্পন্ন লোকের সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টাই যথেষ্ঠ।

এদেশে যত ধনী আছে, যথাযথ পরিমাণ জাকাত আদায় করে সুষ্ঠু বণ্টনব্যবস্থার মাধ্যমে গরিব-অসহায়দের মধ্যে বণ্টন করলে পাঁচ বছরেই দেশে সাম্যের নীতি বাস্তবায়িত হতে পারে। আমরা ইবাদত করি বটে, টাকা খরচ এড়িয়ে নামাজ-

রোজা-তসবিহ তেলাওয়াত বেশি করে পরবর্তী সাত প্রজন্মের জন্য সম্পদ মজুদ করি। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্ট-জীবের মধ্যে এ প্রবণতা নেই। যেখানে নিজের অধিক ত্যাগের মাধ্যমে ইবাদতের কথা বলা আছে, কুরআনের সে আয়াতগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। সুবিধাজনক আয়াতগুলো পালনের চেষ্টা করি। আসলেই এগুলো আল্লাহর সাথে মশকরার সমতুল্য।

আমরা দুনিয়ার কল্যণকর ও ভালো কাজকে ভুলে পরকালের বেহেশত পাবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছি। দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টির পুরো উদ্দেশ্যকে বরবাদ করে দিতে চলেছি। একটা আয়াত লিখে শেষ করবো। '(সালাত শুধু) মুখ পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরানোতে কোনো কল্যাণ (সওয়াব) নেই বরং সওয়াবের কাজ সে করে যে আল্লাহ, আখিরাতের দিন, ফেরেশতাগণ, (আসমানি) কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর ভালোবাসায় নিজ ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও আটকানো ঘাড় (যে কোনো ধরণের দাসত্বের শৃঙ্খল) মুক্তির জন্য দান করে, আর সালাত প্রতিষ্ঠা করে (সালাতের অনুষ্ঠানসমূহ নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে-শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করে), যাকাত দেয়, অঙ্গীকার করলে তা পূর্ণ করে, বিপদ-আপদ, অভাব-অনটন ও যুদ্ধের সময়ে ধৈর্যধারণ করে; তারাই সত্যবাদী; আর তারাই হলো আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তি' (সূরা আল-বাকারাহ; ২: ১৭৭)। আমি আমাদের সম্মানীত মৌলবি-মাওলানাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও উপরিগত বিদ্যা বিসর্জন দিয়ে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বেচ্ছায় কুরআনের মর্মবাণী খোলা মনে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করবো। তাহলে সমাজ ও মানুষের মনের অন্ধকার ও কপটচারিতা অনেকটাই দূরীভূত হবে বলে আশাবাদী।

(প্রকাশ: ৫ এপ্রিল ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা- সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

বারবার ঠিকানা খুঁজে ফিরি

কিছুদিন আগে একটা গানের কলি থেকে নিয়ে এ পত্রিকাতেই নিবন্ধের শিরোনাম লিখেছিলাম, 'চলার শেষ কোন সাগরে তার ঠিকানা তো জানা নাই'। ঠিকানা না জানলেও কিন্তু অনুমেয় ঠিকানাও অনেকটা সঠিক হয়। এ ক্ষমতাটুকু অন্তত বিধাতা মানুষকে দিয়েছেন। আসলে নদীর উৎপত্তি জানা থাকলে সাগরের ঠিকানাও জানা সম্ভব। তবুও কখনো আমরা ঠিকানা খুঁজে ফিরি। হতে পারে এ ঠিকানা খোঁজা বুঝেও না বোঝার ভান, কিংবা জেগে ঘুমানোর অভিব্যক্তি, অথবা কাউকে ইশারায় ঠিকানা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। কারণ 'উঠন্তি মূলো তো পত্তনেই চেনা যায়'। সে-জন্যই যত কথা। মূলত আমি একজন সাধারণ শিক্ষক। এদেশে জন্মেছি, এদেশেই বসবাস করি। দেশ আমাকে যেদিকে নিয়ে চলে, সেদিকে চলি। 'কোনো উপায় তো নেই, মধুসূদন!' মাঝে-মধ্যে শাশ্বত শিক্ষকের বার্তা পৌঁছে দিই। দেশের ঠিকানা মানেই আমার ঠিকানা। সেজন্যই ভাবি, আমি কোথায় চলেছি! বেশ কিছুদিন থেকে আমার মাথায় চিন্তা ঢুকেছে, যুবসমাজ ছাড়া কি দেশের ভবিষ্যৎ ঠিকানা খুঁজে পাওয়া সম্ভব? যুবসমাজকে আমরা জাতির ভবিষ্যৎ বলি। এদের বর্তমান অবস্থাই-বা কি? বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই। এখানকার ছাত্রছাত্রীরাও যুবসমাজের একটা অংশ। যুবসমাজের দেশপ্রেম, শিক্ষা-দীক্ষা, মন-মানসিকতা, সমাজ গঠনে তাদের অবদান, চরিত্র গঠন, নৈতিকতা, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা– সবকিছুকে নিয়েই দেশের ভবিষ্যৎ আশা-নিরাশা। আমার মাথায় একটা কিছু ঢুকলে সেখান থেকে সহজে বেরিয়ে আসতে পারিনে। মনে অনুসন্ধিৎসা জেগে ওঠে। অনেক সময়ই ঢাকার চারপাশে গড়ে-ওঠা উপ-শহরাঞ্চলে যেতে হয়। কখনো কোনো কোনো জেলায় বিভিন্ন কাজেও যেতে হয়। যা দেখি নিজ চোখে দেখি ও নিজ কানে শুনি। দেশের পরিবেশ ও অবস্থা নিয়ে মাথায় ভাবনা চলে আসে। কেন আসে, এর কৈফিয়ৎ দেওয়া অতটা সহজ নয়; তাই এড়িয়ে যাওয়া ভালো। এ কথায় পরে আসছি।

আমাদের ব্যবসার পরিধি ক্রমেই বাড়ছে। অতীত থেকে আদম ব্যবসা এদেশে চলে আসছে। আদম ব্যবসায়ীর মাধ্যমে যুবসমাজের লাখ লাখ সদস্য বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে গেছে ও যাচ্ছে। বিদেশী মুদ্রা অনেক কষ্টে অর্জন করে দেশে আনছে। দেশে-বিদেশে এ বিষয়ে তাদের ভোগান্তি, শোষণ, প্রতারণা– যা হচ্ছে, আদম-ব্যবসায়ীরা করছে। আমরা দেখছি; ভুগছে যুবসমাজ। ভোগান্তির মাত্রা ও ধরন বিষয়ে ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারো সম্যক ধারণা নেই। কোনো প্রতিকার আমরা করতে পারিনি। ব্যবসায় স্বচ্ছতা আনতে ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। ব্যবসাকে আমরা কলুষিত করে ছেড়েছি কিংবা সে অবস্থাতেই চলছে। ব্যবসাটা

যুবসমাজ শোষণের আখড়াতে পরিণত হয়েছে। তবুও মানুষ তাদের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হচ্ছে। করণ 'গরজ বড় বালাই'। এছাড়া চোখে এমন ব্যবসা দেখছিনে যে, সেখানে খরিদ্দার ঠকানো, দিনে-দুপুরে ডাকাতি হচ্ছে না; এমন পণ্যের বিক্রি এদেশে কম, যাতে ভেজাল নেই। এতে ক্রেতা-সাধারণ রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ছে, অনেকে অকালেই জীবনের অমিয়-সায়রে নৌকা ভাসাচ্ছে। খোঁজ করে দেখার কেউ নেই। দেশটাই চলছে ভেজাল ব্যবসার ওপর। কথা, কাজে, পেশায়, প্রতিটা পদে ভেজাল; ভেজালে সমাজ সয়লাব। কাকে রেখে কাকে দোষ দেবো! জীবনযাপনের জন্য সমাজে চলতে হয়। নিজে পর্যবেক্ষণ করি, সমাজের অতি নগণ্য সংখ্যক মানুষ কথার মূল্য রাখে। জিহ্বা উলটে ফেলা সাধারণ ও নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এমন কি লিখিত আকারে কথা দিয়ে, সই করেও কথা ঘুরিয়ে ফেলতে দেখছি। যে যুব সমাজ দেশ চালাবে তারা নির্বিকার। সব অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার, অনিয়ম গা-সওয়া হয়ে গেছে। তাই সদা প্রশ্ন জাগে, কোথায় চলেছি?

এবার রাজনীতির ধরন-ধারণ, গতি-প্রকৃতির কথা অল্প করে বলি। আমরা রাজনীতিক বলতে এমন একটা সম্প্রদায়কে বুঝি যারা নিজেদের স্বার্থকে ত্যাগ করে জনসেবা ও দেশসেবা করবে। সে আশা-ভরসা নিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল। এ আশা-আকাঙ্ক্ষাই তো আমরা মনের কোণে পুষে রেখেছি। সে আশা-ভরসা তলানীতে গিয়ে ঠেকেছে। এ উদ্দেশ্য নিয়েই তো অনেকেই ভোটের স্বচ্ছতা ও গণতন্ত্র নিয়ে সরব হন; উদ্দেশ্য একটাই– দেশসেবা ও সমাজসেবা। এ বিষয়ে আমি কখনো কখনো সরব হলেও মনের কোণে কোথায় যেন একটা দ্বন্দ্ব রয়ে যায়। কারণ যে বীণা বাজে না, তা কী কাঠের তৈরি, কেমন করে তৈরি, মেসিনে তৈরি, না ছুতার দিয়ে তৈরি– এটা দেখে, বিবেচনা করে কী লাভ? আমাদের এমন বিড়াল প্রয়োজন, যেটি ইঁদুর ধরে। ইঁদুর ধরাটাই তো প্রধান উদ্দেশ্য, নয় কি? বর্তমান এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, জনসেবা ও দেশসেবা করার উদ্দেশ্য নিয়ে এদেশের কোনো দলের কেউ রাজনীতি করেন বলে মনে হয় না। কেউ থাকতেও পারেন, সেটা ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম দিয়ে তো সাধারণ নিয়ম চলে না! তাছাড়া মাস্টার মানুষ হওয়াতে 'মহান রাজনীতিবিদদের' সাথে আমার সখ্য কম। ভেতরের অনেক খবর রাখিনে। জনস্বার্থে ত্যাগের মহিমা নিয়ে ব্যতিক্রমধর্মী কোনো রাজনীতিকের দেখা এদেশে পেলে তাকে 'ফেরেশতা' বলে আমি অভিহিত করতে চাই। এ অভিধা তার জন্য যথার্থ বলে আমার বিশ্বাস। রাজনীতি যারাই করেন, পদাধিকারী হন, তাদের অধিকাংশই তো যুবসমাজের অংশ। তাদের কাজ-কারবার অনেকটাই বলে দেয় ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ধারা কোন দিকে গড়াবে। বলে দেয়, এদেশের রাজনীতির অভিমুখিতা কোন দিকে। প্রতিদিনের পত্রিকা আরো এ-সম্প্রদায় সম্পর্কীত শতেক খবর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

এ থেকে এটুকু বোধ জন্মেছে যে, যে দলই ক্ষমতায় আসুক বা থাকুক, এদেশের রাজনীতি হয়ে গেছে ব্যবসাভিত্তিক। যে কোনো ব্যবসাতে ভালো লাভ অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের রাজনীতি করা অবশ্যম্ভাবী। রাজনীতির সুনজর ছাড়া তো কোনো ভালো ব্যবসা এদেশে চলছেও না। বাস্তবতাকে অস্বীকার করি কী করে? সে আশা নিয়েই তো যুবসমাজ নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে দলে দলে রাজনীতিতে ঢুকছে। সব ব্যবসাসহ বিশ্ববিদ্যালয়েও তো একই অভিমুখিতা দেখতে পাচ্ছি। একটা দেশে মানুষই সর্বেসর্বা। মানুষের সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ বসবাস, সুস্থ ও মনুষ্যত্ববোধ-সম্পন্ন চিন্তাধারা, সুশিক্ষাসহ সুনাগরিক হয়ে সাধারণ জীবনযাপনই সবার প্রত্যাশা। এর ব্যতিক্রম হলেই যত আপদ-বালাই, অশান্তির নরক-গুলজার দেশের দিকে ধেয়ে আসে; চারদিক তাকিয়ে যা নিত্য চোখে পড়ছে।

একাত্তরের স্বাধীনতার পর থেকেই যে সরকার যতবার দেশ পরিচালনা করেছে, শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রত্যেকেই সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে গেছে। তেপ্পান্ন বছরের পর উন্নতির অবস্থা তো আমরা সবাই স্বচোক্ষে দেখতে পাচ্ছি। এ উন্নতিকে (অনুন্নতিকে) অস্বীকার করি কী করে! সঠিক তথ্য আমার জানা নেই, তবে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে যতটুকু শুনছি, পাবলিক সার্ভিস কমিশন বলছে, শিক্ষার সার্টিফিকেট দেখিয়ে যে-সব যুবক-যুবতী বিসিএস পরীক্ষায় প্রাথমিকভাবে অংশগ্রহণ করছে, এদের অধিকাংশ অনুপযুক্ত। তাই চার লাখ পরীক্ষার্থীর মধ্যে হয়তো বড় জোর দশ হাজার প্রতিযোগীকে পাশ করিয়ে পরবর্তী পরীক্ষাগুলোতে অংশ নিতে বলা হচ্ছে। এদের অধিকাংশের মানও আশানুরূপ নয়। এসব তথ্য দেশের শিক্ষার মান নিয়ে একটা সাধারণ ধারণা দেয় তো বটেই। আমরা হয়তো এসব কথা পাশ কাটিয়ে সামনে ধেয়ে চলি। যারা লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হচ্ছে, যে যুবসমাজের ওপর দেশ নির্ভর করতে পারে, তাদের বেশিরভাগ পশ্চিমা-বিশ্বে পাড়ি দিয়ে দেশে আর ফিরতে চাচ্ছে না। তাদের ঠিকানা আমরা পাচ্ছি, কিন্তু আমাদের ও দেশের ঠিকানা কোথায়? মাশাআল্লাহ প্রতিটা জেলায় একটা করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় হয়ে গেছে অথবা হতে চলেছে। অচিরেই শিক্ষার্থীর অভাব হলেও সার্টিফিকেটের অভাব হবে না। সবকিছুই হচ্ছে তো যুবসমাজকে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ার লক্ষ্যে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নিয়ে বেশি কথা বলার অবকাশ নেই। ১০৮টা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বড় জোর ৮টা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া কিছুটা হলেও হতে পারে, বাকি ১০০টা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নিছক কোচিং ব্যবসার শামিল। এদের অনেকেই আগে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং ব্যবসায়ে জড়িত ছিল। অন্যরা বাকিদের দেখাদেখি কোচিং ব্যবসাতে যুক্ত হয়েছে। মূলত এদেশ সব বিষয় নিয়ে অনিয়ন্ত্রিত ব্যবসাতে ডুবে গেছে। ব্যবসারও একটা নীতি-নৈতিকতা

থাকে, সেটাও চলতে পথে কোথাও ঝরে পড়েছে। স্কুল-কলেজে নোট মুখস্ত ও টিক-চিহ্ন ছাড়া কোনো লেখাপড়া নেই। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এসেই হঠাৎ করে এত বিদ্যাজ্ঞান মাথায় আসবে কোত্থেকে? সুতরাং স্কুল-কলেজে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে না পারলে শিক্ষার মানোন্নয়নের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এ ব্যর্থতার জন্য মাত্র দুটো বিষয়কে আমি দায়ী করি। একথা শুনে অনেক সতীর্থ আমার প্রতি নাখোশ হতে পারেন, কিন্তু ঘটনা সত্য। এক হচ্ছে– শিক্ষকদের কোচিং ব্যবসা। এ ব্যবসা থেকে শিক্ষকদের ফিরিয়ে আনাটা অত সহজ না। আইন ইচ্ছে করলে অনেক করা যাবে, কিন্তু সুষ্ঠু বাস্তবায়ন অনেক কঠিন। গভীর ক্ষতের ওপর মলম মালিশ সম্ভব। দুই হচ্ছে– শিক্ষার পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা। এদেশের প্রতিটা গ্রামে-গঞ্জের রাজনৈতিক পরিবেশ শিক্ষার পরিবেশকে কুরে কুরে খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলছে; কোথাও কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। নীতি-নৈতিকতাহীন যুবসম্প্রদায়ই এসব করছে, আবার ফলও এদেরকেই ভোগ করতে হচ্ছে। ঘরে আগুন লাগায় এক জন, পুড়ে মরে দশ জন। দেশব্যাপী হাজারে হাজার কিশোর গ্যাংয়ের অস্তিত্ব প্রতিনিয়ত কাগজে পড়ছি। তাদের কর্মকাণ্ডও আমরা দেখছি। এরাই তো ভবিষ্যৎ যুবসমাজ। এদেশের মহান রাজনীতিবিদরা যুবসমাজ নিয়ে নীতিহীন, চরিত্র-হননের মুখসর্বস্ব ব্যবসায় নেমেছেন, ফল যা হওয়ার তাই হচ্ছে ও হবে, যেমন রাজনৈতিক আনুকূল্যে ব্যাংক-ব্যবসা, কৌশলী বুদ্ধি, টাকা পাচার দেশের অর্থনীতি সমূলে ধ্বসিয়ে দিচ্ছে। কোন সেক্টরকে বাদ দিয়ে কোনটাকে বলবো! সর্বত্র একই অবস্থা– দুর্নীতি, লুটপাট আর নীতিহীনতা। মূলত জনগোষ্ঠী হাজামজা হয়ে পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, এ তেপ্পান্ন বছরে জীবনমুখী, মানবতা-জাগানিয়া ও কর্মমুখী শিক্ষা নিয়ে যাদের জনসম্পদে রূপ নেওয়ার কথা ছিল।

আগে ভাবতাম, এদেশের ৯০ শতাংশ লোক মুসলমান। এ ধারণা থেকে অনেক আগেই বেরিয়ে এসেছি। অনেক জায়গায় লিখেছি যে, মুসলমান পোশাকে ও নামে নয়; মুসলমান তার কথা-কাজ ও চিন্তা-চেতনায়, দায়িত্ব পালনে, বৈশিষ্ট্যে। কেউ কষ্ট পেলেও সত্য যে, সে বিবেচনায় আমাদের দেশের অধিকাংশ নামধারী মুসলমান মুসলমানের কাতারে আসে না। কয়েকদিন আগে পত্রিকায় পড়লাম, বিশ্বের অনেক নন-মুসলিম দেশ আমাদের দেশ ও আরো অনেক মুসলিম দেশের তুলনায় মুসলমানসুলভ কর্মকাণ্ড, মানবিক বৈশিষ্ট্যে, দায়িত্ব পালনে ও চিন্তাচেতনায় তালিকার প্রথম দিক থেকে ক্রমানুযায়ী অনেকদূর দখল করে রেখেছে। সম্ভবত স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর কোনো কোনো দেশ এগিয়ে। আমাদের অবস্থান শেষের দিকে। সে-দেশের অনেক নন-মুসলমান হয়তো পরকালে বিশ্বাস রাখতে পারেন না, কিন্তু

একজন মুসলমানের দুনিয়াতে যেসব কাজকর্ম, নীতি-নৈতিকতা ও চিন্তাচেতনার বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত, তারা মানুষ হিসেবে সেগুলোর অনেকটাই করেন। সঠিক পরিসংখ্যান দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

শুরুতে উল্লেখ করেছিলাম ঢাকা শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রায়ই যেতে হয়। বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় শহরেও যেতে হয়। সব অঞ্চলেই শহরের চারপাশে রিসোর্ট ব্যবসা নামে নতুন ব্যবসা গজিয়েছে। অতি উপভোগ্য ব্যবসা। যান্ত্রিক জীবনের একঘেয়েমি কাটাতে কোনো কোনো পরিবার সেখানে গিয়ে দিবা-রাত্রি যাপন করে। রিসোর্ট-ব্যবসা পরিবারের রাতযাপন ও বেড়ানোর চেয়ে যুবসমাজের অসামাজিক কার্যকলাপের আড্ডাখানা হিসেবেই বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। এ অনৈতিক ব্যবসাতে এদেশে এখন আর ঢাকঢাক-গুড়গুড় নেই। এটা যুবসমাজ উচ্ছন্নে যাওয়ার উৎকৃষ্ট ও নিরাপদে পাতা ফাঁদ। হাতে মোবাইল ফোনের ফেসবুকের মাধ্যমে পরিচয়পর্ব। কোকিল-কণ্ঠি গলা, 'বোতল-ফুঁস'-এর মাধ্যমে গলা ভেজানোর সুব্যবস্থা, সুশৃঙ্খল বাহিনীর নিরাপদ পাহারা। সুন্দর-সুপরিপাটি পরিবেশে স্থানীয় রাজনৈতিক মস্তান, দালাল ও আইন রক্ষাকর্তাদের ম্যানেজ করে যুবসমাজের অবিরাম চরিত্রহননের সুযোগ। দেশের উদ্দেশে বলতে ইচ্ছে করে, 'হায় রে তোমার পিরিতের এত জ্বালা রে বন্ধু, আগে তো না জানি-ই...'। আমার প্রশ্ন, যুবসমাজ কোন ঠিকানায় গিয়ে চরিত্র বাঁচাবে? জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ।

(প্রকাশ: ২৩ মে ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

রাজনীতির পচা দুর্গন্ধে পথ চলা দায়

(পত্রিকায় প্রকাশিত শিরোনাম: দুর্নীতির দুর্গন্ধ ছড়িয়ে গেছে চতুর্দিক)

দেশে সমস্যার অভাব নেই। আমি কতগুলো মূল সমস্যাকে কেন্দ্র করে মাঝেমধ্যে লিখি। মূল সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারলেই উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যেত। কখনো একই সমস্যা নিয়ে বারবারও লিখি। এসব কথা কেউ কানে তোলে কিনা, এ নিয়ে বেশ কিছুদিন থেকে মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এদেশে আমরা অনেকেই কানা ছেলেকে পদ্মলোচন বলে অভ্যস্ত। বলা যায় রেওয়াজে পরিণত হয়ে গেছে। এরা সমাজে ভালো আছে। এতে অভ্যস্ত না হলেও বিপদ; পথ চলা দায় হয়ে যায়। কানা ছেলেকে কানা বললেও অসুবিধা। কানা ছেলে হাত উঁচু করে মারমুখী হয়ে তেড়ে আসে। 'কানাকে কানা বলা যাবে না'; নসিহত করে, 'অপ্রিয় সত্য কথা বলতে নেই'। এগুলোও তো সমস্যা। কানা ছেলের চোখের অসুখটা চিকিৎসা করিয়ে নিলেও তো পারে। তাও করাবে না। 'আমি আজীবন কানা থাকবো, তাতে তোমার কি? কানা থাকা আমার অধিকার।' 'বুঝলাম, কানা থাকা তোমার অধিকার, কিন্তু পথ চলতে– কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে না-দেখে গায়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দাও কেন?' এ কথার কোনো উত্তর নেই। উত্তর একটাই, 'সব কথায় উত্তর খুঁজতে হয় না'। চোখের জ্যোতি কম হলেও গলার স্বর উদগ্র। 'কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো'। এরকম উদ্ভট গৌরচন্দ্রিকা দিচ্ছি এ কারণে যে, আমি এদেশের অতি মূল্যবান একটা বিষয় 'রাজনীতি' নিয়ে লিখছি। শুধু তা-ই নয়, একে 'পচা দুর্গন্ধযুক্ত' বলছি। রাজনীতি এদেশের জীবন কিংবা মরণ; আমাদের অস্তিত্বের সাথেই জড়িত। এর দশা দেখলে করুণা হয়।

সবে ঈদুল আজহার ছুটি শেষ হলো। গরু ব্যবসায়ী এবং গ্রাম বাংলার সাধারণ কৃষক বিভিন্ন এলাকা থেকে ট্রাক ভাড়া করে রাজধানীতে কোরবানির গরু বিক্রি করতে আসে। এ আসা যে কি ঝকমারি, ভুক্তভোগীরা আবারো ভুগে এবারের মতো মুক্তি পেল। এত পরিশ্রম করেও লাভ যা হবার কথা, তা হলো না। লাভের মাল পিঁপড়েয় খেয়ে গেল। এ রেওয়াজ অনেক দিনের। বিভিন্ন এলাকায় ঘাটে ঘাটে রাজনৈতিক মস্তানরা তাদের নিদানের সাথী পোশাকধারী বন্ধুদের নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। গরু ট্রাকে বা নৌকায় পার হতে গেলেই ইচ্ছে মতো 'ফেলো কড়ি, মাখো তেল'। এ ছাড়াও সিন্ডিকেট– ঘাটে গরুর ট্রাক অপেক্ষা করিয়ে রাখবে, না-কি ছেড়ে দেবে? রাজধানীর গরুর বাজারে কৃত্রিম অভাব তৈরি করতে গেলে এটা করা লাগে। নইলে রাজধানীর হাটে গরুর দাম বাড়বে কেমনে?

ঘাঠে-মাঠে-হাটে সবকিছুর সাথে রাজনীতির মদদপুষ্ঠ এলাকাভিত্তিক কুটিল মৌসুমি ব্যবসায়ীরা জড়িত। যারা সবাই যার যার ধান্দায় মহা-'জনকল্যাণে' ব্যস্ত। এরা 'রাজনীতির মহাবুদ্ধিজীবী'। উড়ো টাকা ধরে নেওয়ার ফন্দি এরা জানে। রাজনীতির আদর্শ থাক বা না-থাক দলে ভিড়ে স্বার্থ আদায় করে খাচ্ছে। রাজনীতির কথা– 'আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে'। এদের নয়া উদ্ভাবনী বুদ্ধির কাছে, নিউটনের উদ্ভাবনী বুদ্ধিও ফেল। নদীর ঢেউ গুনেও এরা টাকা আদায় করবে, সম্পর্ক আছে পোষাকধারী সহ-অংশীদারী বন্ধুদের সাথে। বন্ধুদের সঙ্গে এসব কাজে বড্ড মিল।

সবকিছুতেই দেশব্যাপী বাতাসে পচা দুর্গন্ধ। মহান রাজনীতির দোসরদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের দুর্গন্ধ। একচোখ দিয়ে তো দেখতে পারি না। যা পত্রিকায় পড়ি, শুনি ও দেখি, তা লিখি। গুরুভক্তি করতে পারি, কিন্তু গুরুর সব সাগরেদের কর্মকাণ্ডকে তো আর মেনে নেওয়া যায় না! এ লেখা কোনো নেতা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেও মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এদেশের আইনহীনতা ও দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশ কার না অজানা!

প্রতিদিন যতবার পত্রিকা পড়ি বিশ্রী উৎকট গন্ধটা বাড়ে। সেদিন ক্লাসে কোনো একটা বিষয়ে ব্যবহারিক উদাহরণ দিতে গিয়ে এমপি আনারের কিমা-করা মাংস ময়লার ট্যাংক থেকে ওঠানোর গল্পটা যেই-না বলেছি, ক্লাসের সবাই নাক ধরে বসে থাকলো। কোনো কোনো মেয়ে অক্-অক্ শব্দ করে বমি তোলার মতো করতে লাগলো। বিশ্রী গন্ধটা তখনো যেন তাদের নাকে ভেসে আসছে। এমপি আনারের ভাগ্য বড্ড ভালো যে, তিনি যা-ই করুক, রাজনীতির একটা বড় পদ দখল করতে পেরেছিলেন। নইলে পত্রিকায় এত কভারেজ তিনি নিশ্চয়ই পেতেন না। এত গন্ধও ছড়াত না; পচা রাজনীতির গন্ধ। প্রথমে শুনছিলাম তিনি একজন সোনা চোরাকারবারি, হুণ্ডি ব্যবসায়ী, মাদক ব্যবসায়ী, রাতচরা বাহিনীর গডফাদার, মাদক ও নারীপ্রিয়, টাকা ভাগাভাগির কোন্দলে খুন হয়েছেন। এর সাথে এখন খবরে ভেসে আসছে রাজনীতির অন্তর্দ্বন্দ্ব, ঘরের ভেতরে আরো ঘর, ক্ষমতা ভাগাভাগির কথকতা, ঘরের শত্রু বিভীষণ। এতে রাজনীতির পচা দুর্গন্ধটা আরো বেড়ে যাচ্ছে। কোনো কিছু পচতে গেলে ব্যকটেরিয়ায় আক্রান্ত হতে হয়। রাজনীতি ব্যকটেরিয়ায় আক্রান্ত না হলে পচবে কীভাবে? না পচলে দুর্গন্ধইবা বেরোবে কীভাবে? এদেশের রাজনীতি ব্যকটেরিয়া-আক্রান্ত হতে হতে এখন নিজেই একটা ব্যকটেরিয়ায় পরিণত হয়েছে, যাকে স্পর্শ করে তাকেই পচিয়ে ছাড়ে, শেষে পচা দুর্গন্ধ বেরোই। কিংবা বলা যায়, যে দ্রব্য বা মালামালই ব্যকটেরিয়া-রাজনীতির সংস্পর্শে আসে, তা পচে দুর্গন্ধ ছড়াতে বাধ্য হয়।

একই রাজনীতির সংস্পর্শে গিয়েছিলেন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ প্রধান বে-নজির সাহেব, বে-নজির যে নজির এদেশে রেখে গেলেন, অতীতের এ পদে কেউ এমন নজির দেখাতে পেরেছেন কি-না আমার জানা নেই। পত্রিকায় প্রকাশ, তিনি নাকি একটা জেলার অর্ধেক ভূস্বামী, হাজার হাজার কোটি টাকার ও সম্পদের মালিক তিনি নিজে অথবা তার নিকটজন। তিনি দেশ ছাড়ার আগেই নাকি তার ব্যাংক ব্যালান্সের সদগতি হয়ে গেছে। এখন ব্যাংক হিসাব বন্ধ করে দেওয়ার সময় এসেছে। বোঝা যায়, এমন সুযোগ্য-অনুগত অফিসারের সাহায্য-সহযোগিতা করার লোকের অভাব এদেশে নেই। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাওয়ার জন্যও তার যথেষ্ঠ যোগ্যতা রাজনীতিকরা খুঁজে পেয়েছিলেন। সবচেয়ে আকর্ষণীয় লেগেছে, এদেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার অনুগত (না-কি বাধ্যগত) শিক্ষা-ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত 'আমি তোমারি, ভুলনা আমায়' মার্কা দলীয় অনুচরদের কর্ম দেখে। আমি একজন শিক্ষক হিসেবে এ কষ্ট ও অপমান আমারও। এজন্যই বলছি, তার নজির খুজে পাওয়া ভার। রাজনীতিকরা বলেন, 'দোষী কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না'। আবার বলেন, 'আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে'। এমন আরো অনেক মুখস্ত কথা আছে, যেসব কথা বলে তারা আখড়া জেতেন। কবি বলেছেন, 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর, তোমার মাঝে আমার প্রকাশ তাই এত মধুর'। আমিও বেনজিরের মাঝে অসীমকে খুঁজে পায়। তার ভাষার মধ্যেও রাজনীতির ভাষা খুঁজে পাওয়া যেত। মূলত তার ক্ষমতা ছিল অসীম। এর মাঝেও তিনি নিজের সম্পদ গড়ার সুর বাজিয়েছেন। প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা বে-নজির সাহেবের মাঝে রাজনীতির মুখস্ত 'মধুর' বাণী প্রকাশ পেত, পরিবর্তে এখন এত বিশ্রী দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। এ দুর্গন্ধ ধামাচাপা দিতে কেউ হয়তো পুলিশ বাহিনীর দুর্গন্ধ খুঁজবে, এ দুর্গন্ধ আসলে পচা রাজনীতির দুর্গন্ধ। শুনছি তার মতো অস্বাভাবিক অবৈধ সম্পদ মজুদের পথ আরো অনুসরণ করেছে তার বাহিনীর অসংখ্য উর্ধ্বতন অফিসাররা। শুনছি তাদের বিষয়টাও দুদক তদন্ত করছে। ফল কি হবে অনুমান করতে পারি। এ দুর্গন্ধ তো একটা বিভাগে নয়; রাজনীতির ব্যকটেরিয়া এদেশের যে বিভাগ ও বাহিনীর সংস্পর্শেই এসেছে সেটাকেই পচা দুর্গন্ধে পরিণত করেছে।

মনে পড়ে বর্তমান সরকারি অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সস্তা পিএইচডি সংক্রান্ত বিষয়ে এহেন অনেক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে এ কলামেই একবার বাস্তবতা ও ডিগ্রীপ্রাপ্তির সহজলভ্যতা তুলে ধরেছিলাম। কোনো কিছুই অমূলক নয়। এদেশে রংয়ে রংয়ে একরং হয়ে মিলে গেলে পাতানো পিএইচডি সার্টিফিকেট দখলে

নেওয়া কঠিন কিছুই নয়। অনেক বছর ধরেই এর চর্চা চলছে। সকল ক্ষেত্রেই অযোগ্যতা, অন্যায় রাজনীতির দুর্গন্ধে ন্যায় হয়ে যাচ্ছে। আমার অভিযোগ বে-নজিরের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যত্যয় নিয়ে। এর সাথে যারা জড়িত তাদের কী হবে? এদেশের শিক্ষার মান কেন কমেছে এবং কারা কমিয়েছে এতে পরিস্কার বোঝা য়ায়। এর জন্য দায়ি দুর্গন্ধযুক্ত রাজনীতি ও দুর্গন্ধে আক্রান্ত সম্মানীত শিক্ষক নামধারী দুর্নীতিবাজরা। আরো বোঝা যায়, ভবিষ্যতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন মর্যাদাহানীর বিষয়ে কেউ টু শব্দটিও করবে না। দুর্গন্ধে পরিবেশ দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ও রাজনীতির অনন্য পচা দুর্গন্ধে সংশ্লিষ্ট সবার নাকে রুমাল তুলে দিল। বে-নজির নজির স্থাপন করলেন। এদেশে এমন নজির আর কেউ রাখার কথা নয়। জানি না পত্রিকাগুলো একটু বেহায়ার মতো বাড়িয়ে বাড়িয়ে লেখে কি-না। নইলে ভেতরে ভেতরে এত কিছু হয়ে যায়, তা কোনো কাক-পক্ষি, এমন কি সরকারের অসংখ্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ জানতেই পারে না। বড় আশ্চার্যের ব্যাপার! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্নীতিবাজ পালিয়ে যাবার পর সবাই একটু বেশি বেশি তৎপর হয়ে ওঠে। এর মোজেজা কী? দেখায়, 'হাম বড়া বীর হ্যায়, যুদ্ধ কবে? আগামীকাল। হাম যায়েগা পরশু'। এসব বিভাগও রাজনীতির সংস্পর্শে এসে কি পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে না?

এই ঈদে ইফাত নামের এক অনভিজ্ঞ-আনাড়ি ছেলে 'ছাগলকান্ড' ঘটিয়ে দেশ ও বাপের কুল মজালো। 'নেই কাজ, তো খই ভাজ'। অপ্রয়োজনে ঈদের দামি খই ভাজতে গিয়ে ছেলে ধরা খাইয়ে দিল বে-নজিরের সম্পদকেও হার-মানানো চৌকস এনবিআর-এর যোগ্য অফিসার ইফাতের বাপ মতিউর রহমানকে। বেরসিক সাংবাদিকের কেউ বলছেন, এটা নাকি দু-পক্ষের স্ত্রী-সন্তানদের পারিবারিক কোন্দলের কারণে মতিউর রহমান সাহেবের কপাল পুড়েছে। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য। এদেশে কত লাখ লাখ মতিউর রহমান সরকারি অফিসার হয়ে দুর্গন্ধযুক্ত রাজনীতির সুবাদে সম্পদের সাগরে ভেসে জলকেলি করছে। তারা বিনা বাধায় বহাল তবিয়তে করে-কম্মে খাচ্ছে। অথচ এক মতিউরের এ কী দশা! 'স্টার ফেভার' না করলে যে দশা হয়, এক্ষেত্রেও তা-ই। এক্ষেত্রেও হয়তো ছেলে, বউ ও তাকে দেশ থেকে পালিয়ে বাঁচতে হবে। সকল অপরাধীদের নিদেনপক্ষে একটা পথ আবিস্কৃত হয়েছে, দেশ থেকে পালিয়ে বাঁচা। দুর্গন্ধযুক্ত রাজনীতির মদদপুষ্ট সংশ্লিষ্ট সিপাহসালারা অন্তত দেশবাসীকে লোক-দেখানো শান্তনা দিতে পারেন এই বলে যে, 'এদেশের আইন কাকে বলে তোমাকে দেখিয়ে দিতাম, ভাগ্যিস ব্যাটা তুমি পালিয়ে বেঁচেছো'। মতিউরও ভাগ্যের ওপর ভরসা করে আফসোস

করেন, "কেন যে আদরের ছেলেটার নাম ইফাত রাখলাম, যার অর্থ ইন্টারনেট ঘেটে দেখি 'বিপদ', 'মসিবত'। ছেলেটাই যত মসিবতের মূল, কুলাঙ্গার।" হায় রে কপাল! 'ও রে তুই কালা তোর নামটি কালা-আ, ঘটালি প্রাণ-জঞ্জালা কালা রে তুই কালা-আ-আ, কি আর বলবো কালা, ঘটালি প্রাণ-জঞ্জালা।'

মতিউর রহমান ছেলেকে যতই দোষারোপ করুক না কেন, আমাদের কথা ভিন্ন। সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক নূরুল হুদা বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'এই দুর্নীতি বন্ধের দায়িত্ব প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নির্বাহীদের ওপর বর্তায়। কোনো কারণে তারা শৈথিল্য দেখাচ্ছে বলেই বাহিনীর যারা দুনীতি ও অপকর্ম করছে তারা পার পেয়ে যাচ্ছে।' আমরাও তা-ই বলি, "মন আমার রাজনীতির 'ঘরি, যতন করি কোন মেস্তরি বানাইয়াছে, একবার চাবি মাইরা দিছে ছাইরা জনম ভইরা ঘুরতা-আ-ছে'।" কোনো পরিবর্তন নেই, নীতিমালা নেই, পরিবর্তন করার ইচ্ছেও নেই।

যে রাজনীতি খুঁজে খুঁজে এমপি আনার গংদের মনোনয়ন দেয়; তাদেরকে দিয়ে আইন বানিয়ে দেশ চালায়। বে-নজিরগংকে নীতি ও আইনের শাসনের সারথি ও নজির বানায়, আমরা সে অপরাজনীতিকে কি মাটিচাঁপা দিতে পারিনে? বিকট বিশ্রী গন্ধে যে সাধারণ মানুষের দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়ে গেছে। মুক্তির পথ কি খুবই কঠিন? উপায় কি বলুন তো?

(প্রকাশ: ১ জুলাই ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা- সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

প্রকৃতির প্রতিশোধ বড্ড নির্মম

প্রকৃতি কীভাবে তৈরি হয়েছে, এর ব্যাখ্যা দেওয়া এখানে অযৌক্তিক। সচেতন মানুষ সবাই বোঝেন। কিন্তু প্রকৃতিরও যে একটা প্রতিশোধ আছে এটা বুঝতে আমরা অনেকেই উদাসীনতা দেখাই। যদিও এর প্রতিশোধ থেকে নিস্তার পাওয়া অতটা সহজ নয়। আমাদের অজান্তে প্রকৃতি তার কাজ নীরবে করে যায়। একজন মহান নেতার এক সুপুত্র ছিল। বাপ-মা তাকে খুব আদর করতেন। সুপুত্র বলছি এই কারণে যে, জীবনের প্রারম্ভেই সে জীবনের সব রকমের স্বাদ উপভোগ করতো। উচ্ছৃঙ্খলতা, মস্তানি, খুন ও বোতল ফুস পর্যন্ত। একদিন সে মাতাল অবস্থায় বন্ধুদের নিয়ে মহাসড়কে গাড়ি চলাতে গিয়েছিল। পথের সোজা রাস্তা তার চোখে বাঁকা মনে হচ্ছিল। গাড়িটা সোজাভাবে চালাতে গিয়ে রাস্তার পাশের গাছের সাথে প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা লাগে। বন্ধুরাসহ সুপুত্রের সেখানেই জীবন মঞ্চের যবনিকাপাত ঘটে। এমন ঘটনাকে আমরা প্রকৃতির প্রতিশোধ বলতে পারি; যাকে বলে বিনা মেঘে বজ্রপাত। দোষটা কার– সুপুত্র চালকের, বখাটে বন্ধুদের, বাঁকা রাস্তার, বাপের দেওয়া দামি গাড়ির? বাবা কাউকে এজন্য দায়ী করতে পারেননি। একটাই শান্তনা 'আল্লাহর মাল আল্লাহই নিয়ে গেছে'। এমনই লাখ লাখ ঘটনা আমাদের অজান্তে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে, আমাদের একটুও ভেবে দেখার সময় নেই। 'আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন'– একটা নিদান শান্তনা। কিন্তু আমরা প্রকৃতির অনুকূলে কাজ করে কি প্রকৃতির এমন নির্দয় দহন থেকে বাঁচতে পারি না? মুখে স্বীকার করি আর না করি, আগুনে হাত দিলে হাত তো পুড়বেই। এটাও তো প্রকৃতির প্রতিশোধ।

প্রায় দশ দিন হতে চললো পত্রিকার উদ্দেশে কলম ধরিনি। ভেবেছিলাম, ছাত্রছাত্রীদের কোটা আন্দোলনটা শেষ হোক, তারপর লিখবো। এ বিবাদটা তাড়াতাড়ি শেষ হবার কথা ছিল, তা হয়নি। জানি, বিষয়টা পুরোপুরি সরকারের হাতে, যদিও তা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। ২০১৮ সালে সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী 'কোনো কোটাই আর থাকবে না'– সম্ভবত এমন ভাষায় কথাটা বলেছিলেন, তখনই তার বলার ভঙ্গি শুনেই বুঝেছিলাম, আজ হোক আর কাল হোক ঝামেলা একটা আসতে বাধ্য। সে ঝামেলা এখন শুরু হয়েছে। বিষয়টা যৌক্তিক মিমাংসা কঠিন কিছু নয়। জেদাজেদি করলেই যত সমস্যা। তেপ্পান্ন বছর হয়ে গেছে দেশ স্বাধীন হয়েছে। কোটা পদ্ধতি পুনর্বিবেচনা এখন সময়ের দাবি। এটাকে কেউ উঠিয়ে দিতে চায় না, উঠিয়ে দেওয়া ঠিকও নয়। তবে সংশোধনযোগ্য। আশা করি সরকার অল্পে সংযত হবে। দুর্মুখেরা বলছেন, সরকার

এ আন্দোলনকে চাঙা করে অন্য দিকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে নিতে চাচ্ছে। মাস্টার মানুষ, এত রাজনৈতিক বুদ্ধি ও কৌশল আমার মাথায় ধরে না; যা বুঝি সোজাসুজি বুঝি। এখানেই রাজনীতিকদের সাথে আমার চিন্তার পার্থক্য। একজন যশস্বী সাংবাদিককে লিখতে দেখেছিলাম, 'গুলি মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে'। আমাদের মগজটা জটিল রোগে ভুগছে। আরেকটা কারণে এ ক'দিন লিখিনি। মূলত লেখায় খেই হারিয়ে ফেলছিলাম; কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা লিখবো। আমার জীবনের মতো দেশের ভাগ্যটা তো সব দিক দিয়ে ক্রমেই গুটিয়ে আসছে। ভেতরের চোখে দেখতে পাচ্ছি; যাকে বলে, 'সর্ব গায়ে ব্যথা'। শুধু কথায় কতক্ষণ আর চিড়ে ভেজানো যায়! প্রকৃতির দহন থেকে তো বাঁচানো যায় না। কারণ এ তো প্রকৃতির প্রতিশোধ!

আসলেই এদেশের সমীকরণ বড্ড জটিল। এতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি ও দুর্দশার শেষ নেই। বুদ্ধি হচ্ছে দেশে বসে, এমপি আনারের মাংস যাচ্ছে কোলকাতার সেপটিক-ট্যাংকে। হত্যাকাণ্ড ও কৃতকর্মের মতোই মাংস-টুকরোগুলো দুর্গন্ধে ভরা। এ দুর্গন্ধ শুধু এমপি আনারের পচা মাংসের নয়, তিনবার 'জনপ্রিয় বলে মনোনীত' জনপ্রতিনিধির সোনা-চোরাচালান, হুন্ডি ব্যবসা, মাদক-ব্যবসা ও রাজনৈতিক ব্যবসার পচা দুর্গন্ধ। কীভাবে কীসের জোরে তিনি রাজনৈতিক বড় কর্তাদের চোখে জনপ্রিয় হয়ে মনোনীত হয়েছিলেন, অনেক দুর্মুখকে আমার চোখের সামনে সত্য বলতে শুনেছি। এদেশে এটা ওপেন-সিক্রেট। মনে হয়, এক 'এমপি আনারকান্ড' এদেশের মহান রাজনীতিকদের মুখোশ ও স্বরূপ অনেকটাই উন্মোচন করে দিয়ে গেছে। এটাও প্রকৃতির প্রতিশোধ। আমাদের ভেবে দেখার সময় নেই, কিংবা আমরা ইচ্ছে করেই 'কাণ্ডটাকে' এড়িয়ে যাচ্ছি। আরেকটা বিষয় এখানে প্রণিধানযোগ্য– এদেশে সব ধরনের অন্যায়, দুর্নীতি, প্রতারণা, কোষাগার লুণ্ঠন ইত্যাদি অপকর্ম করে রাজনীতির ছায়াতল বা নামকীর্তন ছাড়া পার পাওয়া পুরোপুরি অসম্ভব। সেজন্যই রাজনীতির বাজারে এত নেতা-সমাগম, এত ভিড়। 'কালা জাহাঙ্গীর', 'মুরগি মিলন' গংও পরিণামে এমপি হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। প্রকৃত রাজনীতিকদের বাজার মন্দাভাব। বেশ কবছর আগে টিআইবি এদেশের শতকরা কতভাগ এমপি দুর্নীতিতে নিমজ্জিত তার ফিরিস্তি দিয়েছিল। শুধু এমপি ছাড়াও লাখ লাখ নন-এমপি নেতাও তো এদেশে দুর্দম প্রতাপে যত অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু এমপিরাইবা দোষের ভাগি হতে যাবেন কেন? অনেকদিন টিআইবি এ বিষয়ে চুপ। হয়তো দুর্নীতি ও লুটপাটের লোম বাছতে গেলে প্রতিটা সেক্টর, বিভাগ, প্রতিষ্ঠান ও অতি সম্মানীত বলে খ্যাত মহারথীদের কম্বল উজাড় হয়ে যাবে। এতদিনে হয়তো

দুর্নীতি আরো শতগুণ বেড়ে গেছে। জরিপ না হলেও আমাদের মুক্ত-চোখ তো এখনো জীবিত আছে। দুর্নীতি এখন আরো ডালপালা প্রসারিত করে ফুলে-ফলে চোখ ধাঁধানো পূর্ণরূপ ধারণ করেছে। এ নিয়ে আমাদের উদ্বেগ ভুলে যাওয়া অধ্যায়ের মতো অনেক কম। কোটা সিস্টেম নিয়ে আন্দোলন হয়, ক্ষমতায় বসার জন্য আন্দোলন হয়, কিন্তু শিক্ষার মান বাড়ানো নিয়ে সামাজিক আন্দোলন হয় না, আরো শত শত দুর্গন্ধযুক্ত কিছু নিয়ে টু শব্দটিও হয় না। বানের পানির মতো– যেখানে বাড়ে, সেখানেই আস্তে আস্তে আবার স্তিমিত হয়ে শুকিয়ে যায়, অথবা বঙ্গোপসাগরের দিকে ক্রমে সরে পড়ে।

অনেকবার 'বালিশকাণ্ড' নিয়ে এ কলামে লিখেছি, কোনো প্রতিকার হয়নি, বরং নানাবিধ এমন 'কাণ্ডের' প্রসার ও নির্বিঘ্ন বিস্তার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আমরা নিশ্চুপ। রূপপুরের 'বালিশকাণ্ড' দেশব্যাপী স্বরূপে 'ছাগলকাণ্ডে' পর্যবসিত হয়েছে। দু'মুখ খোলা বস্তার মতো করের অর্থকড়ি জনকোষাগারে কেন দাঁড়াতে চায় না, তার হেতু প্রকৃতির প্রতিশোধ হিসেবে সবার সামনে উন্মীলিত হচ্ছে। ঐ বিভাগের অজস্র 'ছাগলকাণ্ডের' হদিস খোঁজার কারবা এমন দায় পড়েছে! আমরা বারবার একটা কথা বলেই খালাস, 'আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে'। ব্যস, দায়িত্ব শেষ। এদেশে শুধু 'ছাগলকাণ্ড' কেন, কত 'হাতি- ঘোড়াকাণ্ড' তল হয়ে গেল আর 'সামান্য ছাগলকাণ্ড' জল মাপতে এসেছে। 'ছাগলকাণ্ড' নিছক অজুহাত মাত্র। এক নালায়েক ছেলে অদূরদর্শিতাবশত 'মতিয়ার রহমান গংকে' প্রকৃতির প্রতিশোধ হিসেবে জানান দিয়েছে। এতেও যদি আমাদের চৈতন্যোদয় না হয়, প্রকৃতিইবা আর কী করতে পারে বলুন? এতে আমরা হয়তো গলার স্বরটাকে একটু ভারী করে বলতে পারি 'কোনো ধরনের দুর্নীতি বরদাশত করা হবে না'। ব্যস, ঐ পর্যন্তই। অন্য কোনো বক্তব্য আমাদের আর থাকার কথা নয়। কত মতিউর রহমান এলো-গেল, দেশ লুট, ব্যাংক লুট, কোষাগার লুট করলো, এ আর তেমন কি! 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক'। আমাদের কাজ ও চিন্তা যখন মুখসর্বস্ব হয়ে যায়, তখন এমন দশাই হয়।

পুলিশ বিভাগের এক বেনজীর সম্পদ লুট করে পালিয়েছে, তো তাতে কী হয়েছে? শত বেনজীর সে পদ ও আদর্শ পূরণ করার জন্য খাড়া হয়ে আছে। প্রকৃতি ছাড়া সে দশা খুঁজে পাবার মানুষ এদেশে বিরল। সে-জন্য আমরাও প্রকৃতির ওপর ভরসা করে বেঁচে থাকি। আবার বেনজীর তো শুধু নিজ কুলকেই নাশ করে সরে পড়েনি, শিক্ষার পাদপীঠ ও জাতির গর্ব বিশ্ববিদ্যালয় নামের গৌরবকেও কলঙ্কিত করে মজিয়ে ছেড়েছে, যে উপসর্গ ও ঘটনা এ কলামেই আগে লিখেছি। অবশেষে প্রকৃতি

এর প্রতিশোধ নিতে বাধ্য হয়েছে। ঐ কুলের আরো অনেক কুলনাশার নাম পত্রিকায় ভেসে আসছে, সময় হলে কিছু জানা যাবে; বাকিটা এদেশের স্বাভাবিক ক্ষমতার দাপটেই চাপা পড়ে যাবে।

এছাড়া সব পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের খবর এতদিনে পড়তে পড়তে অবশেষে বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের খবরও পত্রিকায় পড়তে হচ্ছে। টাকা কীভাবে কত কার কার কাছে গেছে সব বেরিয়ে আসছে। ধৈর্য্য আর কতক্ষণইবা ধরে রাখা যায়। সরকারি পেনশন বাতিলের কারণে সৃষ্ট জটিলতায় ভোগা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আন্দোলনের ফিরিস্তি ও সম্ভাব্য সমাধানের কথা আজ নাইবা বললাম। মরার আগে এক জনমে আর কী কী দেখার বাকি আছে, তার ফর্দ তৈরি করতে বসব ভাবছি। একজনমে এত কিছু দেখা– এটাও একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার।

যুগান্তরে (১৩/৭/২৪) পড়লাম, 'ডলার আয় উদ্বৃত্ত থেকে ঘাটতিতে'। সংবাদে লেখা, 'রপ্তানি আয়ের তথ্য সংশোধনের ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার আয় কমে গেছে। এর মধ্যে আগে রপ্তানি আয় প্রবৃদ্ধি ছিল, এখন তা নেতিবাচক।...বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক হিসাব ও চলতি হিসাব আগে থেকেই ঘাটতিতে ছিল, এখন ঐ ঘাটতি আরোও বেড়েছে। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির হালনাগাদ তথ্য নিয়ে বৃহস্পতিবার প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।'

আমি গ্রামের মানুষ হিসেবে ছোটবেলা থেকে ঋণ করে ঘি খাওয়ার বদভ্যাসের কথা শুনে আসছি। দেশীয় পর্যায়ে ঘি এর ব্যবহার কম। আমাদের ঋণের টাকা অনেকটাই 'বালিশকাণ্ডের' মতো বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন পর্যায়ে সিস্টেম-লসে খেয়ে যায়, অধিকাংশ বিদেশে পাচার হয়। দেশে থাকলে সাদা হোক, কালো হোক, ধনী-গরিবের ব্যবধান বাড়লেও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সেখানকার উচ্ছিষ্ট খেয়ে কিছুটা হলেও টিকে থাকতো। বিদেশে পাচার করাতে তাও হবার নয়। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহল চিন্তিত বলেও মনে হয় না। প্রয়োজনে ঘাটতি পূরণে অন্যের কাছে হাত পেতে ঋণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াকে শ্রেয় মনে করে।

জীবনের এই বেলাশেষে এসে এই সুজলা-সুফলা দেশের বিবর্ণ ও করুণ দশা দেখে বিরান প্রান্তরে বসে ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে করে। তাতেও কি শেষ রক্ষা হবে? এতেও কি প্রকৃতির প্রতিশোধ থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে? এই ছোট্ট একটা দেশ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা কি এতই কঠিন?

আমি আমাদের পাশের গ্রামের রহম পাগলার গল্পটা অনেকবার অনেক জায়গায় লিখেছি। আরেকবার বলি: সে বাজারের এক মেয়ের সাথে ঘর বাঁধতে গিয়ে প্রতারিত হয়ে তার 'মাথা খারাপ' হয়ে যায়। নিজের চলার পথের দিকে একনিবিষ্টে তাকিয়ে, মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে অনবরত একটা গানই অনুচ্চস্বরে গেয়ে পথ চলতো সে, 'আমি যা চেলাম তা পেলাম কই, তুমি কেন মজালে সই বাজারে এনে।' এখন গ্রামে যাওয়া হয় না বললেই চলে। সেই রহম পাগলা বেঁচে আছে, কি নেই– অনেক বছর খোঁজ রাখা হয়নি। ইচ্ছে হয় রহম পাগলাকে দিয়ে গানটা দেশব্যাপী পথে পথে গেয়ে শুনাতে।

(প্রকাশ: ১৭ জুলাই ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ, এফসিএমএ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ।
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

ক্যান্সার চিকিৎসায় প্যারাসিটামলের ব্যবহার!

কয়েকদিন থেকে মাথার মধ্যে এত প্রসঙ্গ গিজগিজ করছে যে, নির্দিষ্ট কোন বিষয় নিয়ে লিখবো স্থির করতে পারছিলাম না। এর মধ্য থেকেই আপাতত একটাকে বেছে নিলাম। গত ২৬ জুলাইয়ের লেখায় শিরোনাম দিয়েছিলাম 'দেশ শুচিশুদ্ধ হয়ে উঠুক'। সেখানে কেন আজ এ দশা তা প্রকাশ করেছি। শুচিশুদ্ধ তো আপনা-আপনি হয়ে ওঠে না, এটা প্রকৃতির নিয়ম। তাই একটা অবলম্বন আমাদের দরকার। এই অবলম্বন লেখার আগে একটু ভনিতা করি। তার আগের লেখার শিরোনাম দিয়েছিলাম 'প্রকৃতির প্রতিশোধ বড্ড নির্মম'। সেখানেও ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখেছিলাম, আমাদের যে কর্মকান্ড ও 'খুঁটোর জোরে পাঁঠা কোঁদে' অবস্থা, প্রকৃতিগতভাবেই এর পরিণতি খারাপের দিকে যাবে। দুটো লেখাতেই আমি দেশব্যাপী সীমাহীন দুর্নীতি, রাজনীতিতে বিভিন্ন সুবিধাবাদী ও ছদ্মবেশী দুরাচার-দুর্জনদের অনুপ্রবেশ, রাজনীতিকদের হাত থেকে রাজনীতি সন্ত্রাসীদের হাতে চলে যাওয়া, আইনের অপপ্রয়োগ বা দ্বৈতমানের প্রয়োগ, লোক-দেখানো আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া ইত্যাদিকে দায়ী করেছিলাম। রোগের এত ডায়গোনোসিস করার পরেও উপযুক্ত ব্যবস্থাপত্র হচ্ছে না। মরণঘাতি রোগে আক্রান্ত রোগীর রোগ নিরাময়ে শুধু শান্ত্বনা বাবদ প্যারাসিটামল থেরাপি চর্চা চলছে। একটা গা-ছাড়া ভাব চলে এসেছে, সেজন্য এ অবস্থা। অনেক খারাপ সত্য কথা লিখি, তবুও সংশ্লিষ্ট পক্ষ গুরুত্ব দেয় না। তাই প্রকৃতির প্রতিশোধ চলছে। দিন যত যেতে থাকবে রোগীর অবস্থা তত খারাপ হতে বাধ্য হবে– এটা আমার মতো ক্ষুদ্র মাস্টার সাহেবের ভবিষ্যৎ কথন।

আমি কোনো দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেশকে বিবেচনা করিনে; কোনো দলের পক্ষে সাফাইও গাইনে। দেশের মানুষের মন-মানসিকতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবনতিশীল অবস্থা, সরকারি কর্মকর্তা ও রাজনীতিকদের দুর্নীতি ও অপকর্ম, দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশ, নৈতিকতাহীন ও মুখসর্বস্ব বচন ইত্যাদির ওপর ভর করে ভবিষ্যৎকে অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে দেখি। যা বলি খোলামেলা বলি। আমার সামনেই দেশ স্বাধীন হয়েছে, চোখের সামনেই নেতারা কথা দিয়েছিলেন, স্বাধীনতার ঘোষণায় কি কি উদ্দেশ্য লেখা ছিল আমার জানা, তারা বর্তমানে কোন দলে থেকে কি বলছেন ও কি করছেন প্রায় সবই আমার নখদর্পণে। মাঝখানে বয়স বাড়তে বাড়তে এক পা কবরে চলে গেছে। স্বাধীনতার পর থেকে কোনো রাজনীতির রং গায়ে মাখিনি। ফলে কোনো রাজনৈতিক দলের ধুয়োজারি শুনে কারো প্রতি আস্থা আনতে দ্বিধান্বিত হই। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যারা বিভিন্ন ভূমিকায় মুখস্তপাঠ

সশব্দে আউড়িয়ে যাচ্ছেন– ভালো হোক, মন্দ হোক প্রায় সবাইকেই আসলরূপে আমার চেনা। অসুবিধা একটাই– উচিৎ কথায় খালু বেজার হয়, এদেশে জীবনের ঝুঁকি বাড়ে, পত্রিকার সম্পাদক তার পত্রিকার ভবিষ্যৎ ভেবে অনেক কথা ছাপাতে চান না, অসংখ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারি পত্রিকার ওপর নির্ভর করে জীবন পাড়ি দিচ্ছেন, এগুলো বুঝি। কিন্তু কিছু সত্য কথা ও উপযুক্ত সাজেশন না দিয়েও তো থাকতে পারিনে। কারণ এক পা থেকে দুই পা কবরে নেমে গেলেই তো যত চিন্তা-ভাবনা, দেশের জন্য করণীয় সব মাটিতে খেয়ে যাবে, অথচ এদেশ আমাকে প্রচুর টাকা খরচ করে লেখাপড়া শিখিয়েছে। আমি দেশের জন্য কী করতে পেরেছি! অনেকেই জানেন, আমি সাধারণত দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজের মানুষ ও রাজনীতিকদের মন-মানসিকতা ও দেশের দশা, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি নিয়ে লেখালেখি করি। কোনো দল থেকে সুবিধা নেওয়ার জন্য তোষামোদ করে কিছু লিখিনে। ইচ্ছে করে একটা পত্রিকাতেই নিয়মিত লিখি।

গত ১৬ জুলাই থেকে কয়েকদিনে যা ঘটলো, এটা কেউ অস্বীকার করবে জানি, কিন্তু মৃতের সংখ্যা গণহত্যার পর্যায়ে চলে গেছে। অগণিত লাশ গায়েব হয়ে গেছে। মৃত ও আহতদের সঠিক হিসাব হয়তো কোনোদিনই পাওয়া যাবে না। একটা সাইকোলজিক্যাল কথা বলি। যে সত্য কথাগুলো আমি আমার সহকর্মী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অকপটে বলি; দেখেছি, তারা সেটা পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না। ঢাকার বিভিন্ন সমাজে অকপটে সত্য কথা বলে দেখেছি, ঠিক একই অবস্থা সেখানেও, মাথার কিরে দিলেও বিশ্বাস করে না। গ্রামের বাড়িতে গিয়েও কমপক্ষে ছয় গ্রামের লোক জড়ো করে সত্য কথা বলে দেখেছি, অধিকাংশ লোক শিক্ষকের কথাও বিশ্বাস করে না। দেশে এ অবস্থা হলো কেন? এ বিষয়টা নিয়ে অনেক ভেবেছি। দেখলাম, দোষ ওদের না। এদেশের রাজনীতিকরা ডাহা মিথ্যা, এমন কি এঁড়ে গরুকেও গর্ভবতী বলে বানিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মানুষের বিশ্বাসকে এমন নিম্ন পর্যায়ে এনেছে যে, মানুষ কথা বিশ্বাস করবে কেন! ভাঁওতাবাজিরও তো একটা সীমাপরিসীমা থাকে! এ আন্দোলনে ক্ষমতাসীন দলের লোক যেভাবে আমার জানা অবস্থায় নির্জলা মিথ্যা কথা বলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাচ্ছেন, নিজেদের মধ্যেই একজনের কথার বৈপরীত্য আরেকজনের কথায় প্রকাশ পাচ্ছে। এছাড়া প্রত্যেক মানুষই তো চোখ দিয়ে দেখে, ভাত খায়, সে বিবেচনা শক্তিটুকুও তো তাদের আছে। এতেই বলতে হয়, 'চাঁদের গায়ে দাগ লেগেছে, আমরা ভেবে করবো কী, চাঁদের গায়ে ...'। সেজন্য আমার আন্তরিক সত্য কথাইবা অন্যরা বিশ্বাস করবে কেন? এ সমাজে আমি একজন অযোগ্য শিক্ষক, রাজনীতিকদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত মিথ্যা শুনতে শুনতে, যার কথার ওপর অধিকাংশ লোক

আস্থা রাখে না। এটা কার দোষ? এমন সমাজ কি চলতে পারে? এদেশে রাজনীতির নামে ডাহা মিথ্যা, ভাঁওতাবাজি ও প্রতারণার ব্যবসা বেশি শুরু হয়েছে।

আমাদের সমাজ থেকে আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ শব্দগুলো পুরোটাই উঠে গেছে। এতে কি আমরা লাভবান হচ্ছি? দেশটা সব দিক থেকে রসাতলে যাচ্ছে। অন্যের দোষ খোঁজার আগে নিজের দোষ আমরা কি খুঁজে দেখছি? সবাই আমরা অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ে নিজেদের ধোয়া তুলসীপাতা বলে দাবি করি। আমরা সাধু হই না, সাধু সাজার প্রতিযোগিতায় নামি। সাধারণ মানুষ কিন্তু আমাকে কোটি কোটি চোখ দিয়ে দেখছে, এটা ভুলে যায়। স্বাধীনতার পর থেকে কোনো আন্দোলনে সাধারণ মানুষের এত সম্পৃক্ততা আমি আর দেখিনি। এরও কারণ আছে, গত লেখাতে পরিস্কার করে লিখেছি। রাজনীতিবিদসহ এদেশের প্রত্যেক সচেতন নাগরিকের অনেক ভাবনার খোরাক এর মধ্যে রয়ে গেছে। ক্ষমতাসীন দল তো বহিরাগত কেউ নয়, তারা তাদের ভাইয়ের প্রতি এত নির্দয় হয় কী করে? তাদের নেতারা দাম্ভিকতা দেখিয়ে ও বেফাঁস কথা বলে এ অবস্থার সৃষ্টি করলো। এর পরিণতি আরো জানমালের ক্ষয় এবং সম্প্রসারণবাদীর কালো হাত হতে পারে। কাঙালের কথা বাসি হলে ফলে। বিকল্প যে নেই তা বলছিনে। কিন্তু শুভবুদ্ধির উদয় কি এত সহজে হবে? আমি জানি বিরোধী কোনো পক্ষের কাছে ক্ষমতা গেলেও বেশ কয়েকটা কারণে দেশ ভালো চলবে না। তাহলে করণীয় কী? প্রফেসর ড. ইউনুস আমার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে দেশের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে সহযোগিতা চেয়ে চিঠি লিখে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে তিনি যে নির্বাচনের কথা বলেছেন, নির্বাচনে যতই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আসুক, দেশ ভালো চলবে না। নব্বইয়ের আন্দোলনে 'গণতন্ত্রের মুক্তির' আশার কথা অনেক লেখক ও সাংবাদিক আমাদের শুনিয়েছিলেন। আমি বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু চুপ থাকতাম। কারো প্রতি বিরোধীতা না করেই কারণগুলো বারান্তরে বিস্তারিত বলবো।

আগে দরকার রাজনীতিকদের কোড অব এথিক্স ও জবাবদিহিতা সুনিশ্চিত করা। এর জন্য সংবিধান পরিবর্তন করা; গণভোটের আয়োজন করা। সংবিধানের আরো অনেক পরিবর্তন করতে হবে। পদ ও দায়িত্ব পালন নিয়ে অনেক অনেক পরিবর্তন আনতে হবে, যদি আমরা দেশের উন্নতি চাই এবং এ অরাজক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চাই। করণীয় নিয়ে এর আগেও এই কলামেই একবার লিখেছিলাম। আবারও লেখার প্রয়োজন পড়ছে। আমি নিশ্চিত যে, এদেশের কোনো রাজনৈতিক দলেরই হয়তো এ বোধোদয় কখনোই হবে না। পরিবর্তন আনতে হলে তৃতীয়

পক্ষের কোনো টিম বা দলনিরপেক্ষ কোনো দায়িত্বশীল টিম এগুলো করতে পারে। অনেক কাজ বাকি পড়ে গেছে। দেশটাকে আবার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসা, সাধারণ মানুষকে অভ্যস্ত করানো, সামাজিক পরিবেশ উন্নত করা, শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি করা, দুর্নীতির যতটা সম্ভব মূলোচ্ছেদ করা, সুশিক্ষিত লোকদের সামাজিক কাজ ও রাজনৈতিক অঙ্গনে ফিরিয়ে নিয়ে আসা, দেশের অর্থনীতির ভিত মজবুত করা, সোস্যাল টাউটদের দূরে রাখা; দুর্বৃত্ত ও দুর্নীতিবাজ, খুনি, লুটেরাদের বিচার করা, জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করা ইত্যাদি অনেক কাজই রয়ে গেছে। দেশের অনেক বিভাগকে পুনর্গঠন করা দরকার। সবকিছু মগজে ধরে রেখেছি, অনেককিছুই পত্রিকার পাতায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। দেশের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা একান্ত জরুরি। শত শত কোটি টাকা খরচ করে বিভিন্ন পরিকল্পনা করা হয়, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কিন্তু বাস্তবায়নে গিয়ে ফেল মারে সরকার । সব নিজের চোখেই দেখি। নিজের কথা বেশি প্রকাশ করতে চাইনে। করণীয় চোখের সামনে ভাসছে। আমি একজন 'পেশাদার ম্যানেজমেন্ট হিসাববিজ্ঞানী' হিসাবে স্ট্যাটেজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা নিশ্চিতকরণই আমার কাজ ও গবেষণা। অথচ এদেশের অবস্থা দেখলে আমি খুব কষ্ট পাই, কখনো দুশ্চিন্তা করি। এতটুকু একটা সুজলা-সুফলা দেশ। শুধু বিশাল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে পারলেই দেশের উন্নতি অনিবার্য। শুধু রাজনীতিকদের বিকৃত মানসিকতা, প্রভুভক্তি, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থপরতা, দুর্নীতি, ডাহা মিথ্যাচারিতা, অমানুষসুলভ আচর-আচরণ ইত্যাদি অসংখ্য দোষবাচক বৈশিষ্ট্য এদেশকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। প্রকৃতিসৃষ্ট বিপর্যয় হলে মানুষের কিছু করণীয় থাকে না। কিন্তু রাজনীতিকসৃষ্ট বিপর্যয়ে আপনি কাকে দোষ দেবেন? অদৃষ্টকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আবার দেশের সবাইকে দোষ দিয়েও কোনো লাভ নেই। এদেশে যাদের করার ও দেশকে দেবার অনেক কিছু আছে, তাদের কোনো ক্ষমতা নেই। আবার যাদের কিছুই দেবার নেই, অশিক্ষিত, দুর্নীতিবাজ, লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান, দিনে-দুপুরে যে কোনো অন্যায় করে হজম করে ফেলতে পারে, খুবই ক্ষমতাধর, তারাই এদেশের কৃতি সন্তান, সমস্ত গুণগান তাদের প্রাপ্য। বিগত ছাত্র আন্দোলনেও তাই নিজ চোখে দেখলাম। আগেও হাজার হাজার বার দেখেছি। এবার একটু বেশি দেখলাম। লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধানের হুঙ্কারে আমার নিজের ছাত্র এবং আমার ছাত্রদের অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে রামদা, চাপাতি বাহিনীর হাতে প্রাণ দিতে ও নিগৃহীত হতে দেখলাম। আরো দেখলাম, জনগণের টাকায় লালিত-পালিত সরকারি বাহিনীকে জনগণের প্রতি গুলি ছুঁড়তে। প্রকাশ্য দিবালোকে চলন্ত

ছবিতে নিজের চোখে দেখলাম। এ কথাগুলো যে কোনো মূল্যে প্রকাশ করতে না পারলে আমি আজীবন বিবেকের কাছে অনুশোচনার পাত্র হয়ে রইবো।

যে যত কথাই বলুক না কেন, আশার বাণী শুনাক না কেন, হুঙ্কার দিয়ে কথা বলুক না কেন, কোনো না কোনো দলের রাজনীতিকদেরই লাভ। জনসাধারণের কোনো লাভ নেই। পদে পদে এদের ক্ষতি। ক্ষমতাসীন দল দেশ, দেশের জনগণ ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জেদাজেদি বাদ দিয়ে একটা নিরপেক্ষ বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে দেশাত্ববোধের স্বাক্ষর রাখতে পারে। তাহলে সাপও মরে আবার লাঠিও অক্ষুণ্ন থাকে। এটা আমার মতো ক্ষুদ্র এক মাস্টার সাহেবের আবেদন। আমার বিশ্বাস ক্ষমতাসীন দলের অনেক পরিকল্পনা মাথার মধ্যে আছে। তাদের পরিকল্পনা তারাই ভালো বুঝবেন। এদেশে অসংখ্য জ্ঞানী, সুশিক্ষিত ও দলনিরপেক্ষ ব্যক্তি আছেন, যাদের অনেককেই আমি চিনি। ফলে এদেশে এ ধরনের ব্যক্তি নেই, কেউ নিরপেক্ষ নয়, একথা বলে কেউ গা-পাতলা করতে পারবেন না। প্রত্যেকেই এদেশের নাগরিক। অধিকাংশ লোকেরই দেশপ্রেম আছে। নাগরিক অধিকারও সবার আছে। কেউ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে এদেশ লিখে দেননি। এ চৈতন্যবোধ আমাদের যত তাড়াতাড়ি ফেরে, ততই মঙ্গল। ‘কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ, এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার’!

(প্রকাশ: ২ আগষ্ট ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

‘কতদূরে আর নিয়ে যাবে বলো কোথায় পথের প্রান্ত’

ছোটবেলা থেকেই আমার গানের প্রতি আগ্রহ। সব গান নয়, জীবনের গানগুলো, যার ভাষা জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অনেকটাই ভুলে গেছি। মান্না দে-র একটা গান এরকম শুনেছিলাম: ‘কতদূরে আর নিয়ে যাবে বলো কোথায় পথের প্রান্ত, ঠিকানা হারানো চরণের গতি হয়নি কি তবু ক্লান্ত? পিছনের পথে উঠেছে ধূলির ঝড়, সমুখে অন্ধকার, বলো তবে কবে হবে অভিসার, তৃষিত আশারে করো না গো তুমি ভ্রান্ত।’ স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘটনা আমার স্মৃতিতে সমুজ্জল। তখন আমি ছাত্র। উদ্দেশ্য মোটামুটি বুঝতাম, যা আজ ভ্রান্ত হতে চলেছে। যুদ্ধের পর থেকেই আমরা দিক হারিয়ে ফেললাম। মাঝপথে কম-বেশি উত্থান-পতন। বর্তমানে মহান নেতাদের ‘মুখে মধু পেটে বিষ’ খসলতের কারণে ঠিকানা হারানোর পথে। আজ তেপ্পান্ন বছর পর সেই ‘তৃষিত আশা’ মনে হয় ভ্রান্ত হতেই চলেছে। এভাবেই আমার জীবনের পরিসমাপ্তি। প্রশ্ন জাগে, সেই ২০১৮ সাল থেকে কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে এত ঘোরপ্যাচ চলছে, যা তখন ক্ষমতাসীন দলের ভাষা শুনেই বুঝেছিলাম– এটার বাস্তবতা সামনে অনেক ভয়ঙ্কর হবে। এদেশে কথা তো বলা যায় না, বললেই ‘রাজাকার’ অভিধা কপালে জোটে। কারণ আমাদের রাজনীতিকদের ভাষা হচ্ছে, ছোটবেলায় শোনা রাক্ষস-খোক্কসদের গল্পের মতো। রাক্ষস-খোক্কসরা যেদিন অনেক দূরে যেত, সেদিন বলতো রাজবাড়ির আশপাশ থাকবে; আর যেদিন বলতো আশপাশ থাকবে, সেদিন তারা অনেক দূরে যেত। বলে এক, করে আরেক। মুখে এক, অন্তরে আরেক। আমার খারাপ লাগে অন্য কোথাও। এদেশের রাজনীতিকরা অধিকাংশই ডাহা মিথ্যাবাদী, যাদের কথার ওপর আদৌ নির্ভর করা যায় না। এঁড়ে গরুকেও গর্ভবতী বানিয়ে প্রচার করে। এরা দেশের শাশ্বত সামাজিক সংস্কৃতিটাকেই ধ্বংস করে ফেলেছে। যে কোনো সময় জিব সম্পূর্ণ উল্টিয়ে ফেলতে পারে। স্বার্থ উদ্ধারে যে কোনো কথা বলে ফেলতে পারে। লজ্জা-শরম একবিন্দুও নেই, দায়িত্বশীলতার কোনো অস্তিত্ব নেই। কোটি কোটি লোক যে তাদেরকে দেখছে, এদেশে যে ভাত-খাওয়া ও দু-চোখওয়ালা মানুষ অনেক আছে, তা তারা একেবারেই ভুলে যায় অথবা সাধারণ মানুষকে বোকা ভাবে। অন্যভাবে বলা যায়, লাঠিয়াল বাহিনীর নেতরা যা বোঝে, অন্য কেউ আর কিছুই বোঝে না, এমন ভাবে!

যেসব ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে নেমেছে তাদের বয়স বড় জোর পঁচিশ বছর। সর্বনিম্ন বয়স সতেরো। আবার এখন তো স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও নামছে। যাহোক ক্ষমতাসীন দল আজ দীর্ঘদিন, কমপক্ষে ষোল বছর ধরে ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা’

ছাত্রছাত্রীদের মগজের মধ্যে অবিরামভাবে একটানা বিলিবণ্টন করে চলেছে এবং প্রতিটা গণমাধ্যমে, শিক্ষায় ও বচনে তাদের বিরোধী মতামত ও কর্মকাণ্ডকে জাতীয় ও স্বাধীনতার শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে চলেছে। ছাত্রছাত্রীদের এত শিক্ষা দেওয়ার পরও তারা 'রাজাকার' হয়ে থাকলো, এটাই বড় আফসোস! ষোল বছর ধরে রাজাকার নিধন কোনো কাজে লাগছে না কেন? আমি দেখি, শুধু জামাত ও বিএনপির কেন, যে কোনো মানুষের কাঁধে সকল দোষ চাপিয়ে, যে কোনো মানুষকে 'রাজাকার-জঙ্গি' ট্যাগ লাগিয়ে প্রয়োজনে গণমাধ্যমের সাহায্যে 'উলঙ্গ' করেও ক্ষমতা দখলে রাখার ও স্বার্থসিদ্ধির ব্যবস্থা করতে কোনো দ্বিধা করে না। শেষে ছাত্রছাত্রীদের 'রাজাকারের' অভিধায় ভূষিত করতে গিয়েই না প্রকৃতির প্রতিশোধ বর্তমানে মাথায় এসে পড়েছে। ক্ষমতাসীনরা নিজেদের দেশসেবা ও সমাজসেবা কর্ম ভুলে গিয়ে শুধু 'রাজাকার, রাজাকার, জঙ্গি-জঙ্গি' 'খেলা হবে' করেই তো জামাতের জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব এদেশে এতটা বাড়িয়ে ফেললো। আমার কথা মিথ্যা কিনা কোনো সাইকোলজিস্টের মতামত নিয়ে দেখতে পারেন। গতকালও দেখলাম, ক্ষমতাধর একজন 'মহান নেতার' আলোচনায় আবু সাঈদের হত্যাকারি সেই পুলিশ সদস্যকে রাজাকারের ট্যাগ দেওয়ার কসরত চলছে। শুধু তা-ইবা কেন, পুরো আন্দোলনটাকেই বিশ্ববাসীর কাছে 'রাজাকার ও জঙ্গিদের তাণ্ডব' বানিয়ে উপস্থাপনের সেই বারবার করা পুরোনো টেকনিক আবার চাগান দিয়ে ওঠাচ্ছে। যে গরু লোনা মাটি চাটার স্বাদ পেয়ে গেছে, একটু ছাড়া পেলেই লোনা-মাটির সেই মাঠে দৌড়ে চলে যাবে। আমরা অপেক্ষা করছি এবারও একই পুরোনো টেকনিক কতটা বাজারে খায়, সেটা দেখার। ক্ষমতাসীন এই দলটি স্বাধীনতার যুদ্ধ পর্যন্ত ভালো ভূমিকা রেখেছিল। এর পর থেকে তাদের যত অপকর্ম, ধোকাবাজি ও মিথ্যাচার দিয়ে সাধারণ মানুষের বিরাগভাজনে পরিণত হয়।

ক্ষমতাসীনদের আজ এ ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা কেন? কেনইবা সেই কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে দলীয় 'সোনারছেলেদের' লাঠি, চাপাতি, রামদা, কিরিচসহ সাধারণ মানুষের পোষা বেতনভূক অস্ত্রধারী সরকারি বাহিনী পথে নামিয়ে শত শত সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ও মানুষের গুলি করেও ফেরানো যাচ্ছে না? এতে প্রমাণ করে ক্ষমতাসীন দল 'চেতনা, চেতনা'র ধুয়ো তুলে (কেউ বলেন চেতনার ব্যবসা করে) প্রকাশ্য যে যে অপকর্ম দেশব্যাপী চালিয়ে গেছে, প্রতিটা ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষের কিছুই অবিদিত নয়। মানুষ দিনে দিনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। ব্যাংক লুট, সর্বৈব মিথ্যাচার, অব্যবস্থা-অবিচার, দেশব্যাপী দুর্নীতির হোলি খেলা, নির্ভেজাল দলবাজি, দুষ্কৃতিকারীদের দলভূক্তকরণ, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য দেশের

স্বার্থকে বহিঃশক্তির কাছে বিকিয়ে দেওয়া, অফিস-আদালত ও সমাজের প্রতিটা প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণ, 'গুমকাণ্ড' করে বিরোধী মত দমন, প্রকাশ্য নানা অভিনব পন্থায় বারবার গণতন্ত্র চুরি, হাজারে হাজার 'বালিশকাণ্ড', 'ছাগলকাণ্ড', 'বেনজির গংকাণ্ড' 'মতিউর রহমান গংকাণ্ড', এমপি আনার হত্যাকাণ্ড' সীমাহীন দ্রব্যমূল্যদণ্ড– ক'টার কথা বলবো! অসংখ্য এসব 'কাণ্ড' করে জনজীবন অতিষ্ঠ, দেশের কোষাগারশূন্য, দেশটা মগের মুল্লুকে পরিণত হয়েছে। সম্বল বিদেশী ঋণ, ঋণ করে ঘি খাওয়া আর উন্নয়নের বাহানা ও বিজ্ঞাপন, বাকিটা সিস্টেম লস, 'চাটার দল' প্রতিপালন। সবই নির্ভেজাল বাস্তবতা। এ অভিযোগ ও কথাগুলো আমার মতো সাধারণ মাস্টারের মুখে বলা শোভা পায়; অন্য যে কোনো রাজনৈতিক দলের মুখেও শোভা পায় না। আমি তো সেই স্বাধীনতার পর থেকে সব দলকেই দেখে আসছি। কেউ কম, কেউ বেশি, কেউবা অসহনীয় বেশি। সব দলের নৈতিক অবস্থা আমি জানি। এতে আমি খুবই আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি। ভাবি, স্বাধীনতার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শপথ করে বলেছিল কী, আর করছেটা কী! এই তেপ্পান্ন বছর সবকিছুই তো আমার চোখের সামনে ঘটছে। আমি একজন সাধারণ শিক্ষক, সাধারণ মানুষের দলে। আমি এক-চোখা শিক্ষক নই, সবকিছু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দু'চোখ দিয়ে দেখতে চাই। আমি জাতির ভবিষ্যৎকে দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখতে চাই। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের যৌক্তিক দাবির প্রতি আমার সমর্থন থাকাটাই স্বাভাবিক। ছাত্রছাত্রী না থাকলে শিক্ষক থাকে কি করে? ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা নিয়েও 'রাজনীতিকাণ্ড', ছাত্র নামের গুণ্ডা-পাণ্ডা-মস্তান পোষা চলছে। প্রয়োজনবোধে বিরুদ্ধ-মত দমন করতে গর্বভরে কারো পিছনে লেলিয়ে দেওয়া। আবার গান মনে পড়ছে। 'তুমি কতই যে রংগেরই খেলা জানো'।

এ আন্দোলনের প্রথম দিকে তো ইন্টারনেট স্বাভাবিক ছিল। অনেক ঘটনাই চলমান ক্যামেরাতে দেখেছি। তারপর ইন্টারনেট বন্ধ হবার পর প্রায় সব কথাই সরাসরি ফোনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাচ্ছি, বিদেশী সংবাদমাধ্যম থেকে পাচ্ছি। এবার সাধারণ মানুষকে ছাত্রছাত্রীদের সাথে পথে নামতে দেখেছি। ছাত্রছাত্রীদের সাথে সাধারণ মানুষও মরছে। মৃত্যুর সঠিক পরিসংখ্যান দেওয়া হচ্ছে না বলে ধরে নিচ্ছি এটা সীমার বাইরে চলে গেছে। হাসপাতালের রেজিস্টার খাতাও উধাও। এছাড়া এটা তো মূলত গণহত্যা বলে অনেককেই বলতে শুনছি। আমার ধারণা, হেফাজতে ইসলামের শাপলা-চত্ত্বর অবস্থান আন্দোলন জোরপূর্বক গুলির মুখে নস্যাৎ করার সাহস ক্ষমতাসীন দল আগেই দেখিয়েছে। বলা হয়েছিল, তারা লাল রং মেখে রাস্তায় শুয়ে ছিল; মৌলবিরা নিজেরাই বায়তুল মোকাররমের ইসলামি বই ও কোরআনশরীফ পুড়িয়েছে। আমি যেহেতু শিক্ষক, সব দলের ছাত্রছাত্রীদের

শিক্ষক। কেউ আমাকে কোনো দলের পক্ষে-বিপক্ষে কোনোদিন দেখেনি। সব দলেই আমার ছাত্রছাত্রী আছে; সবাই আমাকে বিশ্বাস করে। আমি অনেক খবর জানি, কারণ আমি কোনো দলকানা নই। সেই 'গণহত্যার' সাহস বর্তমানেও ক্ষমতাসীনদের পেয়ে বসেছিল। হেফাজতে ইসলাম দমনের মৃতের সঠিক খতিয়ান যেমন কোনোদিন আর পাওয়া যাবে না; তেমনি ছাত্র আন্দোলনের মৃতের সঠিক হিসাব হয়তো কোনোদিনই জানা সম্ভব হবে না। তবে এসব বিষয়ের সঠিক তথ্য জানা প্রয়োজন। কারণ বাক্য যত দীর্ঘই হোক না কেন, কোথাও না কোথাও গিয়ে যতিচিহ্ন একটা অবশ্যই থাকবে। জীবনের কোনো কিছুই আনপেইড থাকে না। বিশ্বটা এভাবেই চলে আসছে। স্বাধীনতার তেপ্পান্ন বছর পর আবারো স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের যুদ্ধের কথা নতুন করে বলতে অনেকের মুখে শুনছি। আমি দ্বিতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন বলতে নারাজ। এটা অন্যায়-অত্যাচার, মিথ্যাচার, আইনহীনতা, লুটপাট ও দুরাচারবৃত্তি, নির্বিচার নিধনযজ্ঞের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমী সকল পেশার স্বতঃস্ফূর্ত মানুষের দেশ,স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার যুদ্ধ। এ যুদ্ধে পেছানোর কোনো সুযোগ নেই। আমি শিক্ষক হিসেবে সব পর্যায়ের শিক্ষকদেরকে এ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে বলি। ক্ষমতাসীন দলকে ভালোই ভালোই ক্ষমতা ছাড়তে বলি। অন্তত স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে বলি। ক্ষমতায় তো অনেক বছর যে কোনোভাবেই হোক আকড়ে ধরে দিন পার হয়ে গেল, এর থেকে খারাপ অবস্থায় গেলে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে। নাকি এতটা বছর ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করার পরও তিয়াস মেটেনি, ঠিকাণায় পৌঁছা আজও সম্ভব হয়নি? 'কতদূরে আর নিয়ে যাবে বলো কোথায় পথের প্রান্ত, ঠিকানা হারানো চরণের গতি হয়নি কি তবু ক্লান্ত?' কতদূর, আর কতদূর? এর পরিণতি কোথায়? রাতের হুতুম পেঁচা তার ধু-ধু-ধু শব্দে অনেক অলক্ষুণে কথা বলে যেতে চায়, সেসব কথা মুখে উচ্চারণ করতে গা শিউরে ওঠে। বলতে ইচ্ছে করে 'বালাই ষাট'। কিন্তু খুটোর জোরে পাঠা কোঁদা দেখলে অনেক অলক্ষুণে কথা মনে ভেসে ওঠাটাই স্বাভাবিক। এখানেই যত সমস্যা।

হয়তো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা অনেকেই ভাববেন। আমি একজন সাধারণ শাশ্বত শিক্ষক হিসেবে নিজেও সেটা দেখতে চাই। গতানুগতিক কোনো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আমার আস্থা নেই। আমি সকল অন্যায়-অবিচার, মিথ্যাচার, দুরাচার, দুর্নীতি, দলবাজি, পক্ষপাতিত্বের শেকড় নির্দ্বিধায়-নিঃসংকোচে উপড়ে ফেলতে চাই। আগাছা পরিস্কার চাই। এবারের সরকারকে অসংখ্য হাজার হাজার কঠিন কাজ করতে হবে। হতে হবে দূরদর্শী, স্বাধীনতা যুদ্ধের আশা

পূরণকারী, সংবিধান পরিবর্তনকারী, জাতির ভবিষ্যৎ রক্ষাকারী, রাজনৈতিক দলের জবাবদিহিতা আনয়নকারী, নতুন বাংলাদেশের দিশারি। অনেক কথা জনসমক্ষে বলার আছে, হাজার হাজার পৃষ্ঠা লেখার আছে। প্রয়োজন কলমের ও কথার স্বাধীনতা। পত্রিকায় বারবার লিখি, এত সুন্দর একটা সুজলা-সুফলা সোনার দেশ। তার অদৃষ্ট এত দুর্ভাগ্যজনক ও অকার্যকর হবে এটা হতে পারে না, কোনোক্রমেই হতে পারে না। সকলের শুভবুদ্ধির উদয় হোক এটাই কামনা।

(দৈনিক মানবজমিন পত্রিকায় ৬.৮.'২৪ তারিখ প্রকাশের জন্য লেখাটি ৪.৮.'২৪ তারিখে লিখে পত্রিকায় পাঠানো হয়েছিল। এর মধ্যে সরকারব্যবস্থার পতন ঘটে। পরে প্রকাশ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে বিধায় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি)

ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

আগে প্রয়োজন রাষ্ট্র ও সমাজ সংস্কার

গত ৫ই আগস্ট তারিখে ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষের বিজয়োল্লাসের বাঁধভাঙা স্রোত সারাদিন ধরে দেখেছি। কারো আনন্দোল্লাসকে বিঘ্নিত করতে চাইনে। চাই এদেশের বিজয়োল্লাসকে স্থায়ীত্ব দিতে। আমি কবি নই। তবুও ছোটবেলায় একটা কবিতার পঙক্তি লিখেছিলাম এমন: 'একটুখানি খ্যাতি হলে খ্যাতির ভারে ন্যূয়ে, চলার পথে পিছলে পড়ে ঠেকায় মাথা ভুঁইয়ে'। বারবার এমনটিই হয়। তাই সময় থাকতে 'সাধু সাবধান'। রাষ্ট্র ও সমাজ সংস্কারের কথা পতিত সরকারের সময়ে শত হুমকির মুখেও এ পত্রিকাতেই বারবার লিখেছি; আবারও লিখতে হচ্ছে। তারা গুরুত্ব দেয়নি, বর্তমান এরা গুরুত্ব দেয় কিনা দেখি। অনেকেই এ বিজয়কে দ্বিতীয় স্বাধীনতা, কেউবা দ্বিতীয় বিজয় দিবস বলে আখ্যায়িত করছেন। আমি কিন্তু এই আন্দোলনের বিজয়ে একটা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সুগন্ধ খুঁজছি। দীর্ঘদিনের এত প্রাণের ও ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এ বিজয়কে নিঃসন্দেহে বিপ্লব বলতে পারি। বিপ্লব দেশ ও সমাজে আমূল পজিটিভ পরিবর্তন আনে। এটাই বড় চাওয়া। শরতের প্রবল বৃষ্টি যেমন জমে থাকা আবর্জনা ও কর্দমাক্ত পরিবেশকে ধুয়ে-মুছে দিগন্তবিস্তৃত রোদ্দুর-করোজ্জ্বল আলোর ছটায় ঝকঝকে-তকতকে কোরে শুচিশুদ্ধ করে, এ অর্জন সেপথে ধেয়ে চলুক এটা এদেশের আপাতত নাগপাশমুক্ত দীর্ঘ-বছর লালিত মুক্তিকামী মানুষের প্রত্যাশা। স্বাধীনতার পর থেকে বারবার বিজয়ের কথা আমরা মুখে মুখে অনেকবার বলেছি। কিন্তু বিজয়ের ফলে হাতে-পাওয়া মুক্তির আলোকমালা কেন জানিনা বারবার হাত থেকে ফসকে গেছে। মুক্তিপিপাসু মনের একান্ত চাওয়া সুদূর পরাহত হয়ে গেছে। ভুগতে হয়েছে দেশ ও সমাজকে। আমাদের দেশ ও সামাজিক অবস্থা পেছাতে পেছাতে ক্রমেই অগণতান্ত্রিক মন-মানসিকতা, অমানবিকতা, ডাহা মিথ্যাচারিতা, লুটপাট ও অপকর্মের আখড়ায় পরিণত হয়েছে।

ছোটবেলায় গ্রামের পরিবেশে বিস্কুট খাবো বলে মায়ের কাছে কান্নাকাটি করতাম। মা একটা বিস্কুট এক হাতে দিয়ে খেতে বলতেন। বিস্কুটটা দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আবারও কাঁদতাম, দুই হাতে দুটো বিস্কট চাই। অবশেষে মা এসে ছুড়ে ফেলা বিস্কুটটা কুড়িয়ে এনে উল্টো দিকে ঘুরে ওই বিস্কুটটাকে দুইভাগ করে দুই হাতে দিয়ে চলে যেতেন। তখন দু'হাতে বিস্কট পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠতাম। জটিল বুদ্ধিটা মাথায় খেলতো না। এখন জীবনের এই পড়ন্ত বিকেলে এসে এদেশের 'অতি মহান' রাজনীতির মারপ্যাঁচ বুঝতে শিখেছি। শুধু অনুশোচনায় লিখে চলি: 'দিনগুলি আমার হারিয়ে গেল ঐ সুদূরের স্বপ্নালোকে, ব্যথিত তাই

আমার এ হৃদয় হারানো সেই দিনের শোকে'। সমাজের কদাকার রূপ, প্রতারণা, মুখে মধু পেটে বিষ, শোষণের সকল কৌশল, ভাঁওতাবাজি করে লুটপাট– সবই বোঝার ক্ষমতা বিধাতা এ সমাজের ভুক্তভোগীদের দিয়েছেন। এবার শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না, আমি কর্মে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছি। কোনো দলের সামনের কাতারে গিয়ে অতি উৎসাহ দেখিয়ে দড়ি ধরে গলা ফাটিয়ে কারো পক্ষে শ্লোগান হাকতেও আমি নারাজ। প্রতারণা, মিথ্যাচার বর্তমানে স্বার্থবাদী লোকের আদর্শ ও মূলনীতি। এই একটা কারণেই এদেশের মানুষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে বারবার প্রতারিত হচ্ছে। আমরা সাধু হই না, স্বার্থের কারণে সাধু সাজি। কত হীন-স্বার্থপর লোক যে ভোল পালটে সবার সামনে সাধু সাজতে এখন আসবে, তাকিয়ে দেখলেই ঘৃণায় মনটা রি রি করে উঠবে।

আমি দেশ ও সমাজে এর পরিবর্তন চাই। অনেক হয়েছে, আর নয়। এক দলসহ চৌদ্দ দলের পতন নিশ্চিত হয়েছে। আরো শতেক দল আছে। আমি আমার লেখার মাধ্যমে দেশ ও সমাজের সংস্কারের দিক-নির্দেশনা দিতে চাই। লিখিত সংস্কার চাই। দেশ ও সমাজ রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। তাই আগে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতির পরিবর্তনের ও সংস্কারের কথা ভাবতে হবে। সংস্কারের এ সুযোগ এবার হাতছাড়া হয়ে গেলে দেশের স্থিতিশীলতা, উন্নতি ও স্বাধীনতা ভবিষ্যতে হুমকির মুখে পড়বে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এসে 'পিলো পাচিং খেলা'র মতো একটা ভালো নির্বাচন উপহার দিয়ে যার যার জায়গায় ফিরে যাবেন। তখন আবার সেই পুরোনো খেলার পুনরাবৃত্তি হবে। এবার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ কমপক্ষে পাঁচ বছর হোক এটা আমার চাওয়া।

এদেশের সব দলের রাজনীতিকদের অনেককেই আমি চিনি। প্রতিটা দলেই অল্প কিছু লোক এখনো ভালো আছেন। এছাড়া উপর থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বেশিরভাগ নেতা-কর্মীর রাজনীতিবিদ হওয়ার উদ্দেশ্য জনসেবা ও দেশসেবা, আত্মত্যাগের জন্য, আদৌ নয়। কথাটা আমার একটুও বাড়িয়ে বলা নয়। এ সমাজ যে পরিবর্তনযোগ্য নয়, আমি তা বিশ্বাস করি না। আমাদের এই ছাত্রসমাজকে দিয়ে দেশ ও সমাজ উন্নয়নের অনেক কিছু করার আশা আমার আবার জেগেছে। প্রয়োজন সুস্থ ও সাবলীল উদ্দেশ্যভিত্তিক জবাবদিহি নেতৃত্ব। এই ছাত্রদেরকেই রামদা, কিরিচ, চাপাতি হাতে দিয়ে, কখনো পিটিয়ে অন্য ভাইকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে হত্যা করার অনেক বাস্তব ঘটনা আমরা দেখছি। আবার এদেরই একটা বৃহদাংশ দেশের প্রয়োজনে, মানুষের প্রয়োজনে সাহায্যের ডালি হাতে নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখছি। সামাজিক পরিবেশ কেমন তৈরি করবো, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে বিভিন্ন

রাজনৈতিক দলের মানসিকতার ওপর। আমাদের দেশে সকল অন্যায়, দূর্বৃত্তায়ন, বিকৃত মানসিকতা ও অপকর্মের জননী এই দিগ্‌ভ্রষ্ট রাজনীতিকরা। এদের কোনো দায়বদ্ধতা, জবাবদিহিতা নেই, জিহ্বারও কোনো মূল্য নেই। যত দুর্বৃত্তের আস্তানা ও আশ্রয়দাতা এদেশের রাজনৈতিক দল। এসব কথা প্রতি 'চান্দে-চান্দে' লিখতে লিখতে হাত ব্যথা হয়ে গেছে। দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা, দলবাজি মুক্ত করার একটাই পথ– দলমত নির্বিশেষে স্বার্থপর, দেশবিক্রেতা, মতলববাজ লোকদের কোনোভাবেই ক্ষমতার আসনে না বসানো এবং আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ করা।

ভবিষ্যতে নির্বাচনে হারার ভয়ে রাজনীতিকরা সমাজে ভালো কাজ করবে এবং আবার ক্ষমতায় আসবে– এসব পুরোনো, বস্তাপচা তত্ত্ব এখন বাতিল। এদের বর্তমান তত্ত্ব– 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতা শূন্য থাক, দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে, মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক'। প্রয়োজন আইনের সুষ্ঠু-নিরপেক্ষ ব্যবহারে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ; সুশিক্ষিত, সৎ মানুষ দিনে দিনে তৈরি করা, সে-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। আমড়া গাছ থেকে কখনোই সুমিষ্ট আম আশা করা যায় না। অথচ দেশপ্রেমী, ন্যায়নিষ্ঠ, সুবিবেচক মানুষ শিক্ষার মাধ্যমে তৈরি করা এখনোও সম্ভব, এটা কেন যেন আমরা ক্ষমতায় গেলেই সম্পূর্ণ ভুলে যায়। আমরা ভোগবাদে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। পর পর দুটো প্রবন্ধ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' শিরোনামে সম্প্রতি লিখেছিলাম এবং আমার লেখা সম্পূর্ণ সত্য প্রমাণিত হলো। এ থেকেও ভোগবাদী চিন্তার ধারকদের একটু বোধোদয় হওয়ার কথা। এর আগে কমপক্ষে বিশ বার লিখেছি যে, এদেশের জনগোষ্ঠী মূলত আমাদের সম্পদ, যা আমরা মানব-আপদে পরিণত করে ফেলেছি, এখনোও মানবসম্পদে পরিণত করা সম্ভব। দরকার উপযুক্তভাবে তাদেরকে জীবনমুখী শিক্ষা, মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষা দেওয়া। কে কার কথা শোনে! প্রায় প্রত্যেকের দৃষ্টি টাকা কামিয়ে চৌদ্দপুরুষ বসে খাবার ধান্দায়। আমার মতো অখ্যাত মাস্টারের কথা কর্ণপাত করার সময় তাদের কই! তারা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রমে 'বাঁদর নাচাতে' এবং যান্ত্রিক মানুষ তৈরি করার ফন্দিফিকির করতে মহাব্যস্ত।

মানব সন্তান জন্মিয়েই যে মানুষ হয় না, তাকে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সুশিক্ষা দিয়ে মানুষের মতো মানুষ বানাতে হয়; এসব কথা এতবার বলেও কিছু জ্ঞানবিধ্বস্ত পণ্ডিতের মগজে ঢুকাতে পরলাম না। কামার লোহা ও ইস্পাত দিয়ে ছুরি তৈরির সময় ইস্পাত যদি চুরি করা হয়, তা আজীবন ঘষলেও শুধু লোহার ছুরিতে কি ধার আনা যায়? এ বোধটুকু কাকে দেবো! দেশে জবাবদিহিতা ও

দায়বদ্ধতা নেই বলে যত লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান দলবল নিয়ে, সোনাপাচারকারী, হুন্ডি-ব্যবসায়ী, খুনি-লুটেরা এসে রাজনীতিতে ভর করেছে। এর কারণে সুশিক্ষিত লোকগুলো সমাজে একঘরে হয়ে প্রাণের ভয়ে ঘরে লুকিয়ে বসে আছে। দলমত নির্বিশেষে এদের বাইরে বের করে আনতে হবে। তাদের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করার দায়িত্ব দিতে হবে। এতে কোনো দলবাজি, স্বজনপ্রীতি করা চলবে না। এদেশের সংবিধানের ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে, যা একান্ত জরুরি। যেটা বেশি প্রয়োজন, কোনো রাজনৈতিক দলই তা করতে চাইবে না। করলে অন্তবর্তীকালীন সরকারকেই করতে হবে, নইলে লবডঙ্কা। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রেও তো স্বাধীনতার উদ্দেশ্যের বর্ণনা ছিল। স্বাধীনতার পর-পরই সে উদ্দেশ্য পরিবর্তন হলো কী করে? এর সাথে আরো দু-একটা যোগ করা যায়। সংবিধানে নেগেটিভ অর্থ প্রকাশ করে এমন 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দ রাখার পক্ষপাতি আমি নই। এটাকে পরিবর্তন করে 'ধর্ম-অহিংস ও ধর্মীয় মূল্যবোধ' করার প্রস্তাব আমার। প্রত্যেক ধর্মেই ধার্মীক লোক আছেন। এদেশের প্রত্যেক ধর্মের ও নাগরিকের অধিকার সমান। ইসলামেও ধর্ম-বৈষম্যবাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। তাছাড়া বিশ্বে এমন কোনো দেশ আছে কিনা আমার জানা নেই, যেখানে শুধুমাত্র একটা ধর্মের লোকই সে-দেশের নাগরিক।

এই থিও-পলিটিক্যাল বৈষম্যই তো বিশ্বে যত অশান্তির মূল। সেজন্য ধর্মকে জীবনব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ উধাও করে না দিয়ে, ধর্মের মূলমন্ত্র কথায় ও কাজে পালন করে সম্প্রীতির বাঁধনে মানুষকে বেঁধে ফেলাই যুক্তিযুক্ত। মনে মনে কেউ নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাস করলে এতে সমাজের কিছু যায়-আসে না। তবে নাস্তিক্যবাদের ছবক নিয়ে কেউ কেউ ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তকসহ দেশব্যাপী নাস্তিক্যবাদ ছড়িয়ে দিতে চায়। একাজ থেকে তাদের নিবৃত্ত করা উচিত। তেমনিভাবে 'অসাম্প্রদায়িক চ্যেতনা (চেতনা), চ্যেতনা' বলতে বলতে আমরা গলা শুকিয়ে ফেলি। এ শব্দটিও নেগেটিভ অর্থ প্রদান করে। এ শব্দ থেকে বেরিয়ে এসে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি'র কথা সমাজে ছড়িয়ে দিতে পারি। যাহোক ইউরোপের কার্ল-মার্কস ইউনিভার্সিটিতে আমার গবেষণার সুবাদে লেখাপড়ার সুযোগ হয়েছিল। বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলনের পতন নিয়ে আমি অনেক কাজ করেছি। এর কারণ আমার জানা। এত অল্প পরিসরে এসব আলোচনা না করাই ভালো। আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, শাশ্বত মূল্যবোধ, সামাজিক বুনন, আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। জাতি হিসেবে আমাদের নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রেখে নিজস্ব সংস্কৃতি ও অস্তিত্বের বিকাশ সাধনে যারপরনাই

চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এতেই আমাদের মুক্তি। নইলে অন্য কোনো জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে আমাদের বিলীন হওয়া ও গোলামির নিগড়ে আবদ্ধ হওয়া কঠিন কিছু নয়। আমাদের পাশের রোহিঙ্গাদের কথা একবার ভেবে দেখুন। অনেক প্রশ্নের উত্তর পাবেন। এছাড়া এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের অনেক জাতির কথাও ইতিহাসে শুনবেন, বাস্তবে অস্তিত্ব পাবেন না। এতে বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষের জন্য অনেক চিন্তার খোরাক রয়ে গেছে।

যাহোক এবার সময় এসেছে রাজনৈতিক দলের দিগ্‌ভ্রষ্টতা, সীমাহীন দুর্নীতি, দায়িত্ববোধহীনতা ও জবাবদিহিহীনতাকে আমলে এনে সংবিধানের পুরো রাজনৈতিক-পরিচালনা কাঠামোকে ঢেলে সাজানোর। এ বিষয়ে যথাসময়ে আমার পরামর্শ এ পত্রিকার মাধ্যমেই সকলকে জানিয়ে দিতে পারবো বলে আশা রাখি। এ সময়ে করণীয় হলো: আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, যারা গণহত্যার শিকার হয়েছেন তাদের সঠিক তালিকা তৈরি করা, আন্তরিকভাবে আহতদের পাশে দাঁড়ানো; দেশের অর্থ লুটপাট, দুর্নীতি, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধকারীদের অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু বিচারের আওতায় আনা, বিদেশে পলাতকদেরও দেশে ফিরিয়ে আনার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এদের বিচার না হলে সাধারণ মানুষের কাছে ভবিষ্যতে তা আইনহীনতার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন বড় বড় পদে দলবাজ, সুবিধাভোগী ও তোষামোদকারীরা বসে আছেন, দেশ লুটে খাচ্ছেন, তাদেরও বিচারের আওতায় আনতে হবে। অপরাধীর বিচারে আপন-পর বিবেচনা ও কোনোরকম দলীয় পক্ষপাতিত্ব আমরা কেউ দেখতে চাই না, যদিও আইনহীনতা ও পক্ষপাতিত্ব এদেশের প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যৎ জনকল্যাণকর রাষ্ট্র গড়ার জন্য এ ধরনের অপবাদ থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতেই হবে। আমি সেই স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে বারবার আশাহত হয়ে এবার বেশি আশান্বিত না হওয়ার পক্ষপাতি। ভালোর জন্য অপেক্ষা করতে পারি।

(প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

বিকারগ্রস্ত রাজনীতির কবলে মানুষ-সমাজ-দেশ

(পত্রিকায় প্রকাশিত শিরোনাম: 'বিকারগ্রস্ত রাজনীতির অবসান হোক')

জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে এত গান মনে হচ্ছে, সংকেতটা ভালো নয়। ইচ্ছে ছিল আল্লা-বিল্লে করে মরবো। দেশের অবস্থা দেখে তা করতে পারবো বলে মনে হচ্ছে না, ঈমান-আমান নষ্ট করে দিচ্ছে। সমাজ ও মানুষ, যাকে আমরা জনসম্পদ বলি, ইতোমধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে। এটা অপূরণীয় ক্ষতি। সেই ব্রিটিশ শাসন থেকে শুরু, বাংলাদেশিরা মুক্তি পেল কই? মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করা যত সহজ, গড়তে গেলে অনেক কাঠ-খড় পোড়ানো লাগে, সময়সাপেক্ষ ব্যাপার—এ কথা আমরা সবাই বুঝি। তাও সার্থকতা নিয়ে সন্দেহ মন থেকে যায় না। লালন গেয়েছিলেন, 'পাবে সামান্যে কি তার দেখা, বেদে নাই যার রূপরেখা, ও রে বেদে নাই যার রূপ রেখা-আ-আ...'। পতিত সরকার দেশের প্রতিটা বিভাগ, সমাজ, মানুষের স্বভাব পুরোপুরি পচিয়ে নষ্ট করে, ধ্বংস করে, লুটেপুটে নিয়ে নিজেরা হাঁড়ি চেটেপুটে খেয়ে পালিয়েছে। শেখ মুজিব বলতেন 'চাটার দল'। আমি নাম দিয়েছি 'হাঁড়ি-চাটার দল'। এখন যত বোঝা অন্তর্বর্তী সরকারের ঘাড়ে। 'ঘাটের মরা ফেলবি তো ফেল, না ফেললে গন্ধে মর'।

এর পরও একটা শ্রেণি পতিত সরকারের পক্ষে শ্লোগান হাঁকছে, তারা আবার এদেশে তথাকথিত রাজনীতি করার সুযোগের অপেক্ষায় আছে। তাদের জিজ্ঞেস করতে মনে চায়, 'আচ্ছা বলো তো, তোমাদের আক্কেলটা কী? পার্শ্ববর্তী দেশে বসে কেউ কেউ কলকাঠি নাড়ছে আর তোমরা মওকা বুঝে সাড়া দিচ্ছ, তোমাদের আত্মজিজ্ঞাসা বলতে কি কিছু আছে? দেশপ্রেম? নাকি লবডঙ্কা? তোমরা তো স্বাধীনতা যুদ্ধে খানসেনাদের অনুগত এ দেশীয় দোসরদেরকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছ, মনে একবার ভেবে দেখ তো! তোমরা কি পার্শ্ববর্তী দেশের খাস দালালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছো না?' আমরা এখন উভয় সংকটে পড়ে আছি; 'মারলে মরে যায়, ছেড়ে দিলে কামড়ে দেয়' অবস্থা।

স্বাধীনতা যুদ্ধের বড় কারণ ছিল, পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকরা নানা কৌশলে এদেশকে শোষণ করছিল। যুদ্ধ শুরু হলে এ দেশীয় দোসর তাদের সহযোগিতা করেছিল। সেটা যদি আমরা মেনে নিতে না পারি, এদেশীয় দোসর ও 'মীরজাফরদের' প্রত্যক্ষ সহযোগিতা নিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ আমাদের শোষণ করে এসেছে, গোপনে গোয়েন্দা-রসদ দিয়ে দোসরদের জোর করে যুগ যুগ ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছিল, গণহত্যা চালিয়েছে, আজ্ঞাবাহী দোসর ও গোয়েন্দা দিয়ে দেশ

চালিয়েছে, দোসর অবাধে দেশ লুট করেছে; দেশপ্রেমী বাংলাদেশী তা মেনে নেবে কীভাবে? যতদূর মনে পড়ে, মাওলানা ভাসানী তার এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'দেশটা সাদা ভল্লুকের খপ্পর থেকে মুক্ত হয়ে কালো ভল্লুকের খপ্পরে পড়েছে'। তাই যদি হয়, আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব কোথায়? আমরা তো সম্প্রসারণবাদী ভারতের কাছে জিম্মি হতে পারি না। অনেকে বলেন, আমাদের মুক্তির আন্দোলন শুরু হয়েছে '৭১ সাল থেকে। আমার দৃষ্টিতে আন্দোলন শুরু হয়েছে ব্রিটিশ শাসক এদেশ দখলে নেওয়ার পর থেকে। ভারতবর্ষের সত্য ইতিহাস আমাদের জানতে হলে অনেকের লেখা ইতিহাস আমাদের পড়তে হবে সেই বৈদিক যুগ থেকে। জানা যাবে কার ভূমিকা কি। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যদের রসদ ও অর্থের সংস্থান গোপনে করেছিল 'জগৎশেঠ' নামের এক ভারতীয় ব্যবসায়ী। তার আসল নাম 'ফতেহ চাঁদ', পিতা 'মানিক চাঁদ', দাদা হিরেন্দু সাহু।

ব্রিটিশ এদেশ শাসন করার সময় সে-দেশ থেকে লোক আনতো পাঁচ-দশ হাজার। এদেশ থেকেই ব্রিটিশদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য ভাড়াটে-ব্রিটিশ বা ব্রিটিশ-তাবেদার তৈরি হতো পঞ্চাশ হাজার। এজন্য তাদের কিছু টাকা খরচ করতে হতো। আমাদের দেশপ্রেমের অভাবের সুযোগ তারা নিত। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ সে পথই ধরেছে। নিজেদের লোক এদেশে ভিড়িয়েছে লাখে লাখ– কেউ চাকরিতে, কেউ গোপন বাহিনীতে; এদেশে সুবিধা ও টাকা দিয়ে অনুগত দালাল ও দখলদার ভাড়া নিয়েছে আরো লাখে লাখ। তাদের নেত্রী বর্তমানে লুটতরাজ করে ছাত্র-জনতার বিপ্লবে সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে প্রভুর পদতলে হাজির হয়েছে, একটা গতির অন্বেষণে। প্রভু হয়তো নিজের কাছে সেবাদাসী হিসেবে আশ্রয় দেবে, নইলে অন্য কোনো বন্ধুদেশে থাকার ব্যবস্থা করে দেবে। প্রভু তার একনিষ্ঠ ভক্তকে কোনোদিন ভুলবে না, মুখে যত মধুমাখা কথাই বলুক। এটা আমাদের সবার জানা প্রয়োজন। বিগত পাঁচটি নির্বাচনে প্রভুকে নিয়ে অনেকে অনেক বড় বড় কথা বলেছে। আমি অন্তর থেকে জানি, প্রভু কখনো ভক্তদেরকে রিক্ত হাতে ফেরাবে না। যথাসাধ্য করেছেও। প্রভুর দরকার নিখাদ ভক্তের, স্বার্থ আদায়ের। তা তারা স্বাধীনতার আগ থেকেই চিহ্নিত করতে পেরেছিল এবং ঠিকমতো পেয়েও গিয়েছিল। আমরা বুঝিনি।

এদেশের মানুষের যে জনসমর্থন, একতা ও মনোবল ছিল, কষ্ট একটু বেশি হলেও এরা নিজের চেষ্টায়ই স্বাধীনতা অর্জন করতে পারত, হয়তো সময় একটু বেশি লাগত। প্রভু বন্ধুত্বের ছদ্মাবরণে সে-সুযোগটা কাজে লাগিয়েছিল। এ কথা আমি

গত সপ্তাহের লেখাতেও লিখেছি। পতিত ভিনদেশি-তাবেদার সরকার এদেশে যে শেষখেলার চমক দেখিয়ে গেল, কোনো দেশপ্রেমী মানুষ তা কোনোক্রমেই মেনে নিতে পারে না, কোনোদিন ভুলবেও না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা পশ্চিম-পাকিস্তানি হানাদার শাসককেও হার মানিয়েছে। ভারতের হিন্দুত্ববাদী মোদি সরকার শেখ হাসিনার পরাজয়কে নিজেদের পরাজয় হিসেবে দেখছে, যেমন স্বাধীনতার সময় বাংলাদেশের কাছে পশ্চিম-পাকিস্তানের পরাজয়কে ভারত আজও তাদের কাছে পশ্চিম-পাকিস্তানের পরাজয় বলে প্রকাশ্যে প্রচার করে। ভারত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমাদের নিয়ে বিশ্বের কাছে ইসলাম-ফোবিয়ার ধুয়ো তুলছে এবং সংখ্যালঘু কার্ড ব্যবহার করছে। নিজেকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন তো, আমরা আসলেই 'জঙ্গী' কীনা? মূলত মঞ্চস্থ নাটক, বাস্তবতার সাথে এর কোনো মিল নেই; তবুও তারা বলে চলেছে। বিশ্বব্যবস্থাকে বর্তমানে জিও-পলিটিক্যাল ভারসাম্যহীনতা হিসেবে দেখলেও আমার চোখে পুরো ব্যবস্থাকেই থিও-পলিটিক্যাল কনফ্লিক্ট বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ইজরাইলের সাথে ভারতের ঠিকই দহরম-মহরম। ফলে এ অবস্থায় আমাদের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নিজেদের একত্র হতে হবে, জোট বাঁধতে হবে, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে, নিজেদের প্রচেষ্টায় শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উৎকর্ষ বাড়াতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। আওয়ামিলীগ সহ ১৪ দল তা বুঝবে না, আমাদের এ সমীকরণ বুঝতেই হবে। আমরা তো মুসলমানিত্বকে বিসর্জন দিয়ে অন্য কোনো ধর্মে যোগ দিতে পারবো না; আবার ধর্মবিদ্বেষীও হতে পারবো না। তবে যে যত যা-ই বলুক, আমাদের ধর্ম-অহিংস হতে হবে। অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপারে অধিক মনোযোগী হতে হবে।

অন্তর্বর্তী সরকারকে বুঝতে হবে, সব 'হাঁড়ি-চাটার দল' এদেশ থেকে পালিয়ে যায়নি। তারা এখনো বহাল-তবিয়তে অক্ষত আছে। তারা বিভিন্ন দলের মধ্যেও ঢুকে আছে। তাদের মানসিকতাও বদল করেনি। বিগত ষোলো বছর ধরে প্রতিটা সেক্টরে-বিভাগে, প্রশাসনের পরতে পরতে দলীয় লোকজন বেছে বেছে পদে বসানো হয়েছে। রসদের বোতল উপুড় করে তাদের মুখে ধরে রাখা হয়েছে। যত পারো চেটে চেটে খাও আর গুণগান গাও। তাই হঠাৎ করে ভালো লোক পাওয়া কঠিন। এখন যাকেই কোনো পদের জন্য নির্ধারণ করা হচ্ছে, ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হবে। যাকেই যে পদে বসাবেন, দোষ হবে আগের দল থেকেই সিলেকশন দেওয়া হয়েছে। অথচ বিকল্প পাওয়া দুষ্কর। যারা পতিত সরকারের কারণে পদবঞ্চিত বলে দাবি করবে, তারা সবাই যে পতিত সরকারের কারণে পদবঞ্চিত, তাও নয়।

সাদামাটা বিশ্লেষণ করা ঠিক হবে না, এ নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। কাজটা এত সহজ নয়। এর মধ্যে একটা দালাল শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে বা হবে, যারা অন্তর্বর্তী সরকারের নাম বিক্রি করে টাকা কামাতে সচেষ্ট থাকবে। অতীতের ধারা অব্যাহত রাখতে চাইবে। আবার অসংখ্য সমন্বয়কদের সবাই যে শততার সাথে কাজ করবে, এমনটিও নাও হতে পারে। সব দোষ গিয়ে পড়বে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর। 'যা কিছু হারাক, কেষ্ট বেটাই চোর' বলে প্রতীয়মান হবে। এসব ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এছাড়া উপদেষ্টামণ্ডলীকে একজোট হয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা বেশি প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে। সময় লাগলেও এই বিকারগ্রস্ত রাজনীতি থেকে দেশ ও সমাজকে বাঁচাতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। এ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে অনেক বয়স্ক ব্যক্তির জীবনে দেশ সংস্কার ও গড়ার সুযোগ দেখে মরার সৌভাগ্য আর হবে না। অনেক রাজনীতিবিদও আছেন, যাদের বয়স হয়েছে। যদি দেশকে কল্যাণ-রাষ্ট্র বানাতে চান নিজের ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়াকে ত্যাগ করুন, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করুন। অন্য কিছু না হোক, অন্তত আঠারো কোটি মানুষের মুক্তির সওয়াবের ভাগিদার হবেন। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রত্যেক সদস্যকে সে মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। কোনো ব্যক্তিগত ইজমকে পরিহার করতে হবে। সবকিছু আর কিছুদিন পরেই জনসাধারণের চোখে ধরা পড়বে।

আমি গ্রামের মানুষ। প্রচণ্ড খরায় কখনো ধানের জমি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। ধানগাছ মরমর অবস্থায় পৌঁছে যায়। ক্ষেতে পরিমিত পানির দরকার হয়। সে সময় পরিমিত পানির পরিবর্তে বন্যার ঢেউ-খেলানো পানির তোড় হঠাৎ ক্ষেতে প্রবেশ করলে ধানগাছগুলোর মরণের কারণ হয়ে দাঁড়াই। বেশি পানিতে চারাগাছ পচে যায়। সরকার বেশি উদার গণতন্ত্র হঠাৎ দেশে চালু করে দিলে বিষয়টা তেমনই দাঁড়াবে। জনগোষ্ঠীকে আগে গণতন্ত্রে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে, সুশিক্ষিত করতে হবে। গণতন্ত্রের দড়ি আস্তে আস্তে ছাড়তে হবে। গণতন্ত্রের বদৌলতে কোনো অপশক্তি দেশের ঘাড়ে চেপে বসলেই আবার বিপদ। হঠাৎ অতি ভালো ভালো নয়। শরীরের যে অংশটা পচে নষ্ট হয়ে গেছে, পরীক্ষাতেও তা ধরা পড়লে সেটাকে কেটে অঙ্গচ্ছেদ করে ফেলাই যৌক্তিক। যার গায়ের গন্ধে ঘুম হয় না, তার নাম আতর আলী বলে ডাকার কোনো মানে হয় না। চর দখলের মতো দেশ দখল করে লুটপাট ও দেশবিক্রি যাদের স্বভাব, তাদের অস্তিত্বকে রাজনৈতিক দল নাম না দিয়ে দুর্বৃত্ত-গোষ্ঠী বলাই সমীচীন। এরা রাজনৈতিক দল নামের কলঙ্ক, তা সে যে দলই হোক না কেন। যে কোনো অন্যায় ও অপরাধকে শক্ত হাতে দমন

করতে হবে। এখানে উদারতা দেখানোর কোনো সুযোগ নেই। পতিত রাজনৈতিক দল জাত ক্রিমিন্যাল প্রমাণিত; তবে অন্য সব দলই যে ধোয়া তুলসীপাতা, তাও নয়। বিষ্ঠার উভয় পিঠই দুর্গন্ধ। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে বৈঠকে এ বিষয়গুলো নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করা যেতে পারে। আমি কোনো রাজনৈতিক দলের মধ্যে শুদ্ধি অভিযান দেখতে পাচ্ছি না। এতে ভবিষ্যৎ পরিবেশ সংশয়াকুল থেকে যাচ্ছে, তা যে দল যত উঁচু গলায় কথা বলুক না কেন।

আইন ও সংবিধান সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আছে, তবে সংস্কারই সবকিছু নয়; সঠিক বাস্তবায়ন এদেশে বড় সমস্যা। আংশিক বাস্তবায়ন সংস্কার না করার শামিল। বাস্তবায়ন করে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল, সংশ্লিষ্ট বিভাগের সরকারি কর্মকর্তারা। আমার দেখা চোখে, কম্বলের লোম বাছতে গেলে কম্বল উজাড় হবে বলে আমার বিশ্বাস। 'সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা'র প্রয়োজনীয় সংশোধন ও যথাযথ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যাপক দুর্নীতি ঢুকে গেছে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী আর প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী নেই; সরকার-দলীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী হয়ে গেছে। বেশ কিছু এমপিওভুক্ত স্কুল শিক্ষক আমার কাছে অনেকদিন ধরে ফোন করে বলছেন যে, তাদের অবসর সুবিধা পেতে ইচ্ছাকৃতভাবে যারপরনাই দেরি করা হচ্ছে, অনেক টাকা দাবি করা হচ্ছে। নইলে বিভিন্ন ছুতাই ফাইল ফেলে রাখা হয়। এদের দেখার কেউ নেই। সংশ্লিষ্ট মহল তাদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করলে অসহায় কিছু শিক্ষক শেষ বয়সে এসে বড়ই উপকৃত হন। আবার সেই লালনের গান গাইতে হচ্ছে, 'সময় গেলে সাধন হবে না, দিন থাকতে দ্বীনের সাধন কেন জানলে না, সময় গেলে...'।

(প্রকাশ: ১০ অক্টোবর ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

'যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য বই...'

একটা গানের প্রথম কলিটা এরকম: 'আগুনে যার ঘর পুড়েছে সিঁদুর-রাঙা মেঘ দেখে তার ভয়'। লালন এ ধরণের ভয়কে গানে 'ভয়তরাসে' বলে প্রকাশ করেছেন। এদেশের সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষেরও সেই একই দশায় ধরেছে। সাধারণ সমাজে আজন্ম চলাফেরা করি, তাই তাদের ভয়টা বুঝি। এ ভয়ের জন্য তাদের দোষ দিতে পারি না। কারণ আমরাই কর্মের মাধ্যমে সে ভয় সৃষ্টি করেছি। একদিনে নয়, সেই স্বাধীনতা যুদ্ধের আগ থেকে তাদের নাকের ডগায় উন্নয়নের ও বঞ্চনামুক্ত সমাজের মুলো ঝুলিয়ে রেখেছি; স্বাধীনতার তেপ্পান্ন বছর পার হয়ে গেছে।

এত ভয় কীসের? রাজনীতিকদের কৃতকর্মের ভয়। আমরা কথা দিয়ে কথা রাখি না। রাজনীতিকদের ওপর সাধারণ মানুষ আস্থা-ভরসা রাখতে পারে না। অনেক রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে বুকভরা আশা নিয়ে মানুষ জোটবদ্ধ হয়ে এদেশ স্বাধীন করেছিল। স্বাধীনতার ঘোষণায় বলা উদ্দ্যেশের সঙ্গে সংবিধানে লেখা উদ্দেশের মিল ছিল না। '৭২ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই সে আশা ক্রমশই ফিকে হতে হতে ধূলিস্মাৎ হয়ে গিয়েছিল। অর্জিত স্বাধীন দেশে দুর্নীতির পাশাপাশি বাকশালী একদলীয় শাসন নিয়মতান্ত্রিক সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার পরিবর্তনের সব পথ বন্ধ করে দেয়। ফলে জনগণের ক্ষোভ ও অসন্তোষ জমতে থাকে। তখন থেকেই ভয় প্রগাঢ় হয়েছিল। সময়ের অনিবার্য প্রয়োজনে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে '৭৫-এর রক্তমাখা পটপরিবর্তন হয়। অনেকে ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কথা ও পারস্পরিক দোষারোপ করলেও নিরেট বাস্তবতা হচ্ছে– মিষ্টির দোকানে আমরা সেদিন মিষ্টি ফুরিয়ে যেতে নিজ চোখে দেখেছিলাম। এ কথাটা আমি প্রায়ই লিখি, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ বড্ড নির্মম'। এটা কামান-গুলি, খুন-গুম, নির্যাতন-কেসকাট্টা করে কেউ রোধ করতে পারে না। অতপর দেশে এলো সামরিক শাসন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া সামরিক শাসন থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। তার শাসনের অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কয়েকটা বৈশিষ্ট্য ছিল, তার গতিশীল নেতৃত্বে কোনো 'চাটার দল' তার গা ঘেঁষতে পারতো না। দেশের মানুষ তার দফাভিত্তিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। তার আত্মসচেতনতার কারণে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি তার কাছে পরাজিত হয়েছিল। দেশের দুর্ভাগ্য তাকে দেশের অভ্যন্তরের ও বাইরের কুচক্রিমহলের ষড়যন্ত্রে অকালে প্রাণ দিতে হয়েছিল। উন্নয়নের প্রক্রিয়া এতে হাতছাড়া হয়ে যায়। নব্বইয়ের গণ অভ্যুত্থানে

দেশবাসী ভেবেছিল দেশটা মনে হয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় চলা শুরু করলো। পর পর তিনটা নির্বাচন ভালো হওয়ায় পরাজিত দলের বিরূপ মন্তব্য বাদে, নির্বাচন নিয়ে দেশবাসীর মনের ভয় অনেকটাই দূরীভূত হয়েছিল, রাজনীতিতে ও প্রশাসনে ততদিনে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি ক্রমেই জেঁকে বসতে শুরু করেছিল। ২০০৮ সাল থেকে শুরু হলো দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ, বিরোধীদল নিধন প্রক্রিয়া, খুন-গুম ও দুর্বৃত্তায়নের বাঁধভাঙা মচ্ছব। দিন যতই যেতে থাকলো বিরোধী দল ও সাধারণ মানুষের জাঁকান্দানি (মৃত্যুকালীন অসহ্য যন্ত্রণা) বাড়তে থাকলো। নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগসহ সংবিধিবদ্ধ সব সংস্থার ওপর দলীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ক্রমেই দানবীয় রূপ ধারণ করলো। জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে গেল। এমনকি বিচারের রায় ক্ষমতাসীন দল লিখে দেওয়া শুরু হলো। চর দখলের মতো ক্ষমতার দখল বলবত থাকল। দেশের অবস্থা 'অন্ধকারের যুগ'কেও হার মানাল। বিভিন্ন ফন্দি এঁটে বিরোধী দলের আন্দোলন দমন নিতান্ত ডালভাতে রূপ নিল। পার্শ্ববর্তী হিন্দত্ববাদী আগ্রাসন ও আধিপত্যবাদী নীতির খুঁটোর জোরে তাদের এদেশীয় অনুচর ও গদি দখলকারীরা আনন্দের আতিশয্যে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে লাগলো। দেশ পূর্ণমাত্রায় অমাবশ্যায় ঢেকে গেল। নিকষকালো অন্ধকারে 'হাড়িচাটার দল' ও পদলোভী-স্বার্থবাদী তোষামোদকারীর দল প্রকাশ্যে লাখ-কোটি টাকা লোপাট ও অর্থপাচার করে কোষাগার শূন্য করে ফেলল। এসব অপকার্যকলাপ আওয়ামী লীগের অনেক সমর্থককেও স্বীকার করতে ও ঘৃণা প্রকাশ করতে দেখেছি। দীর্ঘদিনের জমা ক্ষোভ ও বঞ্চনা ছাত্রছাত্রীদের দুর্দমনীয় আন্দোলনে ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্মিলনে সাধারণ মানুষের প্রবল বাঁধভাঙা তোড়ে পরগাছা শেখ হাসিনার স্বপ্নের মসনদ ভাসিয়ে নিয়ে গেল। প্রকৃতি তার প্রতিশোধ আবার নিল। এ প্রতিশোধ ছিল বিনা মেঘে বজ্রপাতের সমতুল্য। পেছনে ফেলে রেখে গেল অগণন গুম-হত্যা, আয়নাঘর, মাত্র দশ দিনে কমপক্ষে দেড় হাজার ছাত্র-যুবকের রক্তমাখা নিথর প্রাণ ও হাসপাতালের বিছানায় শায়িত হাজার হাজার জীবন্মৃত ছাত্র-যুবকের আহাজারি।

সাধারণ মানুষের 'ভয়তরাসে' ভাব এখনো রয়ে গেছে। রাজনৈতিক নেতাদের শুধু নিজের সততা দিয়ে নিজেকে বিচার করলেই হবে না। গ্রাম-গঞ্জ থেকে শুরু করে উচ্চপর্যায় পর্যন্ত নেতাদের মধ্যে, প্রতিটা অফিসের বিভিন্ন পদধারীদের মধ্যে এতদিনের লাখ পেরিয়ে কোটি টাকা তৈরির অবৈধ বাসনা পেয়ে বসেছে। সাধারণ মানুষের 'ভয়তরাসে' না হয়ে উপায় কি? 'যে লংকায় যায়, সেই হয় রাবণ'। এখন রাজনৈতিক দলের নেতাদের আত্মসমালোচনা ও আত্মজিজ্ঞাসার সময় এসেছে।

দেখছি, রাজনৈতিক দলগুলোর মাথায় রাষ্ট্র সংস্কারের কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই। সব দলই 'হাঁড়িচাটার দল' সঙ্গে নিয়ে ক্ষমতায় যেতে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। এ 'ভয়তরাসে' সাধারণ মানুষ অনেক বছর ধরেই তো বাস্তবতা দেখল; দীর্ঘ ১৬টা বছরও দেখল; তারা রাজনীতিকদের ওপর আস্থা রাখবে কোন ভরসায়? শত শত বছর কি এভাবেই কাটবে? তারা এদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা দেখতে চায়, সরকারি প্রতিটা পদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে চায়, রাজনীতিকদের জবাবদিহিতা, দায়বদ্ধতা ও দায়িত্ববোধ নিশ্চিত করতে চায়। যে দলই ক্ষমতায় আসুক, তাতে তাদের কোনো যায়-আসে না।

যত সময়ই লাগুক, আমূল সংস্কার এজন্যই প্রয়োজন। যদি বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলোর দেশ গড়ার আন্তরিক ইচ্ছে থাকে, অন্তর্বর্তী সরকারকে সময় দিতে হবে। সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দিতে হবে। দেশে সত্যিকারের উন্নতির জন্য প্রতিটা রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিরাজিত দুর্নীতিমনা নেতাকর্মীদের দল থেকে দূরে রাখতে হবে। তড়িঘড়ি করে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বেশি উদগ্রীব হলে অতীতের নিষ্ফল সুষ্ঠু নির্বাচনের মতো হতে বাধ্য। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হওয়া মানেই উন্নয়নের মগডালে পৌঁছে যাওয়া নয়। এটা উন্নয়নের প্রাথমিক প্রক্রিয়া। উন্নয়নের জন্য অনেক কাঠ-খড় পোড়ানোর দরকার আছে। মঞ্চে গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা আর দেশগড়া এক কথা নয়। কয়েক যুগ পর একবার সুযোগ এসেছে। এ সুযোগ অনেক নিষ্কলুষ জীবন বিসর্জনের পর জাতির জন্য শুভক্ষণ। একে সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা করে কাজে লাগাতে হবে। রাজনীতিবিদদের পরচর্চা করা বড় অভ্যাস। সরকারকে গঠনমূলক পরামর্শ দিতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে প্রতিটা বিভাগে যেভাবে সংস্কার করা সম্ভব; কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে সেভাবে সংস্কার করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্বপালনে শৃঙ্খলা ফেরাতে হবে। এজন্য আইনকানুন পরিবর্তনের প্রয়োজন। মৌখিক গণতন্ত্রের পরিবর্তে সব পর্যায়ে বাস্তবিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটা সদিচ্ছার ব্যাপার। সামাজিক শিক্ষা ফিরিয়ে আনতে হবে। এসব বিষয়ে তাড়াহুড়া করে সংস্কার করতে বলা মানে সংস্কার না করে তাড়াতাড়ি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাধিষ্ঠিত হওয়ার গোপন মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। সংবিধানে যেসব ধারা রয়ে গেছে, এই বিপ্লব ব্যর্থ হলে হাজার হাজার দেশপ্রেমী মানুষ বিপদে পড়ে যেতে পারেন। বিভিন্ন পক্ষের বিপরীতমুখী সমালোচনায় আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে, ছাত্র-জনতার বিপ্লবের চেতনা ক্রমশ দূরে পড়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশিদের স্বভাবজাত অন্তর্দ্বন্দ্ব নিকটবর্তী হচ্ছে।

অনেক দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের মাঠপর্যায়ের নেতাকর্মীদের রাজনীতি করার কারণ জানার ঘাটতি আছে। বর্তমান মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যুগে ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্যই অধিকাংশ নেতাকর্মী রাজনৈতিক দলে নাম লেখায়। এ থেকে বের হতে গেলে যে কোনোভাবে নীতিমালা তৈরি করে আগে রাজনীতিতে টাকার খেলা বন্ধ করতে হবে। এমপি কর্তৃক এলাকার উন্নতির নামে টাকার ভাগবাঁটোয়ারা রদ করতে হবে। এতে সুশিক্ষিত মানুষ আদর্শের কারণে জনসেবাকে ধর্মজ্ঞানে রাজনীতিতে আসবেন। বর্তমান রাজনীতি হয়ে গেছে যত দুর্নীতিবাজ ও সোশ্যাল টাউটদের রাজনীতির নামে মিথ্যাচার ও লাঠি-পুঁজির ব্যবসা। সেজন্য সংবিধান পরিবর্তন, অন্যান্য আইনকানুন পরিবর্তন অনেক ভেবেচিন্তে করতে হবে। নিতান্ত নাদান-মূর্খ ছাড়া দেশের উন্নতি কে না চায়! কোনো ঠুনকো অজুহাতে অন্তর্বর্তী সরকারকে সরানোর বুদ্ধি করা যাবে না। এটা আত্মঘাতী হবে। তারা দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার নামে আন্দোলনের চমৎকারিত্ব রাজপথে দেখিয়ে সরকারকে অস্থির করে রাখা হয়েছে, দাবি আদায়ের অজুহাতে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা চলছে; পতিত সরকারের কর্মকর্তারা প্রচ্ছন্নভাবে অসহযোগিতা করে চলেছেন। কোষাগারে যে টাকা এসে জমছে, মেগা প্রকল্পের নামে লুটতরাজের জন্য যে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছিল, তার কিস্তি দিতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। কুঁজোকে চিৎ করে শোয়াতে বললে আগে তার অপারেশনের সময় দিতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকারকে মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এতে সরকারের মূল কাজ বিলম্বিত হচ্ছে। আর তাদের কারো হাতে তো আলাদিনের চেরাগ নেই। চল্লিশ বছর ধরে সবক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা-অরাজকতা তৈরি হবে আর সমাধান করে দিতে হবে কয়েক মাসের মধ্যে; কীভাবে সম্ভব? অন্তর্বর্তী সরকারে কর্মরত অধিকাংশ উপদেষ্টার দেশ চালানোর অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। তাদের সমালোচনা করে লাভ নেই। দেশ বাঁচাতে সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে আসুন। তারাই পারবেন। নইলে পরিণামে আম-ছালা দুটোই যাবে। বিভিন্ন সরকারি বাহিনীর কাছে দেশের অস্তিত্ব ও সার্বিক স্বার্থের তুলনায় নিশ্চয়ই দলীয় সমর্থন বড় নয়। আমার বিশ্বাস, সে-বুঝ তাদের আছে।

যাদের ধৈর্য একেবারেই নেই, প্রয়োজনে ধৈর্যের জন্য হোমিও ওষুধ খেতে হবে; তবু ধৈর্য ধরুন। বহিঃশক্তির আগ্রাসনমুক্ত জাতি গঠনে যে সুবর্ণ সুযোগ এসেছে, সে সুযোগ দেশের উন্নয়নে সঠিকভাবে ও সর্বোচ্চমাত্রায় ব্যবহার করতে হবে; তা বিদ্যমান সব রাজনৈতিক দলকে কাজে লাগাতে হবে। দেশে যে সংস্কার করতে হবে, কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি নতজানু না হয়ে সাধারণ মানুষ ও দেশের

মঙ্গলের দিক লক্ষ্য রেখে করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের পর এবারই দেখলাম ছাত্র-জনতা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের প্রয়োজনে অকাতরে প্রাণ দিল। রাজনৈতিক দলগুলো সামনে না এসে তাদের সাহায্য করল। আমি একজন শিক্ষক হওয়াতে খুব কাছ থেকে ছাত্রছাত্রীদের আবেগ-অনুভূতিকে পর্যবেক্ষণ করেছি। পতিত সরকারের বিরুদ্ধে দেশের প্রয়োজনে সাধারণ মানুষ ও দল-নির্বিশেষে এমন উন্মাদনা মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে আর দেখিনি।

খবরে যা শুনলাম, মনে হচ্ছে বিএনপি ও জামায়াতের হুঁশ ফিরেছে; তারা বুঝতে পেরেছে কুচক্রী বহিঃশক্তি তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে তৃতীয় পক্ষকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে। তেমনটি হলে এদেশ করদ রাজ্যে পরিণত হবে। বিএনপি ও জামায়াতের বুঝতে হবে দলীয় স্বার্থের তুলনায় দেশের স্বার্থ নিশ্চয়ই অনেক বড়। বহিঃশক্তি ছলে-বলে, কলে-কৌশলে তাদের সেবাদাসের সহায়তায় দিনে দিনে দেশটাকে কুক্ষিগত করতে চায়। এটা অতি পরীক্ষিত সত্য, বিধাতা প্রদত্ত সাধারণ বোধশক্তিতেই তা বোঝা যায়। শেখ হাসিনা প্রভুর আশ্রমে বসে মাঝে-মধ্যেই বিষবাষ্প নিসৃত হুংকার ছাড়ছেন। তাদের বংশবতংস ও পোষ্যপুত্রদের চিন্তাচেতনা স্বাধীন দেশবিরোধী; তাদের যুক্তি ও তর্কের শেষ নেই। ‘আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি ও স্বাধীন থাকবো’ এই বোধোদয়ের মাধ্যমেই বাংলাদেশিদের দেশাত্ববোধ ও দেশপ্রেমের মাত্রা বাড়াতে হবে। শুধু বিএনপি-জামায়াত কেন, সম্প্রসারণবাদ ও বহিঃশক্তির আধিপত্যবাদ ঠেকাতে সব দেশপ্রেমী দলকে একজোট হতে হবে। দেশ পরিচালনার যথাযথ সিস্টেম উন্নয়নে অন্তর্বর্তী সরকারকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব পালন শেষে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ‘জাতীয় সরকার’-এর প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে দেশপ্রেমী জনগণের এখনই চিন্তাভাবনা করতে হবে; নইলে দূর ভবিষ্যতে দেশ-বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের মতো ভিটে-বাড়ি ছেড়ে মাথায় বস্তা ও পোঁটলা নিয়ে জমির আল বেয়ে বাংলাদেশিরা অন্য কোথাও অজানা গন্তব্যে হেঁটে যেতে বাধ্য হবে না, এর নিশ্চয়তা কোথায়?

(প্রকাশ: ৩ নভেম্বর ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

বর্তমান অবস্থার সোজাসাপটা ফয়সালা

বাংলাদেশ মানেই সমস্যার আধার। কোনো সমস্যাই প্রাকৃতিক নয়– মনুষ্যসৃষ্ট। নিজেদের দুর্মতি ও দুষ্কর্মের ফলে যত সমস্যার সৃষ্টি, দোষ দিই অদৃষ্টের। মানুষ্যসৃষ্ট সমস্যা থেকে পরিত্রাণের একটাই উপায়– আগে নিজেকে ইতিবাচক পরিবর্তন করতে হয়, নিজে পরিবর্তন হলে দেশ আপনা-আপনি বদলে যায়। আমরা নিজেকে বদল না করে অন্যকে বদল হতে বলি। তখন সবকিছু পূর্বাবস্থায় রয়ে যায়। আসলেই এমন উর্বর সুজলা-সুফলা দেশ পৃথিবীতে বিরল। স্বাধীনতার পর থেকেই আমাদের মহান রাজনীতিকরা নিজেরা দুর্বুদ্ধি অর্জন করেছেন; দিনে দিনে জনগোষ্ঠীকে কুবুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধি দিয়ে অতি চালাক ও জন-আপদে পরিণত করে ফেলেছেন। আত্মজিজ্ঞাসার বড় অভাব। যোগ্যতা অর্জন করবো না, অগত্যা হাতের কাছে জবাবদিহিতাহীন রাজনীতিকে ধনী হবার সহজ পথ ভাববো। বিকল্পে অনেকে সহজ পথে নামমাত্র কিছু লেখা ও পড়া শিখে এদেশে মরার জায়গা না পেয়ে অবৈধ পথে বিদেশ যেতে গিয়ে ভুমধ্যসাগরে নৌকা ডুবিতে মরবো, কেউ মরবো দালাল ধরে বিদেশে যাওয়ার নামে বনে-জঙ্গলে আটক হয়ে মুক্তিপণ দিয়ে, বৈধ পথে যাবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারিনি তাই

আমাদের মেধা আছে, মেধার উপযুক্ত চর্চা নেই, পরিবেশ নেই। সবই আমরা অদৃষ্টের ওপর ছেড়ে দিই, অথচ মরি কর্মফলে, দূরদর্শিতার ও জ্ঞানের অভাবে। সবাই বেশি বুঝি, বেশি মাতব্বর। মাতব্বর হতে গেলে দূরদর্শিতার যোগ্যতা থাকা চায়, তা নেই। কেউ কারো কথা বুঝতে ও শুনতে চায় না। বুঝমতো না চলতে চাইলে কী আর করার আছে! ফলে পরিণতি যা হবার তা হয়। এর যৎসামান্য আজ একে একে বলি:

১. বেশ কয়েকদিন আগ থেকেই নতুন দল গঠনের কথা শুনছি; যদিও এদেশে মোট রাজনৈতিক দলের সংখ্যা অগণন, কাকের সংখ্যার সাথে তুলনীয়। অধ্যাপক ড. ইউনুস অতীতে একবার রাজনৈতিক দল গড়ার ঘোষণা দিয়ে পরে পিছিয়ে এসেছিলেন। তার চিন্তায় সুমতি এসেছিল বলে আমারা বুঝি। দুর্মতিতে আবারও ধরবে না, এটাও বিশ্বাস করি। ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধে দায়িত্ব নিয়ে বড্ড দায়তে পড়ে গেছেন বলে অনেকে তাকে অনেকভাবে সমালোচনা করছে। অথচ তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও দায়িত্ব নিয়েছেন; এখন আমরা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করলে এ সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, কথাটা আমরা বুঝতে চাই না। তিনি তো দায়িত্ব নিয়ে দায়তে পড়ে যাননি! দায়িত্ব ছেড়ে দিলে তো আমরা সবাই দায়তে পড়ে

যাব। তবে কিছুসংখ্যক বিতর্কিত লোককে উপদেষ্টা হিসেবে সরকারে নেওয়া ভুল হয়েছে কিনা ভেবে দেখতে পারেন। আবার পনেরো বছর ধরে সোনার সংসার পাতা শেখ হাসিনা ওয়াজেদের অনেক কর্মকর্তা উপদেষ্টাদের অনেকের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে দায়িত্বে অবহেলা করছেন, তাই কাজ হচ্ছে না– এ কথাও তো বাজারে চাউর হয়েছে; সত্যতাও নিশ্চয়ই আছে। দায়িত্বে অবহেলা করা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। ভদ্রতা ও উদারতা দেখানোর কোনো সুয়োগ এখানে নেই।

আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করবে বলে সামাজিক মাধ্যমে খবর বেরিয়েছে। সমীকরণ মিলছে না। সকল পক্ষকে নিয়ে আন্দোলন করে এক দলে পরিণত হয় কী করে? স্ব স্ব দলের রাজনীতি করে এক দলের ছাতার তলে সবাই কি আসবে? বিপ্লবে যারা প্রাণ দিয়েছেন, যারা আমৃত্যু আহত হয়েছেন, সবই কি নতুন দল গঠনের জন্য? হাজামজা দুর্গন্ধযুক্ত-দেশধ্বংসের লুটপাট-বিকৃত রাজনীতি থেকে বেরিয়ে নতুন রাজনৈতিক ধারা প্রবর্তনের জন্য। সমাজ পচে গেলে এখান থেকে বেরিয়ে আসা অতটা সহজ নয়, ঝামেলা সেখানেই: সবার সদিচ্ছা জরুরি। এরা নতুন দল গঠন করা মানে সাধারণ মানুষের সাথে ও যে সব রাজনৈতিক দল সঙ্গে থেকে বিপ্লবে অংশ নিয়েছে, তাদের সাথে নির্মম মশকারা করা। এদেশের চলতি সামাজিক বিশ্লেষণে এটা বলা যায় যে, যারাই ক্ষমতার লোভে নতুন দলে ভিড়বে, আগামী দুই-এক বছরের মধ্যে দলীয় কোন্দলের ফলে দলে ভাঙ্গন সৃষ্টি নিশ্চিত হবে। নতুন দল গঠনের আগে মানুষের সোসিও-সাইকোলজিক্যাল দিকটা ভালোভাবে বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। অনেক ত্যাগ ও জীবনের বিনিময়ে দেশ-মুক্তির বিপ্লব তখন সাধারণ একটা রাজনৈতিক দলে পর্যবসিত হবে। একসাথে যুদ্ধ করে তখন ভাইয়ে ভাইয়ে ভোটযুদ্ধ, গালাগালি, অন্যের ছিদ্রান্বেষণ, সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে এদেশের বিদ্যমান স্বভাবের মতো কাদা ছোড়াছুড়ি শুরু হয়ে যাবে। বিপ্লবীদের তখন মর্যাদা কোথায় থাকবে? সাধারণ ছাত্রছাত্রী, সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে বুড়ো আঙুল দেখানোর শামিল হবে। পতিত শক্তি হাসবে। তার চেয়ে তারা ও অনাগত ছাত্রছাত্রীরা দেশরক্ষা, শিক্ষা ও দেশোন্নয়নের লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ দেশচালকদের ওয়াচডগ ও প্রেসার গ্রুপ হয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দলীয় বৈষম্যবিরোধী অরাজনৈতিক ছাত্রসংগঠন হিসেবে কাজ করে যেতে পারে এবং লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে পারে। দেশে পর পর দুটো জাতীয় সরকার গঠিত হতে পারে। সেখানে ছাত্র-নেতাদের কেউ কেউ অংশ নিতে পারে। তাদের

লেখাপড়া না করে অকালেই বড় রাজনীতিবিদ হওয়ার বাসনা আত্মঘাতের শামিল হবে। ছাত্রছাত্রীরা রাজনৈতিক দল গড়বে এবং অন্তর্বর্তী সরকারের কেউ কেউ সেই দলে যোগ দিয়ে দেশ গড়ার প্রতিজ্ঞা করবেন, বাস্তবে কোনো ফলোদয় হবে না। তারা শতেক দলের অপপ্রচারের মধ্যে হরিয়ে যাবেন।

২. শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে এ কলামে বারবার লিখছি। কোনো লাভ হচ্ছে বলে মনে হয় না। এদেশে যারা মূল্যবান পদে কর্মরত, তাদের পত্রিকা পড়ার অভ্যাস কম। কেউ যদি দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে তদবির করে বিশেষভাবে কোনো লেখা পড়াতে পারেন সেটা আলাদা কথা। নইলে সময় কোথায়! অন্য কোনো দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কাট-পেস্ট করা নয়, বাংলাদেশিদের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, পরিবেশ প্রভৃতি ভিন্ন; অথচ বাংলাদেশিদের জাতীয় সত্তার মধ্যে ভিনদেশী অপসংস্কৃতিকে বাচ-বিচার না করে দেদারসে ঢুকানো হচ্ছে। এতে বাংলাদেশিরা অন্য কোনো জাতিসত্তার সাথে মিশে যাবার উপক্রম হচ্ছে। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থাও আলাদা হতে হবে, যাতে বাংলাদেশিরা আন্তর্জাতিক মানসম্মত সুশিক্ষায়, নীতি-নৈতিকতায়, আদর্শে, দেশপ্রেমে ও কর্মে আলাদা স্বকীয় সত্তায় বিশ্বসভায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে জাতীয় মর্যাদা সমুন্নত রাখতে পারে। প্রথমেই বাংলাদেশিদের জাতি-গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ উদ্দেশের বাঞ্ছিত দর্শন ঠিক-ঠিকভাবে মনে ভিজ্যুয়ালাইজ করতে হবে। তারপর অন্য কাজ। শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তবায়ন ও পরিবেশ নিশ্চিতকরণ প্রধান সমস্যা। জটিল পাঠদান পদ্ধতি, অবাস্তব মূল্যায়ন পদ্ধতিও পরিত্যাজ্য– সাধারণ ও সহজসাধ্য করা সম্ভব। সবকিছুর জন্য একটা যুতসই স্ট্র্যাটিজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন হবে। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও ফলো-আপ প্রক্রিয়া মজবুত হতে হবে; নইলে টাকা খরচ করে সব আয়োজন অতীতের মতোই পণ্ডশ্রম হবে। কোনো বিষয়ের অধ্যায় ও টেক্সট পরিবর্তন কঠিন কিছু নয়; এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া। পাঠ্যক্রমের কাঠামোতে উদ্দেশ্যমতো নমনীয়তা সৃষ্টি, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের অভ্যাস ও স্বভাবের পরিবর্তন বিষয়ে সিদ্ধান্ত অপরিহার্য। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থাকে অঙ্গীভূত করে উভয় শিক্ষাকেই একসাথে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে।

দেশে অনেক কিছু সংস্কার করার পরিকল্পনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ শিক্ষাব্যাবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না; যদিও শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারই অগ্রাধিকারযোগ্য; নইলে অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও শিক্ষাহীনতা অন্য সংস্কারকে পথহারা অন্ধকারের চাদরে ঢেকে দিতে পারে। শিক্ষাব্যবস্থা, নীতি-নির্ধারণ, এর নিয়ন্ত্রণ, পুরো শিক্ষা কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়সাধন, বাস্তবায়ন

প্রভৃতির জন্য একটি শক্ত মেরুদণ্ডসম্পন্ন স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠনের কথা অনেকদিন থেকে বারবার বলা হচ্ছে। বিষয়টি অন্তর্বর্তী সরকারের কানের কতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে, জানা নেই। একমাত্র শিক্ষার উন্নয়নই সব উন্নয়নের চাবিকাঠি বলে এদেশে যারা ভাবেন, তারা সরকারের এই আধা-সংস্কার প্রক্রিয়ায় খুব আশাহত।

৩. বর্তমান বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক পারস্পরিক দোষারোপ, মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন, সীমাহীন অপপ্রচার এদেশের সাধারণ মানুষসহ সবাইকে শঙ্কিত করে তুলেছে। তাদের উগ্র হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন-লিপ্সু শাসন বিস্তারের খায়েশ সেই ব্রিটিশ সরকার এদেশ দখলে নেওয়ার পর থেকে। এদেশে বসবাসরত হিন্দুত্ববাদের গোলাম ছাড়া বিষয়টা প্রত্যেক সচেতন মানুষ বোঝে। এ ছাড়া জাত্যাভিমান ব্রাহ্মণ্যগোষ্ঠীর বর্ণবৈষম্যবাদ রীতি-প্রথা ও বুভুক্ষু আধিপত্যবাদী মানসিকতা পুরাকালের সুলতানি আমল থেকে জাজ্বল্যমান। তাদের এক-পক্ষীয় স্বার্থবাদী স্বভাব সম্বন্ধে দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশই সচেতন। তারা আর্যদের সংস্পর্শে এসে অন্যদের তুচ্ছ জ্ঞান করে। সেজন্য ভারত উপমহাদেশে বসবাসরত অচ্ছুৎ ও যবন নামধারি মুসলমান সম্প্রদায় বরাবরই নিজেদেরকে বর্ণবৈষম্যবাদ ও বহুত্ববাদ থেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছে। একমাত্র এ কারণেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। পরে আমরা পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে গেছি। আমরা ব্রাহ্মণ্যবাদী উগ্র-হিন্দুত্ববাদ থেকে সাধারণ সনাতনী হিন্দুধর্মের লোকজনকে পৃথক করে দেখি, তাদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ি, মিলেমিশে একসাথে থাকি। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদি আর্য সম্প্রদায় উগ্র হিন্দুত্ববাদের বিষ অনার্য হিন্দুসমাজের মধ্যেও ছড়িয়ে একাকার করে ফেলেছে। তাদের মনের ইচ্ছে ভারতবর্ষকে মুসলমানমুক্ত করা। তাই কোনো দেশপ্রেমী বাংলাদেশি তো নিজের অস্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে হিন্দুত্ববাদী আধিপত্যবাদ মেনে নেওয়ার কথা না। অসুবিধা হচ্ছে, হিন্দুত্ববাদের এদেশীয় গোলাম দেশপ্রেমের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রভুদের জন্য উজাড় করে এদেশকে অবিভক্ত ভারত তৈরির বাসনা মনে মনে পুষে রাখলে বাদবাকি মানুষের কীই-বা বলার থাকতে পারে। 'খলের কখনো ছলের অভাব হয় না'। গোলামদের কারণে সৃষ্ট আমাদের দুর্বলতার সুযোগ উগ্র হিন্দুত্ববাদী দেশ পুরোটাই গ্রহণ করেছে। বর্তমানে তারা বাংলাদেশকে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৌশলগত চলাফেরার অবাধ পশ্চাৎভূমি হিসেবে দেখতে চায়; অথচ তাদের গোলাম সিংহাসনচ্যুৎ। এটা তাদের জন্য অসহনীয়। এতে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা বিদ্যমান থাক বা না-থাক, তাদের ও তাদের গোলামদের বিবেচনার বিষয় নয়। এসব স্বার্থ উদ্ধার করতে তারা জোটবদ্ধভাবে ভিন্নপথে

সীমাহীন অপপ্রচারে নেমেছে। এদেশীয় পোষা গোলাম এখন তাদেরই আস্তানায় বসে তাদের তল্পিবাহক হয়ে কাজ করছে।

তাদের উষ্কানিতে আমাদের যুদ্ধবিগ্রহ ও সাম্প্রদায়িক দাংগা না বাধিয়ে সমমর্যাদার ভিত্তিতে একটা প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টাকে সম্মান জানাই। নইলে আগ বাড়িয়ে কিছু না করে কিছুদিন দূরে থাকাই শ্রেয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে বিকল্প পথ খুঁজতে হবে। তারা বর্তমানে যে সরকারই ক্ষমতায় থাক বা ক্ষমতায় আসুক, তাদের গোলামকে এদেশে চাহিদামতো জায়গা না করে দেওয়া পর্যন্ত এ অপপ্রচার ও অত্যাচার অব্যাহতরূপে চলতে থাকবে। স্ট্র্যাটেজিক কারণে গোলামকে এদেশে জায়গা করে দেওয়া যাবে না। এতে ভয়ের কোনো কারণ নেই, তারা হারতে বাধ্য। মিথ্যার ওপর ভর করে বেশিদূর যাওয়া যায় না। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার সমস্ত মানসিক শক্তি একই কাজে ব্যয় না করে নিজেদের প্রতি দেশের জনগণ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার দিকে অধিক মনোযোগ দিতে হবে। তারা বড়জোর পশ্চিমা মুসলিমবিদ্বেষী শক্তির কাছে আমাদের মৌলবাদী বলে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবে। আমাদেরও কুটনৈতিকভাবে সুদক্ষ জনবল সত্য প্রকাশের জন্য জাতিসংঘসহ পশ্চিমা বিশ্বের কাছে পাঠাতে হবে; এদেশে নিযুক্ত হাইকমিশনারদের সাথে বসে যুক্তি দিয়ে সত্য প্রকাশ করতে হবে এবং প্রমাণ করে দেখাতে হবে যে, হিন্দু ধর্মের কেউ কেউ যখন পতিত শক্তির নেতা-পাতিনেতা হয়ে স্বদেশি জনগণের রক্ত চোষে ও বিরোধী দলের প্রতি অন্যায়-অপরাধ-নির্যাতন করে, তারা তখন সে-দলের শক্তিশালী নেতা পরিচয়েই করে। যখনই তারা জন-আক্রোশের শিকার হয় বা বিচারের সম্মুখীন হয়, তখন তারা সংখ্যালঘু পরিচয় দিয়ে পানি ঘোলা করে। এদেশে হিন্দু ধর্মের জনগোষ্ঠী ছাড়াও অন্যান্য আরো সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মিলেমিশে বসবাস করে, তাদের ওপর তো কোনো নির্যাতনের অভিযোগ কখনো ওঠে না। সুতরাং ভারতের দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বানোয়াট বলে বিবেচিত। প্রকৃত সত্য হলো: হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে ভারতকে নিজের দেশ এবং এদেশকে শশুরের দেশ বলে মনে করে। এটা তাদের মানসিক বিকৃতি।

(প্রকাশ: ১২ ডিসেম্বর ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

আসুন সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী ও কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ি

(প্রকাশিত শিরোনাম: আসুন কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ি)

আমি রাজনীতিক নই, রাজনীতিবিজ্ঞানের ছাত্রও নই; রাজনীতিকদের ভাবনা-চিন্তা ও কার্যকলাপ দেখার জন্যই সম্ভবত এদেশে জন্মেছিলাম, তা করে যাচ্ছি। মনে প্রশ্ন জাগে, রাজনীতির উদ্দেশ্য কী? আমার ধারণা জনসেবা, জনকল্যাণ ও কল্যাণ রাষ্ট্র গড়াই রাজনীতির উদ্দেশ্য। আমরা কি জনকল্যাণ রাষ্ট্র গড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে রাজনীতি করছি? খোলা চোখেই দেখতে পারি। জনকল্যাণ কথাটা বক্তেব্যের আগে একবার, পরে একবার ধুয়োজারির মতো বলি। বাস্তবে আমরা জনকল্যাণ থেকে অনেক দূরে; নিজ কল্যাণ ও দলকল্যাণ করি। নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করে দেখি, যত সরকার এ পর্যন্ত দেশ চালিয়েছে, কোন কোন সরকার জনকল্যাণের উদ্দেশ্য নিয়ে জনগোষ্ঠীকে সুশিক্ষিত ও দেশ গড়ার জন্য রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে? সর্বোচ্চ দু-একটা পাওয়া যেতে পারে। আবার রাজনীতিকদের উদ্দেশ্যের কথা বললে আগেই প্রশ্ন আসবে– জাহেরি উদ্দেশ্য, না বাতেনি উদ্দেশ্য? এদেশের এটাই তো সমস্যা। চুন খেয়ে যাদের গাল পুড়েছে, দই দেখলেও তারা নাকি ভয় পায়। অধিকাংশ রাজনীতিকের মুখে এক, অন্তরে আরেক। গদি আঁকড়ে ধরার ও জনগণের সম্পদ নিজের করে নেওয়ার জন্য কত যে সীমাহীন চেষ্টা, ক্ষমতায় না যাওয়া পর্যন্ত কোনোভাবেই বোঝা যায় না। আমি কিন্তু পরচর্চা করছি না, বাস্তবতা তুলে ধরছি। কারো কারো মতে চব্বিশের আগস্টে আমরা ছাত্র-জনতা ও বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের সহস্রাধিক জীবনের বিনিময়ে বুক থেকে জগদ্দল পাথর নামিয়ে দ্বিতীয় স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমার ভয় হয়, আমরা যেহেতু আত্মবিস্মৃত রাজনীতির দিশারি, অল্প দিনেই তা ভুলে না যায়! এখনকার করণীয় বিষয় নিয়েই এ লেখা।

আমরা সুশিক্ষিত মানুষ ও কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ার মজবুত ভিত যদি এবারও বিনির্মাণ করতে না পারি, নিঃসন্দেহে আবারও জনদুর্ভোগ ও দেশলুট অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে থাকবে। কারণ সাধারণ মানুষ দুর্বিসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য অনেক জীবনের বিনিময়ে আবার আশায় বুক বেঁধেছে। পার্থক্য হলো স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যত সংখ্যক দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক নেতা-কর্মী এদেশে জন্মেছিল, তার চেয়ে দুর্নীতিবাজ নেতা-কর্মী চৌষট্টি গুণ বেড়েছে; অধিকাংশ দলের বিপুলসংখ্যক লোক জনআপদে পরিণত হয়েছে। এছাড়া দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তা ও সুবিধাবাদী ব্যবসায়ী বেড়েছে ব্যাপকহারে। যাদের অন্তরে কোনো দেশপ্রেম নেই, সততা ও মনুষ্যত্ব নেই; তারা দেশসেবা ও জনসেবা করবে কীভাবে? মূলত শূন্যে ভর করে

দালানকোঠা তৈরি করা যায় না; অথচ আমরা বারবার তা করার চেষ্টা করি। আমরা মানবসম্পদ শব্দটা বলি, কিন্তু বুঝে বলি না। শুনি, ন্যাড়া নাকি একবারই বেলতলায় যায়; আমরা বারবার বেলতলায় যায়। এবারও কি তাই হবে? নইলে নির্বাচন নিয়ে এত তাড়াহুড়ো কেন? রাজনীতিকদের মাথায় দেশের গন্তব্য নিয়ে যে উদ্দেশ্য সেট হয়ে আছে, সেটাকে একটু উঁচুতে নিয়ে রি-সেট করা যায় না? তাদের উদ্দেশ্য ও দূরদর্শিতার ব্যাপ্তি প্রকাশ্যে জানাতে হবে। দেশের দুর্নীতিবাজ, লুটেরাদের মূলোচ্ছেদ করা কি এতই কঠিন? শুধু দলগুলোর সদিচ্ছা প্রয়োজন।

দলমত নির্বিশেষে (পরাজিত শক্তি বাদে) দেশের নব্বই শতাংশ নেতা-কর্মী মতলববাজ ও দুর্নীতিবাজ বলে আমার অনুমান। আলাদা মতলব নিয়ে তারা রাজনীতিতে ঢোকে এবং মতলব হাসিলের জন্য তারা রাজনীতি করে। কুড়ি গণ্ডা দলের মধ্যেই তো তারা আছে। মুখে যত কথাই বলুন, তারা এ জাতীয় অশিক্ষিত-দুর্নীতিবাজ লোক নিয়ে ভবিষ্যতে রাজনীতি করে কীভাবে জনকল্যাণ করবেন ও কল্যাণ রাষ্ট্র গড়বেন? আমার মাথায় আসে না। আসলে আমড়া গাছ থেকে কি সুমিষ্ট আম পাওয়া যায়? তবুও আমরা সাধারণ মানুষকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য তা-ই দীর্ঘদিন ধরে করে আসছি। উচিৎ কথা যে-ই বলবে, সে-ই খারাপ। এদেশ থেকে আত্মজিজ্ঞাসা উঠে গেছে। আমি নিশ্চিত, রাজনীতি যতদিন সুশিক্ষিত মানুষের বিচরণক্ষেত্র না হবে, সাধারণ মানুষ ও দেশ ততদিন সেবা-বঞ্চিত হবে। সেক্ষেত্রে শিক্ষিত সমাজ ও কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রত্যাশা অরণ্যে রোদন হতে বাধ্য। সেজন্যই সংস্কার শুধু খাতা-কলমে ও বইতে থাকলে চলবে না, আগে দেশ পরিচালকদের মগজকে সংস্কার করতে হবে।

রাজনীতিতে শুধু দশ-বিশ জন নেতা সৎ ও যোগ্য হলেই চলবে না, তাদের মতলববাজ ও দুর্নীতিবাজ লাখ লাখ নেতা-কর্মী, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের খোল-নলচে বদল করার মতো সৎসাহস ও মানসিকতা থাকতে হবে। বর্তমান সংস্কারের মৌসুমে আগে 'মহান' ও 'চিরমহান' রাজনীতিকদের অন্যায় কাজের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে। কথাটা তো বারবার লিখছি ও বিভিন্ন ফোরামে বলছি, পজিটিভ সাড়া পাচ্ছি কই? হাজার হাজার প্রাণের ও সহস্রাধিক জীবন্মৃত ছাত্র-জনতার ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বিজয়কে কোনোভাবেই ঠুঁটো-জগন্নাথ ও 'ভুলে-যাওয়া বিপ্লব' বানাতে দেওয়া যাবে না। যে কোনো মূল্যে জনসাধারণের ও দেশের মুক্তি এবং কল্যাণ নিশ্চিত করতেই হবে। 'কুঁতে মরবে হাঁস আর ডিম খাবে দারোগা বাবু', তা কী করে হয়? রাজনৈতিক দল অন্তর্বর্তী সরকারকে সহযোগিতা করছে জানি; কিন্তু এবার

নির্বাচনের রোডম্যাপ চাওয়ার আগে প্রত্যেক দলের দুর্নীতিবাজ, লাঠিয়ালবাজ, ভাওতাবাজ নেতা-কর্মীরা দল থেকে বহিষ্কৃত হোক, তা দেখতে চাই। রাজনীতিতে টাকার খেলা ও চড়া দামে বিভিন্ন পদ বিক্রি বন্ধ করতে হবে। এর ফলে সুশিক্ষিত লোক রাজনীতিতে আসবেন। দেশ গড়ার জন্য প্রকৃত সহযোগিতা করবেন। রাজনীতি করবেন, আবার রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য ও নীতি জলাঞ্জলি দেবেন, তা কীভাবে হয়?

আমি বিভিন্ন সংস্কার কমিটিকে অনুরোধ করবো আধা-খেঁচড়া সংস্কার না করতে। প্রয়োজনে সংস্কার গণভোটের মাধ্যমে অনুমোদন করিয়ে নিন। নির্বাচন মানে রাজনীতিকদের যা খুশি তা-ই করার অনুমতি এদেশের মানুষ দেয় না। রাজনীতিকদের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা লিখিত আকারে থাকতে হবে। সংস্কার যেহেতু একটা চলমান প্রক্রিয়া, একবারে সব শেষ করা যাবে না। অন্তত সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী ও কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের মজবুত একটা ভিত তৈরি হোক। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করা মানেই সুশিক্ষিত সমাজ ও কল্যাণ রাষ্ট্র গড়া নয়– উন্নয়নের পূর্বশর্ত মাত্র। এর আগেও অন্তত তিনবার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন হয়েছিল, আমরা কল্যাণ রাষ্ট্র গড়তে পরিণামে ব্যর্থ হইনি কি? বারবার 'সুপ্রিম কাউন্সিল' গঠনের কথা বিভিন্ন পত্রিকায় লিখছি ও বিভিন্ন ফোরামে বলছি, কোনো রাজনৈতিক দল তো সমর্থন করছে না? রাজনৈতিক কার্যকলাপ, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনার জন্য এবং রাষ্ট্রের পুরো ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এটা জরুরি। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এটা গঠন করতেই হবে। সমাজের পরতে পরতে সীমাহীন ঘুস-দুর্নীতি, মিথ্যাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে গেছে। সরকার ও সমাজের প্রতিটা কাজে আধুনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমাজের প্রত্যেক মানুষকে সুশিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যাবস্থার উন্নতির সাথে তাল রেখে উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করতে হবে। সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নয়ন একই সুতার বন্ধনে বেঁধে ফেলতে হবে। এরও পথ ও পদ্ধতি আছে। এ বিশ্বে যত সমস্যা আছে, তার সমাধানও আছে। আমরা গুরুত্ব দেই না বা সমাধানের চেষ্টা করি না। একজোট হয়ে কাজ করি না, শুধু নিজেদের মধ্যে পচা কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করে ক্লান্ত হয়ে যায়, উদ্দেশ্যচ্যুৎ হই এবং প্রতিপক্ষকে আবার উপযুক্ত সুযোগ তৈরি করে দিই। সবই আমাদের অনুবিদ্ধ স্বভাব। বহিঃশক্তির আগ্রাসন ঠেকাতে সব দল ঐক্যবদ্ধ হতে চায়; দুর্নীতিবাজ ও জনসম্পদ লুটেরাদের দল থেকে বহিষ্কার করার ঘোষণা দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হই না কেন? সুশিক্ষিত-সৎ লোকগুলো রাজনীতিতে আনার

জন্য ঐক্যবদ্ধ হই না কেন? যারা আন্দোলনে জেল-জুলুম ভোগ করেছে, দলে তাদের অগ্রাধিকার থাকাটা বাঞ্ছনীয়। তবে তাদের দুর্নীতি ও অন্যায় কাজ থেকে তো নিষ্ক্রিয় করা যায়। তা তো আমরা করি না।

সুশিক্ষিত সমাজ, সুশিক্ষিত দেশচালক, উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা– বাঞ্ছিত জনসেবা ও কল্যাণ রাষ্ট্র। সুশিক্ষিত বলতে আমি জীবনমুখী শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা ও মানবতাবোধ-সঞ্চারক শিক্ষার সম্মিলন বুঝাতে চাচ্ছি। মানবতাবোধ-সঞ্চারক শিক্ষা বলতে দেশীয় মূল্যবোধ, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, জাগ্রত বিবেকবোধ, দেশপ্রেম ইত্যাদি মনুষ্যত্বসম্বলিত শিক্ষাকে বুঝাচ্ছি। কল্যাণকামী রাষ্ট্র গড়তে আসুন আমরা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন মাত্রায় এসব শিক্ষার সন্নিবেশ ঘটাই। প্রথমেই সুশিক্ষিত মানুষ ও সমাজ গড়ি। দেশপ্রেমে উজ্জীবিত, নীতিবান ও দূরদর্শী রাষ্ট্রচালকদের গড়ি। মন-মানসিকতার উন্নতি করি। প্রথমেই সবাই মিলে কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ার একটা টার্গেট নির্ধারণ করি। লক্ষ্যে পৌঁছতে দীর্ঘমেয়াদী টার্গেটকে সাব-টার্গেটে ভাগ করি। প্রতিটা পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা মজবুত করি। একটা কাজও কঠিন কিছু নয়। তার আগে দেশকে লুটেরা বাহিনীমুক্ত দেশ ও সমাজ তৈরি অপরিহার্য। এ কাজগুলো না করে যে যতই ফাঁকা বুলি আওড়াক না কেন, এদেশের শিক্ষিত ও সচেতন সমাজ দেশগড়ার আপ্তবাক্য আদৌ বিশ্বাস করবে না; কাজের কাজও হবে না।

অন্তর্বর্তী সরকারকে বলি: দেশের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দুর্নীতিতে ছেঁয়ে গেছে, এখনো যে কোনো সেক্টরে দুর্নীতি হচ্ছে না– এটা হলফ করে বলা যাবে না; খতিয়ে দেখুন। একমাত্র কঠোর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং নতুন করে মানুষ গড়া ছাড়া নিস্তার পাওয়া দুঃসাধ্য। কোনো রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় এসে তাদের চাটার দল ও তোষামোদকারিদের স্বার্থে দুর্নীতিমুক্ত দেশের ডাক দেবে না। সেটা মাথায় রেখে বর্তমান সরকারকে এখনই কাজ করতে হবে। বাজারে দ্রব্যমূল্যে আগুন কেন? বাণিজ্য উপদেষ্টা প্রকাশ্যে যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিন। অন্তর্বর্তী সরকারের মৌন সম্মতিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রছাত্রীদের কোনো রাজনৈতিক দলের গোড়াপত্তন করা হয়তো ভুল হবে। তারা লেখাপড়া করবে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাদের একটা তালিকা থাকবে, তারা হবে অরাজনৈতিক সংগঠন। তালিকাটা ক্রমেই বাড়বে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা শেষে তারা নিজ নিজ পেশায় চলে যাবে; কেউ মনে করলে তার নাম অরাজনৈতিক তালিকা থেকে কাটিয়ে পছন্দমতো রাজনীতিতে ঢুকতে পারবে। দেশের প্রয়োজনে ডাক দিলেই যে যেখানে থাক একত্রিত হবে। তারা যে কোনো

নতুন সরকারের জাগ্রত তত্ত্বাবধায়ক, দেশ ও জনস্বার্থের পাহারাদার হবে। এদেশ আর নতুন রাজনৈতিক দল চায় না। দেশ এখন মানুষের মতো সুশিক্ষিত মানুষ চায়।

শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ড. ইউনুসকে বলবো, 'এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার'। এবারই দেশের উন্নয়ন ও টিকে থাকা, নইলে বিলীন হবার যথেষ্ঠ আশঙ্কা। আগে আগেই নির্বাচনের রোডম্যাপ দেওয়া ঠিক হবে না। উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে কোনো দুর্নীতিবাজ, মতলববাজ আছে কি-না চিরুনি দিয়ে বেছে পরিশুদ্ধ করুন। অকর্মা লোকও থাকতে পারেন, বিদায় করুন। প্রয়োজনে কিছু নতুন নিয়োগ দিন। সংস্কার প্রক্রিয়া পুরোদমে চলুক। সাথে প্রতি সপ্তাহে অবশিষ্ট উপদেষ্টাদের মনমতো করে নিজে কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রশিক্ষণ দিতে থাকুন। পতিত সরকারের প্রত্যেক দুর্নীতিবাজ, অপরাধী ব্যক্তির ও তাদের সহযোগীদের আগে উপযুক্ত বিচার করতে হবে। তারপর তাদের রাজনীতি করার অধিকার আছে, কি নেই বিবেচনা করা যাবে। আমি অনেক বড় বড় অপরাধির নামে ঠুনকো কেস দিয়ে রাখার কথা শুনছি। প্রতিটা কেস একাধিক আইনজীবী দিয়ে এখনই পরীক্ষা করানো ও করণীয় ঠিক করা হোক। অপরাধীদের গ্রেফতার অনেকটা মন্থর হয়ে এসেছে। এগুলোও লুটের ও পাচারের টাকা ভাগের একটা কৌশল। সরকারি অফিস থেকে দুর্নীতিবাজদের ঝেটিয়ে বিদায় করুন। মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পচে গেলে আমরা অসহায় হয়ে পড়ি। পুরো সমুদ্রভরা পানি, কিন্তু এক ফোঁটাও খাবার যোগ্য নয়। পরীক্ষিত অপরাধী, লুটেরা, হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারকারি, হত্যা-গুমের সাথে জড়িত কোনো ব্যক্তি যেন টাকা খরচ করে গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে সাধুবেশে এদেশে রাজনীতি করতে ঢুকতে না পারে; এ বিষয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রসমাজের সতর্ক থাকতে বলবো। সময় থাকতে সাধু সাবধান!

(প্রকাশ: ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ;
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

রাজার দৃষ্টি উপেনের দুই বিঘা জমির ওপর

জীবন উপান্তে দাঁত পড়া, কোমর নুয়েপড়া অসংখ্য বন্ধুদের সারাদিনের সান্নিধ্য, হইচই কার না ভালো লাগে! বন্ধুদের সবাই অন্তত নানা-দাদা হয়েছে। মেয়ে-ক্লাসমেটদের সবাই নানি-দাদি ছাড়াও বুড়িমা হয়ে গেছে। আড্ডায় নাতি-পুতিদের নিয়ে গল্পই বেশি। প্রায় সবাই ডায়াবেটিস ও বুকের রোগী, কারো কারো জীবন রক্ষার তাগিদে বুক-ফাড়া পর্ব আগেই শেষ। বছর ঘুরতেই অনেকে জীবনের মায়া কাটিয়ে পরপারের অজানা গন্তব্যের যাত্রী হচ্ছে বলে নিত্য খবর আসছে। এমন প্রতিটা খবর নিজের রোজ-কেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এসব খবরে বন্ধুত্বের বন্ধন মজবুত হয়। শেষ-বয়সী বন্ধুদের জীবনের বেলাশেষে একসাথে অনেককে নাগাল পাওয়া নিতান্তই সৌভাগ্যের ব্যাপার। এ গল্পদাদুর আসর বসাতে পিকনিকের নামে বিজয় দিবসের ক'দিন আগে গেলাম ঢাকার অদূরে আমিনবাজারের ব্রিজ পার হয়ে আরেকটু পশ্চিমে হাইওয়ে-সমতল কচিপল্লবিত, গাছগাছালিতে ভরা মধুমতি মডেল টাউনে। প্রজেক্টের উত্তর পাশ দিয়ে ঢাকা-আরিচা হাইওয়ে বয়ে গেছে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, ভেতরে অসংখ্য বাড়িঘর, গাছগাছালিতে ঘেরা, আধুনিক সুবিধাসজ্জিত আবাসন, শেষ জীবনে মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই, ভালোলাগার মতো একটি জায়গা।

দেখে মনে হলো– কোথায় মডেল টাউন? এ তো জনবসতিতে ভরা আদর্শ গ্রাম! ভেতর দিয়ে অসংখ্য প্রশস্ত রাস্তা, রাস্তার দুপাশে গাছ সারি সারি; বনজ, ফলজ ও ঔষধি গাছপালা মিলে অগণন, লক্ষ লক্ষ। প্রজেক্টের মাঝখান দিয়ে পূর্ব-পশ্চিম আড়াআড়ি বয়ে গেছে পানি প্রবাহের প্রশস্ত ব্যবস্থা, লেক বললেও অত্যুক্তি হবে না, বর্ষা মৌসুমে বন্যার পশ্চিম-পাশের পানি পুবের বুড়িগঙ্গায় পার করে দেওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা। লেকের ওপর ব্রিজ দুপাশের জনবসতির সেঁতুবন্ধ রচনা করেছে। আমাদের একজন বন্ধু জীবনের শেষ ঠিকানা এখানে তৈরি করতে পেরেছে; সেটাকে আশ্রয় করে এ বুড়ো-সমাবেশের আয়োজন। এ বয়সে বিভিন্ন রোগে ভোগার কারণে খাবারের দিকে আকর্ষণ সবারই কম। গল্প ও দীর্ঘ বছর পর একে অন্যকে পেয়ে প্রাণখোলা আলিঙ্গনের ঘাটতি নেই। বিকাল হতেই কয়েক বন্ধুকে নিয়ে পুরো প্রজেক্টটা ঘুরেফিরে দেখলাম। এর আগেও এসেছি; এবার বুড়ো বন্ধদের সাথে নিয়ে বেড়ানোর মজাটাই আলাদা। একটা দোকানে বসে চা খেলাম। চায়ের তপ্ত ঘ্রাণে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। জীবনের প্রতিটা পর্বেই নতুনত্বের পরশ, নতুনের সন্ধানে চিরনতুনের অবিরাম অভিসার। ঘটনার বর্ণনা দিতে জীবন দর্শন আওড়াচ্ছি।

হঠাৎ চমকে উঠলাম গত ২১ ডিসেম্বর মধুমতি টাউনের সামনে মানববন্ধনের ছবি সম্বলিত পত্রিকার খবর পড়ে, যমুনা টিভিসহ অন্যান্য টিভি-পর্দায় সচিত্র সংবাদ দেখে। ভাবলাম, এখানে বসবাসরত পুরুষগুলো কী এমন অকূল পাথারে পড়লো যে, এই শৈত্যপ্রবাহের মধ্যে ছোট-মাঝারি বয়সের ছেলেমেয়েসহ পরিবার-পরিজন নিয়ে মানববন্ধনের নামে সারিবদ্ধ হয়ে ব্যানার হাতে রাস্তার পাশে দাঁড়াতে হলো 'তোমারে পাছে সহজে বুঝি তাই কি এত লীলার ছল, বাহিরে যবে হাসির ছটা, ভিতরে থাকে আঁখির জল'। পিকনিকের দিন বুঝতে পারিনি, এত লীলা ও ভোগান্তি এর মধ্যে লুকিয়ে আছে। সামাজিক ভোগান্তি ঘুরেফিরে সাধারণ মানুষের, প্লট-ক্রেতাদের কাঁধে। রাজউক 'মধুমতি মডেল টাউন' উচ্ছেদ করতে চায়। 'জলাভূমির পরিবেশ গড়তে' ঢাকার অদূরে গড়ে ওঠা প্রাকৃতিক পরিবেশসমৃদ্ধ অনুপম আবাসন প্রকল্প ধ্বংস করতে চায়। এরা তো সরকারি জমি জাল দলিল করে দখলে নেয়নি। কিস্তি আকারে টাকা দিয়ে বৈধ আবাসন কোম্পানির কাছ থেকে জমি কিনেছে। কোম্পানিও কোনো খাস জমি দখলে নিয়ে মাটি ভরাট করে বিক্রি করেনি। বরং ২০০৭ সাল পর্যন্ত সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, যেমন– পানি উন্নয়ন বোর্ড, ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ, তিতাস গ্যাস এন্ড ট্রান্সমিশন, ঢাকা ওয়াসা, পল্লী বিদ্যুৎসহ সরকারের অন্তত ৮টি বিভাগ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ছাড়পত্র দিয়েছিল। মূলত এসব দেখেই ক্রেতারা প্লট কিনেছিলেন। খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের অধিকার নাকি এদেশের সাংবিধানিক অধিকার! এতে ক্রেতাদের অপরাধটা কোথায়? আজব দেশ বটে! মধুমতি মডেল টাউন ছাড়াও হাইওয়ের দু-পাশ বেয়ে সাভার পর্যন্ত অসংখ্য জায়গায় নীচু জমিতে মাটি ভরাট করে উপশহর গড়ে উঠেছে। প্রকল্পের পাশেই মাটি ভরাট করে গড়ে উঠেছে ডেসকো এবং তিতাস গ্যাসের সুবিশাল পাওয়ার ও গ্যাস বিতরণ কেন্দ্র। সেসব জায়গায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আবাসন কর্তৃপক্ষের বোঝাপড়া হয়ে গেছে। যত বিপদ মধুমতি আবাসনে প্লট ক্রেতাদের ঘাড়ে। সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সমাজকর্মই আমার ধর্ম; তাই এ লেখা।

ঢাকা শহরের চারপাশ জলাভূমি, নদ-নদী-খালে ভরা। ভরাট না করলে বসতবাড়ি গড়বে কীভাবে? এত নদ-নদীর খাস জমি দখল করে দিনে দিনে সময়ের পরিক্রমায় ভরাট হয়ে চোখের সামনে বড় বড় বহুতলবিশিষ্ট ইমারত গড়ে উঠলো। খাস জমির অবৈধ দখল বৈধ হয়ে গেল। একথার উত্তর কী? তখন পরিবেশবাদীরা কোথায় ছিলেন? আমি 'রাজউক' শব্দের মধ্যে 'রাজা' শব্দের গন্ধ খুঁজে পাই। নিজের নীচু-জমি মাটি ভরাট করে আবাসন গড়লেই আইনের শত ফাঁক-ফোকর,

মারম্যাচে ঘোল খাইয়ে ‘রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি’। এখানে কমপক্ষে সাড়ে তিন হাজার প্লট আছে। বড় জোর একশ প্লট ধনী পরিবারের হবে। বাকি প্লট সবই ঢাকায় চাকরি করতে আসা চাকুরে কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর ছা-পোষা মানুষের মাথা গোজার একটু ঠাঁই তৈরির জন্য ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে মাসে মাসে কিস্তি দিয়ে জীবনের শেষ অবলম্বন গড়ার চেষ্টা। আবাসন প্রকল্পের মালিকের কাছে শোনা কথা: বিভিন্ন উপলক্ষ্যে, নানা অজুহাতে সরকারের বিভিন্ন সেক্টর আবাসন প্রকল্পের অনুমতি নিতে গাদা-গাদা টাকা মালিক পক্ষ থেকে সুকৌশলে আত্মসাৎ করেছে। এভাবেই ঢাকা শহরের আবাসন গড়ে উঠেছে। ঢাকা শহরে এত কিছু হয়েছে, তবুও এ প্রজেক্টের শেষ অনুমতির কাজটা হয়নি। নিশ্চয়ই আবাসন-পক্ষ আটকপালে, এদেশের বাতাস বোঝে না; হয়তো যথাযথ জায়গায়, যথাসময়ে, যথাপরিমাণ দেনা-পাওনা মেটানো সম্ভব হয়নি, তাই। এজন্য রাজউকের খড়গ এখনো মাথার ওপর ঝুলছে।

দূর অতীতে আমরা গুলশানের পূর্ব-পার্শ্বে বাড্ডা এলাকা সুদীর্ঘ বছর অননুমোদিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। তারও সদ্‌গতি একদিন হয়েছিল। কারণ ঢাকা শহর বিস্তারের কমপক্ষে পঁয়তাল্লিশ বছরের স্মৃতি আমাকে নাড়া দেয়। শহরের চারপাশ বিল-খাল, নদী-নালা, জলাশয়ে ভরা ছিল, নৌকা ছাড়া চলা যেত না। সবই ভরাট হয়ে শহরে রূপ নিয়েছে। এর বিকল্পও ছিল না। অনেকেই আইন মেনে করেনি। বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ মানবিক ও আইনগত বাধা। এ শহরের সব আবাসন প্রকল্পের আইনগত সমস্যা ‘ম্যানেজড’ হয়ে গেল; এতে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হলো না, অথচ পরিবেশ আইনজীবী সমিতির (‘বেলা’) বিদঘুটে-লুকানো শতেক আইনের মারপ্যাচে শেষতক এসে মধুমতি মডেল টাউনের ‘ভাঙা পা খালে পড়লো’। শিক্ষাঙ্গন মাস্টারসাহেবদের দখলে থাকাটাই স্বাভাবিক। সেমতো কোর্ট-কাচারি-আইন ‘পরিবেশ আইনজীবী সমিতি’র অধিকারভুক্ত হওয়ারই কথা। তাদেরকে বশে না এনে আবাসনের পরিবেশ বিষয়ে অনুমতি পাওয়া আকাশকুসুম কল্পনা বই আর কিছু না। এ ভুল আবাসন-প্রকল্প কোম্পানির। অবশেষে এতে আবাসন প্রকল্পের মালিকপক্ষের তেমন কোনো ক্ষতি নেই, তারা তাদের জমি টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে নিরুপায় হয়ে বিদেশ পাড়ি দিয়েছে। ক্ষতি ‘ব্যাঙের আধুলি’র ধারক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের, যারা এ প্রকল্পে জমি কিনেছে। এটাকে প্রকৃতির নির্মম পরিহাস না বলে ‘অভাগা ছা-পোষা কাঙাল যেদিকে চায়, সাগর শুকিয়ে যায়’ দশা বলাই যথোপযুক্ত। এটা ‘পরিবেশ আইনজীবী সমিতি’কে বুঝতে হবে; আইন তো তাদের হাতেই ঘোরেফেরে।

অনেকেই জমিতে টাকা ব্যয় করেছে পনেরো-বিশ বছর আগে। কত সৌভাগ্য! এতদিনে পুরোটাই এখন লোকসান যেতে বসেছে। হাজার হাজার সাধারণ পরিবারের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হতে চলেছে। সাধারণ মানুষ জমি কিনেছিল মধুমতি মডেল টাউন বৈধ কোম্পানি কিনা, তা দেখে। জমি রেজিষ্ট্রি করে, নাম পত্তন করে খাজনা দেওয়াও চলছিল। হঠাৎ 'সাজানো ফুলের বনে ঝড় বয়ে গেল'।

এ প্রকল্পের চার বর্গকিলোমিটার জমির মাটি উঠিয়ে ফেলে জলাভূমি না তৈরি করলে ঢাকা শহরের 'পরিবেশ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা' (?) দেখা দিচ্ছে। রাজউক বিশ হাত মাটি উঠিয়ে নিয়ে একজনের জমি জলাভূমি করে দিল। তিনি তার জমিতে আবার বিশ হাত মাটি ভরাট করে আবার বাড়ি তৈরি করলেন, গাছ লাগালেন, কারো কোনো কিছু বলার আছে? তার জমিটা নিতে গেলে সরকার বর্তমান বাজার দামের কমপক্ষে দ্বিগুণ দামে জমিটা অধিগ্রহণ করতে হবে। হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে অধিগ্রহণ করে সরকারের কী লাভ? বরং হাজার হাজার পরিবারকে ঘরছাড়া করা হবে। সরকার সুস্থ চিন্তা করলে নিশ্চয়ই তা করবে না। একটি বেসরকারি পরিবেশ সংস্থার প্ররোচনা ও মামলার প্রেক্ষিতে এ নিদারুণ ও অবাস্তব বৈষম্যের শিকার এ আবাসন প্রকল্পের সব প্লটহোল্ডার।

এত বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন, তবুও বৈষম্যের অপনোদন হচ্ছে কই? এর শেকড় অনেক গভীরে। সাধারণ মানুষের হতাশা আর কীভাবে আসতে পারে! 'বেলা' কর্তৃক প্রকল্প এলাকাকে বন্যাপ্রবাহ এলাকা হিসেবে প্রচার করে আদালতকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে, বন্যাপ্রবাহ এলাকার দাবি আদৌ সত্য নয়। উক্ত মৌজার কোনো জমির রেকর্ডপত্রে এবং পর্চায় বন্যাপ্রবাহ এলাকা বলে ঘোষণার কোনো উল্লেখ নাই। এমনকি সিএস, আরএস পর্চাসমূহে সুস্পষ্টভাবে জমিগুলো ব্যক্তি-মালিকাধীন নাল জমি হিসেবে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে। রাজউকের ওপর নির্দেশনা মতে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য হাজার হাজার গাছপালাসমৃদ্ধ আধুনিক গ্রাম– এসব কেটে ফেলে পনেরো-বিশ ফুট মাটি তুলে অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলতে হবে। অর্থাৎ এ এলাকায় অপ্রয়োজনীয় 'পরিবেশ রক্ষা'র নামে প্রয়োজনীয় গাছপালা কেটে, মাটি অন্য কোথাও দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পরিবেশ বাঁচাতে হবে। এতে জমি-ক্রেতাকে হাজার হাজার কোটি টাকা অধিগ্রহণ বাবদ দেওয়া এবং হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে মাটি কেটে সরানোর উপকারিতা কী? সরকার কস্ট-বেনিফিট এ্যানালাইসিস নিশ্চয়ই করবে। শুধু সাড়ে তিন হাজার পরিবারকে ঘরছাড়া ও ভিটেশূন্য করার মধ্যে কি শান্তি লুকিয়ে থাকতে পারে, আমার চিন্তার বাইরে। অনেক দূর থেকে বালি ও মাটি এনে ঢাকার চারপাশ ভরাট

করে আবাসন গড়ছে, কেবল এখানেই শুনলাম, রাজউকের প্রতি আদেশ হয়েছে চার বর্গকিলোমিটার উঁচু এলাকার মাটি ও গাছ কেটে জলাভূমি তৈরি করতে হবে। কত অবাস্তব আদেশ-নির্দেশ। শেষ বয়সে এসে এমন উদ্ভট কাণ্ডকারখানার পরিকল্পনা আর কত দেখবো! জানিনা, কেন এত বৈষম্যমূলক কর্মকাণ্ড। ঢাকা শহরের চারপাশ সরকারি আবাসিক প্রকল্পসহ শত শত বেসরকারি আবাসিক প্রকল্প নীচু জমি ভরাট করেই চোখের সামনে আবাসন গড়ে উঠলো। আইন-কানুনের মারপ্যাচ শুধু মধুমতির ভাগ্যকে দুর্ভাগ্যে পরিণত করলো। হাজার হাজার মধ্যম আয়ের ছা-পোষা মানুষের 'নিজের বাড়ি' নামের স্বপ্ন দিবাস্বপ্নে পরিণত হতে চলেছে। সবই পরিবেশবাদী আইনজীবী ও কর্তাবাবুদের মর্জি।

অন্তর্বর্তী সরকার এ বিষয়টা সুরহা করতে কোনো সহযোগিতা করতে পারে কিনা? আমি অনুরোধ করবো বর্তমান পরিবেশ উপদেষ্টা, যিনি বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ফসল, প্রধান উপদেষ্টাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন প্রকল্পটা ঘুরে দেখে আসুন। ইতিবাচক কিছু করার থাকলে করুন। এত বিশাল চার বর্গকিলোমিটার জমির মাটি সরকারের টাকা ব্যয় করে সরিয়ে ফেলা কি সম্ভব? লক্ষাধিক গাছ কেটে ফেললে, সাধারণ মানুষকে বিনা প্রয়োজনে উৎখাত করলে কি পরিবেশের ক্ষতি হবে না? 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের' আইন ও এর প্রয়োগ এদেশে কোথায়?

(২৬.১২.'২৪ দৈনিক শিক্ষা বার্তা এবং ২৭.১২.'২৪ দৈনিক মুক্তবাংলা পত্রিকায় মতামত কলামে প্রকাশিত)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ;
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

মানসিকতার উন্নতি ছাড়া দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নতি সুদূরপরাহত

আমাদের সমাজে কোনো মানুষকে আর্থিকভাবে সৎ হতে দেখলেই তাকে আমরা সৎলোক বলে প্রচার করি। সততার অনেক উপাদানের মধ্যে তিনি একটি গুণাবলির ধারক মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সততার উপাদানগুলো পেতে গেলে উইকিপিডিয়া ঘেটে এখনই দেখতে পারেন। সততা বলতে কমপক্ষে আরো আটটি গুণ একজনের মধ্যে থাকতে হবে; তারপর কাউকে আমরা সৎ বলতে পারি, যেমন– নৈতিক নীতি, মূল্যবোধের প্রতি আপসহীনতা, সত্যবাদিতা, সম্পূর্ণতা বা অখণ্ডতা (ইন্টিগ্রিটি), বিশ্বস্ততা, নম্রতা, উদারতা ইত্যাদি। রাজনীতিকদের জন্য জবাবদিহিতা ও জনসেবাও সততার গুণ। এখন থেকে আমরা রাজনীতিকদের জন্য জবাবদিহিতা ও জনসেবাকে সততার অবশ্যম্ভাবী গুণ বলে বিবেচনা করবো। আমি আরো দুটো গুণ রাজনীতিকদের জন্য আরোপ করতে চাই– ত্যাগ ও দায়বদ্ধতা। জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা কিন্তু সমার্থক নয়। দায়বদ্ধতা হচ্ছে– কর্তব্য পালনে দায়িত্ববোধ; জবাবদিহিতা হচ্ছে– কোনো কাজের দায়িত্ব গ্রহণ ও তৎসংক্রান্ত প্রশ্নাদির জবাব দিতে প্রস্তুত থাকা। প্রশ্ন জাগে, এদেশের রাজনীতিক ও কর্মীদের কতজনের মধ্যে সততাসহ জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা আছে? মহান রাজনীতিকদের দলীয়প্রধানরা আদৌ কি এসব কথা ভাবেন? না-কি সে মোতাবেক নেতা-কর্মীদের সংশোধন করার চেষ্টা করেন? তাহলে দেশের উন্নতির আশা করি কীভাবে? কল্পনায় বিরিয়ানি খেয়ে তো কোনো লাভ নেই। তাইতো আমরা ‘কাজ করি বেহদ্দ, ডুবে মরি গোষ্ঠীসুদ্ধ’; নাকি দেশসুদ্ধ বলবো? আমরা কাগজে-কলমে কিছু কথা তালিকাভুক্ত করে সংস্কারের ওয়াদা পূরণ করি। রাজনীতিকদের মন-মানসিকতা, অর্থাৎ মগজ সংস্কারের কথা কখনো বলিনে। এটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত-উন্নয়নের যে একটা বড় প্রতিবন্ধকতা, তা ভেবেও দেখিনে। আবার ‘সততা’ শব্দটাই তো আমাদের সমাজ ও মগজভিত্তিক অভিধান থেকে দিনে দিনে হারাতে বসেছে। তা উন্নতি কীভাবে সম্ভব? আমাদের রাজনীতি তো সততার এ গতিপথ অনেক আগ থেকেই হারিয়েছে। যতই সামনে এগোচ্ছি, মরুভূমির তপ্ত বালুচরে সততার স্রোতধারা ও অস্তিত্ব বিলীন হতে চলেছে।

আবার সততার এসব প্রতিটা উপাদান মানবতাবোধের ওপর নির্ভরশীল। মানুষের মধ্যে সুপ্ত মানবতাবোধ পরিবেশ ও সুশিক্ষা দিয়ে জাগিয়ে তুলতে হয়। মানবতাবোধের ভিত্তি তৈরি করে ধর্মীয় মূল্যবোধ। ধর্ম হাজার হাজার বছরের পুরোনো একটা অতি পরীক্ষিত সংগঠন। সততা ও মূল্যবোধ তৈরিতে এ সংগঠন

অদ্বিতীয়। যদিও ভোগবাদ ও বস্তুবাদী সংস্কৃতিতে ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। ফল ও প্রভাব আমরাই ভোগ করছি। ভোগবাদী সমাজে এসব ভেবে দেখার সময়ের খুব অভাব। ভয় হয়, এসব কথা বেশি বেশি লিখলে কেউ আবার আমাকে ঠাট্টাতামাশা করে দার্শনিক উপাধি না দিয়ে দেয়! আমি সামাজিক ও মানসিক এসব ঘটনা সাদা দৃষ্টিতে দুচোখ দিয়ে দেখতে চাই। রাজনীতিক ও সংস্কারকদেরও একচোখা না হয়ে দুচোখ দিয়ে দেখতে অনুরোধ করি। এই যে সমাজ ও রাজনৈতিক সংস্কারের যে সুযোগ আমরা ঘটনাচক্রে বৈষম্য ও শোষণের শেষপ্রান্তে এসে পেয়ে গেলাম; এ সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। এমন সুযোগ সহজে আর আসবে বলে মনে হয় না। কাজে লাগাতে ব্যর্থ হলে দরকারি সংস্কার আর হবে না। একটা অভ্যাস প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, সাধারণভাবে পরিবর্তন রাজনীতিকরা করতে চায় না। এজন্য অন্তর্বর্তী সরকারকেও যেমন চলমান রাজনীতিকদের সত্য-অপ্রতিবন্ধ আশ্বাস আন্তরিকতার সাথে দিতে হবে; আবার রাজনীতিকদেরও ধৈর্য ধরে অন্তর্বর্তী সরকারকে সহযোগিতা করে প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলো করিয়ে নিতে হবে; নিজেদের স্বার্থে না হলেও দেশের স্বার্থে জিদ না ধরে করতে হবে। নিজেদের নেতা-কর্মীদের মগজও পরিবর্তন করাতে হবে। নইলে অন্যদিন লিখেছিলাম 'তেলের নামে তেল গেল, ফ্যাচ্ করলো না' কথাই সার হবে। গত ১৫ বছরের বিরোধী দলগুলোর কৃতকর্মে দলের নেতা-কর্মীদের শিক্ষা, নৈতিকতা, অনুকরণীয় নেতৃত্বের গুণাবলির বড্ড অভাব ছিল। সে বিষয়ে সাবেক বিরোধী দলগুলোর কেন্দ্রীয় নেতারা সতর্ক ও যত্নবান কি-না? তাই রাজনীতিকদের রাষ্ট্রের কাছে জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার কথা এ কারণে বলি, এদেশ দুর্নীতিতে ভরে গেছে। রাজনৈতিক সরকার ব্যবস্থায় উপযুক্ত কন্ট্রোলিং সিস্টেমের মাধ্যমে দুর্নীতি ৫০ শতাংশ কমানো মানে দেশ ৫০ শতাংশ নিশ্চিত এগিয়ে যাওয়া। এদেশে রাজনীতিকদের সাথে সরকারি কর্মকর্তা ও সুযোগসন্ধানী ব্যবসায়ীরা একসাথে গাঁটছড়া বেধে নির্বিঘ্নে দুর্নীতিতে নামে, এতে জনগোষ্ঠী অসহায় হওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকে না। এছাড়া অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে কোনো যাদুর বাঁশি নেই যে, ফুঁ দিলেই এতদিনের মজ্জাগত দুর্নীতির ব্যাধি হঠাৎ করেই ভালো হয়ে যাবে। আবার একথা সত্য, নামমাত্র সংস্কার করে নির্বাচন সুষ্ঠু হলেই দেশ শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হয়ে যাবে, একথা বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের স্বভাবের পরিবর্তন আনতে হবে।

বৈধ আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং জ্ঞান একটা সমাজ ও দেশকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে গড়তে পারে। আমরা অবৈধ টাকার পাহাড় দিয়ে দেশ-বিদেশে নিজের সম্পদ গড়ি। জ্ঞান

নেই; জ্ঞান আসে সুশিক্ষা থেকে, সমাজে সুশিক্ষাও নেই, তাই জ্ঞানের রাজ্যেও ভাটার টান। এখানেই সমস্যা। দুর্নীতি দূর করে সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোতে সুনীতি আনতে গেলে সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা চাহিদা মতো করতে হবে। এতে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটবে। উভয় শিক্ষার কাজই একসাথে শুরু করতে হবে। সমাজ কাঠামো মজবুত হবে। সুশিক্ষিত মানুষ রাজনীতিতে আসবে। কর্মপ্রচেষ্টা চলতে থাকলে কমপক্ষে সাত বছরের মধ্যে আশা করা যায় এ জাতিগোষ্ঠী শিক্ষার আশানুরূপ পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে। তবে সরকারের শিক্ষাকমিটি গঠন ও এর পরিচালনা দেখে আগেভাগেই বোঝা গেছে, এ যাত্রায়ও উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সমাজ ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বঞ্চিত হবে। শিক্ষাসংস্কারও নামকা ওয়াস্তে হবে বলে মনে হচ্ছে। এতে এদেশের জনগোষ্ঠীর স্বকীয়তা শিক্ষার মাধ্যমে পৃথক করার কাজ কতটুকু হবে, আমরা সন্ধিহান। আমি ভাবছি সম্মিলিতভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ (inclusive society) ও একীভূত শিক্ষাপদ্ধতির (integrated education) মডেল এদেশে কত দ্রুত প্রয়োগ করা যায় এবং মানসম্মত প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষা নিশ্চিত করে পুরো ব্যবস্থার ফল কত তাড়াতাড়ি জনসমাজে নিশ্চিতভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়; আর শিক্ষাব্যবস্থা তৈরিতে কর্মরত জনশক্তি ভাবছে ভিন্নভাবে– তাদের মতো করে, যা এদেশের জাতি-গোষ্ঠীর স্বকীয় সত্তায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হবে। এতে পরিণতি 'যাহা পূর্বং, তাহাই পরং' হতে বাধ্য। শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নেও আগের মতো নিশ্চিত গলদ থেকে যাবে। কারণ কথায় আছে, 'উঠন্তি মূলো পত্তনেই চেনা যায়'। এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক একটা অনুরোধ অন্তর্বর্তী সরকারকে করতে পারি, যা শুনতে একটু তিক্ত মনে হবে– শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের রূপরেখা যেন আগের মতো কোনো ধর্মবিদ্বেষী লোকজন দিয়ে করানো না হয়; কারণ জানি, এদেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ ভিন্ন, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কমপক্ষে ৯৯.৫০ শতাংশ লোক ধর্মে বিশ্বাসী। অনেকে সরাসরি ধর্ম পালন করে না, কিন্তু শিক্ষার মধ্যে ধর্মবিদ্বেষী মনোভাব সৃষ্টি সাধারণ মানুষ পছন্দ করে না।

অর্থনীতিতে গ্রেশামের মুদ্রাবিষয়ক নীতি পড়েছিলাম। এই নীতির মূল কথা হলো: 'খারাপ টাকা ভালো টাকাকে বাজার থেকে হটিয়ে দেয় ও নিজে জায়গা করে নেয়'। আমাদের দেশেও অনুরূপ হয়েছে: নীতিহীন-অসৎ প্রতারণাসর্বস্ব রাজনীতি সৎ-দেশসেবামূলক রাজনীতিককে দেশ থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে। সৎ ও সুশিক্ষিত লোকগুলো লাঠিয়ালবাহিনীর প্রধানদের অত্যাচারে ও মিডিয়ার অপমানজনক-বিদ্বেষপূর্ণ চরিত্রহননের ভয়ে কোটরের প্যাঁচার মতো ঘরের

কুঠরিতে ঢুকে বসে আছেন। অফিস-আদালত ও সমাজেও একই অবস্থা। আমরা নিজেরা ভালো হতে চাইনে, অন্যকে ভালো হতে বলি। আত্মজিজ্ঞাসার ঘর ফাঁকা। ব্যক্তি পর্যায়েও যা, রাজনৈতিক দলের পর্যায়েও তা। এজন্যই বার বার স্বাধীন হলাম, পতাকা ও স্বার্বভৌমত্বের অহঙ্কার ছাড়া তেমন কোনো লাভ হলো না। ২০২৪-এ ছাত্র-জনতার সফল বিপ্লব হতে দেখলাম, বিপ্লবে নিজে সশরীরে ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতা করলাম, তার আগে হুমকি–ধামকিকে তুচ্ছজ্ঞান করে কলম দিয়ে অনেক বছর ফ্যাসিবাদের তক্তে সাধ্যমতো আঘাত করলাম, অথচ বিপ্লবী সরকার গড়তে ভুল করে ফেললাম, আবার বিপ্লবের ফসল কতটুকু দেশের উন্নতির ঘরে তুলতে পারবো, তা নিয়ে এখনো সন্দেহমুক্ত হতে পারলাম না। একথা ফেলে দেবার মত নয় যে, অন্তর্বর্তী সরকার ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। বর্তমান বিপ্লবী সরকারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বৈপ্লবিকতা নেই। বিষয়টা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যৌক্তিকতাসহ কানাঘুষা করতে প্রায়ই শুনি। সরকারের অভ্যন্তরে ও বিভিন্ন বিভাগে ফ্যাসিবাদের কেনা দোসর এখনোও সক্রিয়। সরকার এ বিষয়ে শক্ত অবস্থানে যেতে পারছে না, এটা সরকারের দুর্বলতা। অনেক ক্ষেত্রে এই দুর্বলতার কারণ অভ্যন্তরীণ কিনা শনাক্ত করা যাচ্ছে না। সরকার অনেক ক্ষেত্রে নমনীয়তার প্রশ্রয় দিচ্ছে। এটা বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য নয়। তবে সরকারের বিদেশ নীতির সফলতা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার কৌশল প্রশংসনীয়।

আরেকটা প্রসঙ্গ প্রায়ই শুনতে হচ্ছে, তা হলো দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা। আগেও লিখেছি, এত ছোট দেশে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ভালো ফল বয়ে আনবেই না। তখন কেউ আবার দেশকে বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ করতে বলবেন, যা হবে দেশের জন্য আত্মঘাতি। দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা না করে রাষ্ট্রপ্রধান একজনের পরিবর্তে একটা কাউন্সিলকে করা যায়, যার নাম এর আগের লেখায় 'সুপ্রিম কাউন্সিল' দিয়েছিলাম। এ কাউন্সিল তৈরি করতে অরাজনৈতিক পেশাদার সংগঠন থেকে নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কাউন্সিল নির্বাচন করা যায়। এতে রাজনৈতিক সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি করা যায়, সরকার ও বিরোধীদলের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা তদারকি ও তত্ত্বাবধান করা যায়, এক্ষেত্রে নির্বাচন পরিচালনার জন্য 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' গঠনের তখন আর প্রয়োজন পড়ে না। বিস্তারিত অন্য একটি কলামে লিখেছিলাম, কিন্তু প্রস্তাব গ্রহণকারির কোনো আগ্রহ দেখছি না। তাছাড়া নতুনের প্রতি মানুষের আগ্রহ কম, আবার রাজনীতিকরা রাষ্ট্রের (সুপ্রিম কাউন্সিল) কাছে নিজেদের কাজ-অকাজের

জন্য দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা করতে সহজে রাজি হবে বলে মনে হয় না। অথচ এছাড়া এদেশের মুক্তি সুদূরপরাহত।

আমার জানা একটা ঘটনা এরকম: ছেলের বিয়ে দেবার জন্য বাপ আর খালু গেছেন মেয়ে দেখতে। পাত্রী পছন্দ হয়ে যাওয়াতে বাপ দ্বিতীয়-শুভ শাদি-মোবারক সম্পন্ন করে নতুন বউ নিয়ে বাড়িতে হাজির। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র-জনতার জীবনের বিনিময়ে বিপ্লব করে, আবার তারা নিজেরাই নতুন রাজনৈতিক দল গড়ার ঘোষণা আমাকে শঙ্কিত করে তুলছে। একাজ করে আমরা অদূরদর্শীতার স্বাক্ষর রাখতে যাচ্ছি। এতে আমরা অন্য সাধারণ রাজনৈতিক দলের মতো একটা রাজনৈতিক দলে পরিণত হব। বছর না যেতেই পদ নিয়ে কাড়াকাড়ি-কোন্দল, পরিণামে ব্রাকেট-সর্বস্ব দল হয়ে এবং জনসাধারণের জন্য চেতনাসমৃদ্ধ বিপ্লবী দল ক্রমশ ঠুটো জগন্নাথে পরিণত হবার আশঙ্কা দেখা দেবে। দেশের জন্য সত্য ও ত্যাগের সারথি হয়ে কাজ করে আবার পক্ষভুক্ত হওয়া নিতান্তই বেমানান। এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় মনোযোগী হতে হবে। আবার নতুন দল গড়তে অন্য দল ভাঙনের চেষ্টা ঘৃণ্য অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। পতিত সরকার অনেকবার এ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল। এ বিষয়ে পতিত সরকারের অনুকরণ এড়িয়ে যাওয়া সম্মানের ব্যাপার। নতুন দল গঠন নিয়ে অর্ন্তদ্বন্দ্ব পতিত সরকারের ফিরে আসাকে সম্ভব করেও তুলতে পারে। বরং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অরাজনৈতিক ছাত্রজোট গড়ে তোলা যেতে পারে, তারা একই ছাতার নীচে দেশ গড়ার জন্য কাজ করবে। তারা মর্যাদার সাথে টিকে থাকবে। সব অন্যায়-অব্যবস্থার প্রতিবাদ করবে এই সদাজাগ্রত বৈষম্যবিরোধী ছাত্রসমাজ। নির্বাচিত সরকারের কর্মের তদারকি ও তত্ত্বাবধান দেশবাসীর পক্ষ থেকে করবে, এটাই হবে আপাতত তাদের পবিত্র দায়িত্ব।

(প্রকাশ: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ দৈনিক যুগান্তর,)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

‘শত্রু তুমি বন্ধু তুমি, তুমি আমার সাধনা’

(প্রকাশিত শিরোনাম: সংখ্যালঘু নির্যাতনের ভারতীয় বয়ান থেকে এদেশের হিন্দুদের সতর্ক থাকতে হবে)

নিবন্ধ লিখতে বসলেই লেখায় কোনো গান বা কবিতার প্রয়োগ দেখে বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীরা সুযোগমতো ভর্ৎসনা করতে ছাড়েন না; যদিও লিখতে গেলেই ছোটবেলায় শেখা গান ও কবিতা উথলে ওঠে। সুর মনের মধ্যে প্রসঙ্গের দ্যোতনার সৃষ্টি করে; প্রবন্ধের অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। লিখি এজন্য যে, গানের সাথে আমাদের দেশের কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের বা কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা ও দশা হুবহু মিলে যায়। সোজা কথায় বললে, গানটা হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক আওয়ামী সম্প্রদায়ের উদ্দেশে গাইলে এখন ভালো মানায়। সে-কথা ও ব্যক্তিগত জীবনের গল্প আজ কিছুটা বলি। ছোটবেলা থেকে হিন্দু-বসতি এলাকায় বসবাস হওয়ায় স্কুল ও কলেজ জীবনে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অনেকেই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের; বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেও তাই। জীবন-সায়াহ্নে পৌঁছে গেছি, এখনও হিন্দু বন্ধু অনেক। বন্ধুদের অনেকেই বর্তমানে ভারতবাসী। তারা বাংলাদেশে এলে আমার বাড়িতে এসে থাকে; আমিও ভারতে গেলে তাদের সাথে দেখা ও যোগাযোগ হয়। কোলকাতার আশপাশ তাদের বসবাস। অনেকে একসাথে বসে আড্ডা জমাই। জাতভেদের বিভাজন আমাদের মনকে বিন্দুমাত্রও কলুষিত করতে পারে না। ছাত্র বয়সে আব্বার ব্যবসায়ে সাহায্য-সহযোগিতা করতে গিয়ে দেখলাম, আব্বার প্রায় সব ব্যবসায়ী মহাজন হিন্দু সম্প্রদায়ের। একদিন কারণ জিজ্ঞেস করায় আব্বা বললেন, ওরা ব্যবসা বোঝে, ব্যবসাতে প্রতারণা করে না, তাই। যদিও স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সবাই পাওনা টাকা না দিয়ে আমাদেরকে পথে বসিয়ে ভারতে চলে গেছে। আর ফিরে আসেনি। আমার বিশ্বাস, সব দেশেই বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একসাথে বসবাস করে, সবাই দেশের নাগরিক; সেমতো সবাই সম-নাগরিক অধিকার ভোগ করবে, দেশের আইন সবার জন্য সমান। এখানে জাত-পাতের ভেদাভেদ অপ্রয়োজনীয়। সুতরাং কাউকে বিশেষভাবে নিরাপত্তা দেওয়ারও প্রয়োজন পড়ে না।

আমাদের দেশে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও গলদ আছে; এটা উদ্ঘাটনের বেশি প্রয়োজন।

চাকরির সুবাদে আমি নিজ এলাকার বাইরে আসার পর কয়েকজন বন্ধু এদেশে অত্যাচারের কথা বলে এবং কেউ কেউ ভারত রাষ্ট্রকে নিজের রাষ্ট্র ভেবে ওপারে পাড়ি জমায়। তারা এখন বলে, বাংলাদেশ ছেড়ে তারা ভুল করেছে। মূল

ভারতীয়রা তাদের কুনজরে দেখে; ভারতে সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসা বেশি, অধিকাংশ লোক হাড়কিপটে ইত্যাদি– এসব ওপারে যাওয়া বন্ধুদের বলা কথা। আমি শুনে হেসে উড়িয়ে দিই। এদেশের হিন্দুসম্প্রদায় যে দলকে স্বাধীনতার আগে থেকেই বন্ধু ভেবেছিল, তারাই সব সময় তাদের প্রতি অত্যাচার ও জমিজমা দখল করেছে। ভারত রাষ্ট্রটা হিন্দু সম্প্রদায়ের খুব পছন্দের। আওয়ামী লীগ ভারতের গোলামী করে, তাই হিন্দু সম্প্রদায় আওয়ামী লীগের বন্ধু। সম্পদ লুটের সময়ে তারাই আবার শত্রুতে পরিণত হয়। একই রাজনৈতিক দল নিজে দইটা চেটে খেয়ে অন্য কোনো দলের মুখে হাত মুছে দিয়ে নিজেরা ধোয়া তুলসিপাতা সাজে। এতটা বছরে একথা অপেন-সিক্রেট হয়ে গেছে। কোনো কোনো হিন্দু নেতার মুখেও টিভি চ্যানেলে বক্তৃতায় এ সত্য কথা স্বীকার করতে শুনেছি। একথা ভারত সরকার অবহিত হলেও এখন তারা জিভ ঘুরিয়ে ডাহা মিথ্যা বিশ্বব্যাপী রটায় কিসের স্বার্থে? স্বার্থটা হচ্ছে 'গোলাম' দেশছাড়া, তাই স্বার্থ হাতছাড়া। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা আওয়ামী সম্প্রদায় ও ভারতকে দেবতা জ্ঞানে মান্য করে চলে। আমার মনে হয় আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার জন্য যুদ্ধের পর বিভিন্ন দিক থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা উঠলেও তারা চুপ করে গিয়েছিল। দেশ গড়তে নিজেদের অযোগ্যতা, দুরবগ্রহ দুরভিসন্ধি ও ব্যর্থতা ঢাকতে দোষ বিএনপি-জামাতের ঘাড়ে চাপায়। এসবই এদেরকে বিশ্ব-মুরব্বিদের কাছে 'জঙ্গি-মৌলবাদী' বানিয়ে জুজুর ভয় দেখিয়ে নিজ স্বার্থ হাসিল ও সিংহাসনে বসে থাকার নিম্ন-মানের ফন্দি-ফিকির।

অনেক মানুষই আওয়ামী লীগের স্বাধীনতা যুদ্ধের আগের কথা ও যুদ্ধের পরের লুটতরাজ, মিথ্যাচার, প্রভুর নিরঙ্কুশ স্বার্থরক্ষার কাজ দেখে তাদের মতলববাজি ও প্রতারণা বুঝতে পেরে নৈতিকতার কারণে দলত্যাগী হয়েছে। বাঁধ দিয়ে নদীর পানিকেই অনেক সময় বশে আনা যায় না, মানুষের মনকে তো নয়ই। আমি এটা সাইকোলজিক্যাল ও সোসাইটাল পয়েন্ট অব ভিউতে বিশ্লেষণ করে অনেকবার দেখেছি। পরবর্তীতে জামাতের সাথে নিয়ে আন্দোলন করে, পাশে বসিয়ে বক্তৃতা দেয়; রাষ্ট্রক্ষমতায় বসার জন্য জামাতের কোনো নেতার পা ছুঁয়ে সালাম করে, আবার দীর্ঘদিন পর তাদের নেতাদের স্বকল্পিত অপরাধে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

আওয়ামী লীগ ভারতে দলবলসহ পালিয়ে যাবার আগে গত্যন্তর না দেখে জামাতকে নিষিদ্ধ করে নিজেদের রাজনীতির পালে অনুকূল হাওয়া লাগাতে গিয়েও ব্যর্থ হয়েছে। মানুষ একই টেকনিক বারবার খায় না। আচ্ছা, আমাদের

দেশে খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও তো সংখ্যালঘুর আওতায় পড়ে; তারা কি কখনো সংখ্যালঘু অত্যাচারের কথা বলে? এদেশের হিন্দু ধর্মের কিছু লোক আওয়ামী-ভারতের শক্তিতে ধরাকে সরা জ্ঞান করে ও আওয়ামী রাজনীতির সাথে যুক্ত। আওয়ামী লীগ ভারতকে 'দাদাগিরি' করতে সুবিধা দেওয়াতে এদেশের কুমতলবি দাদারা বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতি, অন্যায় ও অপরাধ করে, এদেশের যত অসত্য-কুকথা ভারতের কানে লাগায়। পূজার মৌসুমে ভারতের দান-দক্ষিণা এনে খায়। এখন আওয়ামী লীগের পতনে তাদের প্রতি কোথাও কোথাও সাধারণ মানুষ প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিতে পালটা-আক্রমণ করেছে। এটা হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণ নয়, আওয়ামী বন্ধুদের কুকর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ। তারা দুর্নীতি-দুষ্কর্ম করবে আওয়ামী রাজনীতির ব্যানারে, আবার আক্রান্ত হলেই সংখ্যালঘুর ওপর অত্যাচার বলে চালিয়ে দেবে এবং দল গুছিয়ে শ্লোগান হাঁকবে ও দেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে, এটা কেমন সমীকরণ? এদেশের সাধারণ হিন্দু সম্প্রদায়ের এ বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে হবে। স্বতীর্থ রাজনীতিকদের হাতের গুটি হলে চলবে না। একমাত্র আওয়ামীলীগার ছাড়া মুসলমান ও হিন্দুরা একে অপরের বন্ধু হয়ে সেই আদিকাল থেকে এদেশে একসাথে বসবাস করে আসছে। তারা কিংবা তাদের পূজার ঘর কখনো আক্রান্ত হলে রাজনৈতিক স্বার্থের মারপ্যাচে রং মাখিয়ে আওয়ামী লীগ সে-কাজ করে আসছে। আমি হিন্দু বন্ধুদের কাছ থেকে শুনে ও দেখে ভেতরের অনেক খবর রাখি; আবার 'আমার ফাঁসী চাই' বইতেও পড়েছি। সাধারণ হিন্দুরা মনে মনে মতলববাজ ও ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চাইলে প্রকৃতির নিয়মেই তাদেরকে ভুগতে হবে। তাদের যে কোনো দলের রাজনীতি করতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু রাজনৈতিক দলের মারামারি সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার বলে চালানো যাবে না। একমাত্র আওয়ামী লীগ ছাড়া কেউ তাদের অত্যাচার করেও না। তাদেরকেও অন্যান্য জাতি-সম্প্রদায়ের মতো নাগরিক অধিকার নিয়ে এদেশে বসবাস করতে হবে। এদেশকে ভালোবাসতে হবে। তারা অন্যায় দুর্নীতি করলে নিজেকে আইনের উর্ধ্বের কেউ ভাবা যাবে না। বিষয়টি তারা ও ভারত সরকার সাম্প্রদায়িকভাবে নিচ্ছে, দেশ-বিদেশ মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে। মূল কথা তাদের সেবাদাস ও দাসী দেশছাড়া, এ ক্ষোভ তারা মিটাতে গিয়ে ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে দেশকে অস্থিতিশীল করে তুলতে চাচ্ছে। ভারত এদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাচ্ছে। এতে বাংলাদেশ যদি অশান্তিতে থাকে, ভারতও অশান্তিতে থাকবে। শেখ হাসিনাকে এদেশের গদিতে তারা আর বসাতে পারবে না বলে আমার বিশ্বাস।

সাভারে রানা প্লাজা ধসে গার্মেন্টস শ্রমিকদের নির্মম মৃত্যুর পর কেচো খুঁড়তে বেরিয়ে এলো যে, জমিটা হিন্দুদের; দখল করেছিল আওয়ামী নেতা। অবৈধভাবে বিল্ডিং তৈরি করেছিল। এমন হাজার হাজার সত্য দেশব্যাপী গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে আছে। জমি দখল ও মন্দির ভাঙায় দেশছাড়া হলে বুঝতে হবে মূল হোতা আওয়ামী-বন্ধুর শক্রতা। কাউকে কোনোদিন বিচারের আওতায়ও আনা হয় না। আমার দেখা চোখে সব হিন্দুই কিন্তু অত্যাচারের কারণে ভারতে দেশান্তরি হয়নি; অনেকে ভারতকে নিজের আপন ঠিকানা– স্বর্গরাজ্য ভেবেই গেছে। অনেককে দেখেছি এদেশে অপকর্ম করে শাস্তির ভয়ে পালিয়ে পরিবারসহ রাতের অন্ধকারে ভারতে চলে গেছে। আবার অনেকে এদেশ থেকে কুটকৌশল করে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে; পি.কে. হালদার তাদের একজন। এখনো পর্যন্ত এদেশের অধিকাংশ হিন্দু বাস করে এদেশে, আয় রোজগার করে এদেশে, সম্পদ গড়ে ভারতে। ভারতকে তাদের নিরাপদ স্থান বলে গণ্য করে। আমার অনেক পরিচিতজন, বন্ধুবান্ধবও তাই করেছে। যারা রাজনৈতিক ফায়দা লোটা কিংবা ব্যক্তিস্বার্থের করণে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন করেছে; মিথ্যা সংখ্যালঘু নির্যাতনের ও জঙ্গি-মৌলবাদী দেশ নামাবলীর ট্রাম্পকার্ড ব্যবহার করে দেশ-বিদেশ ছড়িয়েছে বা এখনও ছড়াচ্ছে, ভারতের সেসব সেবাদাস ও সেবাদাসী এদেশ লুটপাট ও গণহত্যা চালিয়ে তাদের মনিব-বন্ধুর কোলে নিরাপদ আশ্রয়ে ঠাঁই নিয়েছে। বিশ্বের ইসলামবিদ্বেষী, থিও-পলিটিক্যাল ভাবধারায় লালিতপক্ষ এসব অপপ্রচারকে মুসলমান দমনের মোক্ষম-ধন্বন্তরি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। শিক্ষক হয়ে এ প্রতারণা মানি কী করে?

এদেশে হিন্দু সম্প্রদায়কে ডুবাচ্ছে তাদের কুটচালসিদ্ধ রাজনৈতিক সতীর্থরা এবং অন্ধ ভারতপ্রীতি। ব্রিটিশ শাসনামলের শুরু থেকে ভারতের হিন্দুত্ববাদী চিন্তা-চেতনা মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার ও মুসলিমবিদ্বেষী আচরণ ভারতবর্ষকে দ্বি-জাতি তত্ত্বে বিশ্বাসী করতে মুসলমানদের বাধ্য করে। কোনো জাতি বা সম্প্রদায় নিগৃহীত, নিষ্পেষিত হলে অচ্ছুত ও যবন সম্প্রদায় হিসেবে হিন্দুত্ববাদী ও বহুত্ববাদী ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের বর্ণবাদী সমাজের সাথে বসবাস করতে বেশিদিন রাজি হয় না। নিজেদের সম্মান ও অস্তিত্বকে বজায় রাখার জন্য পৃথক হতে বাধ্য হয়। তাই পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছিল এবং তারপর বাংলাদেশও স্বাধীন হয়। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গকে সেই বৈদিক যুগ থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাস অতি সতর্কভাবে পড়ে দেখার অনুরোধ করছি।

আমি চার বছর ভারতের মধ্যপ্রদেশের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছি। মুসলমানদের প্রতি তাদের অবজ্ঞা, বৈষম্য, অত্যাচার, নিগ্রহ ও ঘৃণা আমি স্বচোক্ষে

দেখেছি ও নিজেও ভুগেছি। নিজের চোখ ও কানকে অবিশ্বাস করি কী করে? আমাদের দেশের কোনো কোনো রাজনৈতিক দল এদেশের স্বাধীনতাকে কোনো রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর চরণে বিসর্জন দিয়ে নিজেদেরকে স্বাধীনতার রক্ষক বলে দাবি করে, আবার সে রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর সেবাদাস ও দাসী হয়ে কাজ করে। আওয়ামী লীগও এ স্বাধীন দেশকে দিনে দিনে ভারতের হাতে হাওলা করে দিতে চায়। এদেশের ভাত-খাওয়া লোকজন অনেক সচেতন। বাস্তবে বিজ্ঞাপন ও মুখ-দালালি প্রচারণার সাথে কাজের এ বৈপরিত্য ছাত্র-জনতার বিপ্লব ও দাস-দাসীর পলায়ন এবার সব গোমর ফাঁস করে দিয়েছে। এদেশীয় প্রভু-বন্ধুকে হারিয়ে হিন্দু ধর্মের ঠগবাজ লোকজন এখন দিশেহারা। তাদের ভুল ভারতকে ভালোবাসতে গিয়ে তাদের এদেশীয় ভারতীয় সেবাদাসকে বন্ধু হিসেবে বরণ করে নেওয়া। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের উচিত ছিল অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো এদেশে নিজেদের অস্তিত্ব, নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠীত করা। তা না করে তারা ভাত খাবে এখানে আর কুলি ফেলবে গিয়ে পর-নাগরের উঠানে, তা-কি হয়? বাস্তবতা হচ্ছে, তাদের এ স্বভাব তাদের এদেশে অবস্থানকে নড়বড়ে করে দিয়েছে। এখন তো বিএনপি-জামাতের ওপর দোষ চাপিয়ে, দেশের সবাইকে জঙ্গি-মৌলবাদী বলে সারা বিশ্বে মিথ্যা মুখ-দালালী করে আর কাজ হবে না, পদেও থাকা যাবে না। এদেশকেই নিজের স্বাধীন দেশ ভেবে ভালোবাসতে হবে।

এদেশের জনগণ প্রতিবেশী ভারতের সাথে দুটো স্বাধীন দেশ হিসাবে সম-মর্যাদায় বন্ধুত্বপূর্ণ মন নিয়ে সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়; ভারত সরকার খোলা মন ও সত্য নিয়ে এগিয়ে এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। রাজনীতির মাঠে সব সময় পোষা গোলামকে একই পদে ধরে রাখা সম্ভব নয়; তা অলীক কল্পনাও বটে। হিন্দু সম্প্রদায়কেও সে বাস্তবতা বুঝতে হবে।

(প্রকাশ: ৭ জানুয়ারি ২০২৫, দৈনিক ইনকিলাব)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ;
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

দেশবাসীকে সত্য ইতিহাস জানানোর উদ্যোগ নিতে হবে

জীবনের এই পড়ন্ত বিকেলে এসে অতীতের কথা বেশি ভাবতে ও বলতে ইচ্ছে করে। ছোটবেলা থেকে এদেশের ইতিহাস কতভাবেই-না শুনি! সেই বৈদিক যুগের ইতিহাস থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অনেক ঘটনা ও তার বর্ণনার মধ্যে অনেক ফারাক চোখে পড়ে। ব্রাহ্মণ (আর্য) ও মুসলমানদের এ উপমহাদেশে আগমন, বর্ণবৈষম্য, ধর্মপ্রচার ইত্যাদি ভারতবর্ষে দেখেছি বিকৃতভাবে প্রচার করতে। পারস্পরিক প্রতিহিংসাপরায়ণতার কারণে সত্যানুসন্ধানের তুলনায় রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব করে নিজের কোলে ঝোল টানার প্রবণতা বেশি দেখেছি। আমাদের নতুন প্রজন্মের অতীত অনেক কিছুই আত্মানুসন্ধানে জানা প্রয়োজন। বেশি কথা এখন থাক। '৭১-এর স্বাধীনতার অল্প আগে ও পরের কথা বললেও শেখ মুজিবের কোনো সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশক ভাবনা ছিল বলে মনে হয় না। তার অপ্রকাশিত বিপরীতমুখী কর্মকাণ্ড আমাদের অনেকের জানা। '৭১-এর ৭ই মার্চের অনেক কথাই ছাত্র নেতারা তাকে দিয়ে জোর করে বলিয়েছিল বলে জানা যায়। তিনি একবার বলেছেন, 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', আবার এর পর-পরই পশ্চিম-পাকিস্তানীদের সাথে দেন-দরবারে বসেছেন অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য। ২৫শে মার্চে গণহত্যার পর হরতাল ডেকেছেন; আবার বলেছেন, 'যা, নাকে তেল দিয়ে ঘুমোগে'। এ ছাড়া আরো অনেক স্ববিরোধীতার কথা ইতিহাস ঘাটলে পাওয়া যায়। স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়েও একই অবস্থা। একবার তাজউদ্দীন আহমেদ সাহেবকে স্বাধীনতার ঘোষণা রেকর্ড না করে ফিরিয়ে দিচ্ছেন, আবার আত্মগোপনে না গিয়ে স্যুটকেসে কাপড়চোপড় গোছানো চলছে পাকিস্তানের কারাগারে যাবার জন্য এবং বলছেন, 'তোরা যা, ওরা আসছে'। পুরোটাই দ্বিচারিতা। তাই নতুন বাংলাদেশের ইতিহাসকে দু-চোখ মেলে নির্মোহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে লিখলে কেমন হয়? অনুসন্ধিৎসুজনের প্রশ্ন, তার সাথে ভারত সরকারের আগ থেকেই কি একটা অলিখিত সমঝোতা ছিল? সব কাজেই ভারত তাকে অতি বিশ্বস্ত, আস্থাভাজন ও নির্ভরযোগ্য বলে খুঁজে পেয়েছে। একটু পেছনের কথা বলি:

ইতিহাস বলে, এ উপমহাদেশ ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আসার পর থেকেই উগ্র হিন্দুত্ববাদ মুসলিমবিরোধী হয়ে ওঠে। আমি ভারতে থাকতে যুবসমাজের জন্য তাদের তৈরি অনেক মুসলিমবিদ্বেষী ডকুমেন্টারি ফিল্মও দেখেছি। সে-দেশের ছাত্র-যুবসমাজকে তারা সেভাবেই শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলছে, মনের গভীরে অনেক মিথ্যা গেঁথে দিচ্ছে। মুসলমানদের তারা বরাবরই বহিরাগত শত্রু হিসেবে গণ্য করে। ভারতের মুসলমানরা নিজ দেশে বাস করেও পরদেশী; সংখ্যালঘু- 'নেড়ের

জাত' নামে অত্যাচার, বসতবাড়ি থেকে বিনা কারণে উচ্ছেদ, উৎপীড়ন, নিগ্রহ, মিথ্যা অজুহাতে জীবননাশ– নিত্যকার ঘটনা, স্বপ্নহারা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

বইপত্রে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, মুসলিমবিদ্বেষী হিন্দুত্ববাদী ব্রাহ্মণ্য-শক্তি ব্রিটিশ শাসকদের সহযোগিতা করে মিলেমিশে উপমহাদেশে কর্তৃত্ব করতে থাকে। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে '৪৭-এ পাকিস্তান নামে দেশের স্বাধীনতা তারা মন থেকে মানতে প্রস্তুত নয়। তারা উপমহাদেশকে চেয়েছিল 'হিন্দুস্তান' হিসেবে দেখতে। আওয়ামী লীগের মধ্যেও এ প্রবণতা লক্ষণীয়। এর পর থেকেই ভারত 'পাকিস্তান' শব্দটাকে সহ্য করতে পারে না। এ প্রতিহিংসা আজ পর্যন্ত বহাল আছে। পূর্ব-পাকিস্তানের সাথেও তাদের সম্পর্ক তাই একই ছিল। এখানেও জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ মুসলমান। এসব জানতে '৪৭-এ হিন্দু নেতাদের বক্তৃতা ও লেখালেখি মনোযোগ দিয়ে পড়তে হয়। তখন থেকেই পূর্ব-পাকিস্তানকে পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে শোষণ ও হিন্দুত্ববাদী আধিপত্য বিস্তারের গোপন প্রচেষ্টা তারা চালিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম-পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি অবহেলা, বৈষম্য ও শোষণ ভারতের কু-মতলব বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করে। '৭১-এ বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও ভারত সে স্বাধীনতাকে মেনে নেয় না, এদেশকে তারা তাদের একটা আশ্রিত রাজ্য হিসেবেই গণ্য করে এবং সেবাদাস দিয়ে শাসন শুরু করে।

তাদের আশা ও চেষ্টা, এদেশে যারা টিকে থাকবে তারা হবে ভারতের নির্ভেজাল হুকুম বরদার ও মুসলিমবিদ্বেষী। এজন্য আগে প্রয়োজন মুসলমানি চিন্তাধারায় পুষ্ট জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন ঠুনকো অজুহাতে দমিয়ে রাখা, খতম করা; নামের সাথে জঙ্গিবাদের ট্যাগ লাগিয়ে বিশ্বব্যবস্থা থেকে একঘরে করে ফেলা। দেশটাকে লুটপাট করে খাওয়া ও বাণিজ্যিক পশ্চাৎভূমি হিসেবে ব্যবহার করা। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে '৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতের হিন্দত্ববাদী শাসক-সহায়ক গোষ্ঠী এবং '৪৭ সাল থেকে '৭১ সাল পর্যন্ত ভারতের শাসক গোষ্ঠী এ উপমহাদেশ থেকে মুসলমানদের নাম-নিশানা বিলীন করার মতলবে নিয়োজিত। '৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকেই আওয়ামী শাসকদের সঙ্গে নিয়ে এ প্রক্রিয়া পুরোদমে চলে আসছে। এসব কাজে এদেশের বেশকিছু তথাকথিত মুসলমান নামধারী 'মীর-জাফর', জার্নালিস্ট, বুদ্ধিজীবী, প্রগতিবাদী গোলামদের মগজ ধোলাই করে ইসলামবিদ্বেষী চাটুকার তৈরি করার প্রয়োজন ভারতের নীলনকশার অংশ ছিল। সে-কাজে তারা বেশদূর সফলকামও হয়েছে। এখন এদেশে ব্রিটিশও নেই, পাকিস্তানও নেই। ভারতের পোষা দাসও 'প্রভু-ভূমি স্বদেশে' ফিরে গেছে। এখন এদেশের স্বাধীনতা-স্বয়ম্ভর মানুষ এদেশকে আর দিল্লির অবাধ চারণভূমি হতে কোনোক্রমেই দেবে না।

ভারতের পরিকল্পনায় বিডিআর বিদ্রোহের নামে সেনাবাহিনীর অফিসার নিধন, শাপলা চত্বরে ধর্মপ্রাণ আলেম-ওলামাদের গণহত্যা, সাধারণ প্রতিবাদী মানুষ ও বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের অমানবিক নির্যাতন, ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ১৫ বছর ধরে নির্বিচার হত্যা-গুম তাদের নীলনকশার সফলতার অংশ। শেষে গণহত্যা করেও সাধ মেটেনি, হাজার হাজার সেবাদাস প্রভুর চরণে জীবন সঁপে দিয়েছে। সেখানে বসে প্রভুর সঙ্গে যোগসাজশে এখনও মুসলিম নিধন ও দেশ-দখলের গোপন ষড়যন্ত্র অবিরাম চলছে। একটা শ্রেণি কত অবিবেচক, ইতরতুল্য নির্মম-পাষণ্ড হৃদয়ের সেবাদাস হলে এত কিছু করেও এক বিন্দু পরিমাণ অনুশোচনার গ্লানি তাদের আত্মসচেতনতাকে স্পর্শ করে না! ভারত ও এর সেবাদাসদের এই মুসলিমবিদ্বেষী মনোভাব থেকে এদেশ কখনোই মুক্তি পাবে কিনা– আমার সন্দেহ প্রকট।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে অজস্র আওয়ামী-লীগারের মনের ভাবধারা আমি পর্যবেক্ষণ করেছি, তাদের অধিকাংশ অবিভক্ত ভারতে বিশ্বাসী। এ কারণেই ভারতের সাথে এদের এত গাঁটছড়া, নিজের দেশকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা। আমার মনে খটকা লাগে, বাপের অস্তিত্ব না থাকলে ছেলের অস্তিত্ব থাকে না, আবার দাদার অস্তিত্ব না থাকলে বাপের অস্তিত্বও থাকে না; এ বুঝটুকু কি বাংলাদেশি নামধারী ভারতীয় দাসদের মাথায় নেই? এদের কাছে স্বাধীনতা শব্দটা অর্থহীন। এরা ক্ষমতা ও স্বার্থলোভী, প্রভুর পা-চাটা গোলাম। আবার অন্য রাজনৈতিক দলগুলোও আত্মকলহে মত্ত, কেউবা আত্মবিস্মৃত। কেউ আবার অতীতের স্বকীয় কুলগৌরব ও কুলধর্ম বিসর্জন দিয়ে মতাদর্শে সেবাদাসদের স্থলাভিষিক্ত হতে চায়। এটা আত্মবিনাশক ও কুলনাশক।

'৭১-এর স্বাধীনতাকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। '৭১-এর স্বাধীনতা এসেছিল বলেই জুলাই '২৪-এ ছাত্র-জনতার অসমাপ্ত বিপ্লবের জন্ম হয়েছিল; '৪৭-এ পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল বলেই '৭১-এ স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়েছিল। তবে আওয়ামী লীগ যে ভারতের স্বার্থরক্ষা, নিরঙ্কুশ-নির্লজ্জ দালালি, অবিভক্ত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও তাদের স্বার্থ দেখভালের জন্য এদেশে জন্ম নিয়েছিল, এ বুঝ এতটা বছরে আক্কেলজ্ঞানসম্পন্ন সবার কাছেই এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। শেখ মুজিবের অসমাপ্ত অনেক সেবাদাসের কাজ শেখ হাসিনার হাতে সমাপ্ত হয়েছে। আওয়ামী লীগও এদেশ থেকে নিঃশেষ হয়েছে। তাদের এসব কর্মপদ্ধতি ও কর্মকৌশল, গুম-হত্যা, '৭৪-এর দুর্ভিক্ষ, রিলিফ লুটপাট, মুজিববাদী শাসন, রক্ষীবাহিনীর জুলুম, বাকশাল কায়েম, অবশেষে ১৫ বছরের হত্যা-গুম, কোষাগার চাটাচাটি, ব্যাংক লুট, টাকা পাচার, গণহত্যা ও সবশেষ সদলবলে পলায়ন বিশ্লেষণ করলে আওয়ামী লীগকে এদেশের কোনো রাজনৈতিক দলীয় সংগঠন বলা যায় না; একটা ভিনদেশি-আজ্ঞাবাহী

উগ্রবাদী বর্গী-সদৃশ লুটেরাগোষ্ঠী বলা যায়। এদেশে তাদের রাজনীতির নামে দস্যুবৃত্তি সমূলে শেষ, যদি বাংলাদেশিদের স্বদেশী চৈতন্যোদয় হয়। এখন থেকে ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস এবং ৫ই আগষ্ট 'স্বাধীনতাবিরুদ্ধ উগ্র হিন্দুত্ব-আধিপত্যবাদের সেবাদাসমুক্ত দিবস' বলে পালন করা যায়।

ভাবনা অন্যখানে। এই লুটেরাগোষ্ঠী সুদীর্ঘ বছর ধরে এদেশের জনগোষ্ঠীকে দুর্নীতি-দুরাচারবৃত্তি, অপমানসিকতা ও সেবাদাসের প্রশিক্ষণ দিয়ে পালিয়ে গেল, এখন এই সামাজিক জন-আপদের কী দশা হবে? এই জন-আপদকে সুশিক্ষিত ও জনসম্পদে পরিণত করার কাজটা কি এতই সহজ? এর জন্য অবশিষ্ট দলগুলোর মধ্যে যে দেশাত্ববোধ, মতৈক্য, সততা থাকা অপরিহার্য, তা কি এদের মধ্যে আছে? এতটা বছরে দেশপ্রেমী দলগুলোর মধ্যে যে বোধোদয় জন্ম নেওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল, তা কি এদের মধ্যে জন্মেছে? এরা দুরাচার-দুর্বৃত্তায়ন-চাঁদাবাজ প্রতিপালন করবে, না-কী ইতিহাসের সত্য নিয়ে, স্বকীয়-স্বাধীন অস্তিত্বের কথা ভেবে সেমতো দেশ গড়ার কাজে মনোনিবেশ করবে? জুলাই '২৪ এর পর এই সাত মাসে কোনো রাজনৈতিক দল ও অন্তর্বর্তী সরকারের কারো প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা এ জনগোষ্ঠীকে সচেতন, সুশিক্ষিত ও মানবসম্পদে পরিণত করার এবং স্বাধীন দেশোপযোগী ব্যাপক শিক্ষা-সংস্কারের কোনো কার্যকর উদ্যোগ তো চোখে পড়লো না। অন্তর্বর্তী সরকারের অন্য বিষয়ে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক বিষয় ও বৈদেশিক বিষয়ে সফলতা আছে মানি, কিন্তু এ বিষয়ে, অর্থাৎ সুশিক্ষিত মানবসম্পদ তৈরির বিষয়সহ অন্তর্নিবিষ্ট সব সমস্যাগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। সমাজের মগজ পচে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। নীতি-নৈতিকতাভিত্তিক সমাজ-সংস্কার ও স্থায়ী শিক্ষা-কমিশন প্রতিষ্ঠার দাবিও অনেক লেখায় করেছি। আবার ভবিষ্যৎ আশার আলোও তেমন চোখে পড়ে না। রাজনৈতিক দলের অধিকাংশ লোকজন ক্ষমতায় গিয়ে দেশের কোষাগার চাটার চিন্তায় বিভোর। তাহলে পরিণতি কী? 'আকলমন্দ কে লিয়ে ইশারাই কাফি হ্যায়।' সত্য কথাগুলো শুনতে তিক্ত ও বিস্বাদ লাগে তো বটেই।

প্রয়োজন ছিল এদেশের বাদবাকি রাজনৈতিক দল, নেতারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও স্বনিয়ন্ত্রিত হয়ে দেশকে টিকিয়ে রাখা ও দেশের উন্নতির পরিকল্পনা করা। ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থবাদী একটা মহল দেশের উন্নতি, শিক্ষার মান, সামাজিক মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা, ইন্টিগ্রিটি, দেশপ্রেম নষ্ট করে দিয়ে দেশ ধ্বংসের সকল উপাদান বজায় রাখতে চায়; এদের চিহ্নিত করা দরকার। ভাবা প্রয়োজন যে, নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক নির্বাচন মানে উন্নতি নয়, উন্নয়নের পূর্বশর্ত মাত্র। সুষ্ঠু নির্বাচন হলেই লুটপাট, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি-চাঁদাবাজী, হাট-ঘাট-মাঠ দখল, শোষণ ও

আইনহীনতার তেমন কোনো উন্নতি হবে কি? অনেক দলে অনেক প্রগতিবাদী-ইসলামবিদ্বেষী নেতা জায়গা দখল করে নিয়েছে। নিজের বাপ-দাদার অস্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে তারা প্রগতিবাদী হয়েছে। আমার জানা মতে, যে জাতি তার অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ভুলে গিয়ে অসার আদর্শের চরণে জীবন ও কর্মকে সঁপে দেয় তারা পরজীবী ও নিঃস্ব ছাড়া আর কী হতে পারে! তাদের বাপ-দাদার ধর্ম ও নিজের নাম যদি এতই অচ্ছুত ও জঙ্গীমনা হয়ে থাকে, তাহলে তারা এদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে ধর্মীয় সত্ত্বা বজায় রেখে কিভাবে সুশিক্ষিত মুসলমান বানানো যায়, সে পরামর্শ খয়রাত করতে পারে, দোষক্রুটি সংশোধন করিয়ে নিতে পারে; তাদেরকে গড়ে তুলতে পারে, এতে তো দোষের কিছু নেই। তবে আত্ম-বিস্মৃতি ও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে এদেশের বিশাল মুসলিম সম্প্রদায়কে এদেশ (জন্মভূমি) থেকে বিতাড়িত করা বা ধ্বংস করার মানসিকতা নিয়ে দেশব্যাপী বস্তুবাদ ও হিন্দুত্ব-আধিপত্যবাদের তালিম দেওয়াকে তো কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

দেশের অব্যবস্থা, দুঃশাসন, দুর্নীতি, অপশাসন ইত্যাদির খোল-নলচে বদল করার এখনই সময় এসেছে। এ সুযোগ হাতছাড়া করা কোনোক্রমেই সংগত হবে না। ক্ষমতালোভী অনেকেই ইনিয়ে-বিনিয়ে পরিবেশকে নষ্ট করে দিতে চাইবে। তাতে নির্দিষ্ট কোনো দল বা গোষ্ঠী লাভবান হবে নিশ্চয়ই, তবে দেশ গড়ার উপযুক্ত সময় হারাবে জনসাধারণ। ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষী মহলের কি এত তাড়াতাড়ি চৈতন্যোদয় হবে? সত্য তথ্য লিখে সংরক্ষণ করারও এখনই উপযুক্ত সময়। বাংলাদেশে '৭২ সাল থেকে আওয়ামী শাসন সম্পর্কীত দুঃশাসন, নির্বিচার-হত্যা-গুম ও লুটপাট-গণহত্যার বিষয় এবং অগণিত মানবতাবিরোধী লোমহর্ষক ঘটনা নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সংশ্লিষ্ট কোনো মন্ত্রণালয়কে কোনো ইতিহাসভিত্তিক প্রজেক্ট হাতে নিতে এখনও দেখিনি। এ বিষয়ে ছোটগল্প, উপন্যাস, ইতিহাস, স্মৃতিকথা, প্রামাণ্য-রচনা, প্রকাশিত খবর একত্রিকরণসহ অনেকেই অনেক কিছু লিখতে ও সংরক্ষণ করতে পারেন। একটা কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে প্রজেক্টের পক্ষ থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা করা যায়। রচয়িতাকে কিছু সম্মানীও দেওয়া যায়। বর্তমান প্রজন্মও সত্য অতীত জানতে পারে, শিখতে পারে। এতে জাতীয় সম্পদ গড়ে ওঠে। বিষয়টা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সংশ্লিষ্ট পক্ষ ভেবে দেখতে পারেন।

(২৭.৩.'২৫, দৈনিক শিক্ষাবার্তা ডট কম-এ প্রকাশিত)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ;
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষা

আমরা সরকারি কোনো কোনো বিভাগের নিয়ম-কানুন পরিবর্তন করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে এনে দেশকে উন্নত করতে চাই। এজন্য ছাত্র-জনতার সাম্প্রতিক অসমাপ্ত বিপ্লবের ওপর ভর করে সামনে এগোচ্ছি। ফল কতটুকু ঘরে আসবে এখনোও অজানা। রাষ্ট্রীয় বিধান পরিবর্তনের চেষ্টাও চলছে। দেশের উন্নতি কতটুকু হবে তাও অজানা। কারণ শুধু নিয়ম নীতি পরিবর্তনই যথেষ্ঠ নয়, নিয়ম নীতি অনুসরণ ও বসবাসরত মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনও অধিক বিবেচনার বিষয়। আমরা দেশ ও দশের উন্নতির যত পরিকল্পনাই করি না কেন, সফলতা নির্ভর করে সমাজে বসবাসরত মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন, সামাজিক শিক্ষার অবস্থা এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষামানের উন্নতির ওপর। কারণ আমরা কেউই সমাজের বাইরে নই। পরিবারের সমষ্টি সমাজ, সমাজের সম্মিলনে রাষ্ট্রের গঠন। সমাজ একটা গতিশীল অবস্থা ও পরিবেশের সমষ্টি, যার গতিপথ দেশচালকরা মনমতো পরিবর্তন করতে পারেন। কিংবা বলা যায়, দেশচালকরা যেভাবে দেশ পরিচালনা করেন, দেশের মানুষ তাদের সাথে চলতে চলতে পরিণামে মানুষের মন-মানসিকতা সেভাবেই গড়ে ওঠে; প্রতিফলিত হয় সমাজের কাজে-কর্মে। এতে কোনো সমাজ সংস্কারক দেশ-পরিচালকদের সক্রিয় সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া দেশের কোনো কোনো সামাজিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ নাড়া দিতে পারেন, মনমতো আমূল পরিবর্তন করতে পারেন না।

স্বাধীনতার পর থেকেই এদেশের সমাজব্যবস্থা ও সমাজে বসবাসরত মানুষের মন-মানসিকতার প্রভূত পরিবর্তন হয়ে চলেছে। যদি প্রশ্ন করি, সমাজে মানুষের অবস্থান ও চিন্তা-চেতনা সুস্থ মানুষের মতো আছে কি? যে দুর্নীতিকে সমাজ ঘৃণার চোখে দেখতো, এখন মনের আয়নার উলটো রূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আমি গবেষণা করে দেখেছি, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও ঠগবাজ ভরে গেছে। এতে প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কাজের পরিবেশ নষ্ঠ হয়ে গেছে। ভুগছে সমাজ ও সমাজের মানুষ। মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের গুণ বিলীন হয়ে গেছে। অনেকের মুখের কথার সাথে কাজের আদৌ মিল নেই। কুটিল বুদ্ধি খাটিয়ে প্রতারণা ও ফাঁকিবাজি রপ্ত করেছে; দুর্নীতির মহোৎসব চলছে। আমরা অজানা ভোগবাদী উদ্দেশ্যের দিকে অবিরাম বেগে ছুটছি। চাকরিতে, ব্যবসায়, পেশায় মিথ্যাচার, প্রতারণা শেঁকড় গেড়ে বসেছে। সমাজের মানুষের ভেজাল চিন্তাধারায় ভেজাল খেয়ে-পরে প্রত্যেক মানুষের আয়ু ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। মারাত্মক রোগে, দুর্দশা-দুর্গতিতে সমাজের মানুষ অবিরাম কাতরাচ্ছে। এই নিরুদ্দিষ্ট ভোগের নেশায়

অবৈধ টাকা জোগানোর জন্য মানুষ উর্ধশ্বাসে ছুটছে। কোথায় জীবনের উদ্দেশ্য! কোথায় অবহেলিত, দুর্গত, অসহায়ের আর্তি শোনার একদণ্ড অবকাশ! পরিত্রাণের একটাই আহ্বান, 'আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে'। মানুষের মগজ সংস্কার না করা হলে রাষ্ট্র সংস্কারে কাজ হয় কীভাবে? এজন্যই সমাজ সংস্কারের প্রশ্ন আসে।

শুধু রাজনীতিকদের হাতে আমরা জিম্মি না থেকে দল বেঁধে নিজেদের সমাজ সংস্কারের কাজ নিজেরাই করতে পারি। কারণ বর্তমান বিরাজমান সমস্যা অন্তর্বর্তী সরকারের কিছুসংখ্যক বিভাগের সংক্ষিপ্ত সংস্কারের ফলে দূরীভূত হবে বলে কখনোই মনে হয় না। এ ধরনের আক্ষেপ ও প্রতিবিধানের ব্যবস্থার কথা এ পত্রিকাতেই দীর্ঘদিন ধরে লিখে আসছি। প্রসঙ্গত, অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কারে এদেশের রাজনীতিকদের কর্ম ও চিন্তা-চেতনায় রাষ্ট্রের ও জনগণের কাছে সরাসরি কোনো জবাবদিহিতা ও আইনগত দায়বদ্ধতার তেমন কোনো ব্যবস্থা থাকবে বলে দেখা যাচ্ছে না। অথচ উলু দিয়ে কাছিম জড়ো করার মতো বর্তমান রাজনীতি ক্ষমতা ও টাকা ছিটিয়ে বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন, স্বার্থান্ধ-দুর্নীতিবাজ ও মতলববাজ লোকদের একজায়গায় জড়ো করছে। তাছাড়া বিধিবদ্ধ সংস্থাসহ সরকারের নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের অবৈধ রাজনীতিপ্রীতি ও লাগামহীন দুর্নীতির কোনো প্রতিবিধান দৃশ্যত নেই। সুতরাং পচা-দুর্গন্ধযুক্ত সমাজে সংস্কারের নামে যা করা হচ্ছে, প্রয়োজনের তুলনায় তা যতসামান্য। এছাড়াও ক্ষমতায় আসতে তৎপর দলগুলোর দেশ ও রাজনীতি সংস্কারের দিকে অধিক মনোযোগী না হয়ে এবং ভবিষ্যতে আধিপত্যবাদী শাসনমুক্ত স্বকীয়-স্বাধীন উন্নত দেশ গড়ার প্রত্যয় আন্তরিকভাবে মনে পোষণ না করে অনৈক্যের কারণে অতি দ্রুত ক্ষমতায় বসার ব্যবস্থা করার জন্য উঠেপড়ে লাগাও অন্তর্বর্তী সরকার ও ছাত্রজনতার বিপ্লবের আংশিক সফলতার জন্য দায়ী। শ্রুতিকটু কথাটা হলো: বিশ্বের অধিকাংশ দেশের রাষ্ট্র-পরিচালকদের মানসিকতাই তো সুস্থ নয়, তা সুস্থ সমাজব্যবস্থা ও আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে উঠবে কীভাবে?

মানুষের অন্তর্নিবিষ্ট স্বভাব বাদ দিলে সুশিক্ষা ও যোগ্য প্রশিক্ষণ এবং সুস্থ সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষকে 'মানুষের মতো মানুষ' রূপে গড়ে তোলা যায়। সমাজ সংস্কারের জন্য প্রথমত দরকার একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে এদেশের প্রতিটি জনপদে দলমত নির্বিশেষে সেই সমাজের অভ্যন্তর থেকে বাছাইকৃত সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবী, নির্বিবাদি-সৎ, উদারমনা কিছু লোক, যারা সমাজ পচে গেলেও সুশিক্ষার প্রিজারভেটিভ মেখে এখনো সমাজে অক্ষত আছেন। এদেরকে

একত্রিত করে আমরা সমাজ সংস্কারের কাজ করতে পারি। এরা এদের সমাজের প্রতিটা মানুষকে চেনেন-জানেন। এর নাম 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' বলা যায়। উদ্দেশ্য মানুষের মগজের সংস্কার, সমাজ সংস্কার ও মানবসেবা। একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, আমার মতো শত শত সমাজ সংস্কারকর্মী এ পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজ সংস্কারের বীজ তিন বছর আগেই আনুষ্ঠানিকভাবে বপন করেছিলেন। আজ সে বীজের চারা কচি-কিশোলয়ে ভরে উঠতে শুরু করেছে, অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ও ভবিষ্যত সরকার সমাজের স্বার্থে আমাদের স্থান করে দিতে এগিয়ে আসবে বলে আমরা আশাবাদী। সমাজ সংস্কারের জন্য কেন্দ্রীয় সংগঠনের রেজিস্ট্রিকৃত নাম দেওয়া হয়েছিল 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' (জাশিপ)। মূলত জাশিপের উদ্দেশ্য অরাজনৈতিক ও অলাভজনকভাবে সমাজ সংস্কারের তথা প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত ও সুশিক্ষিত সমাজ গঠন করা। মানুষের ভুলগুলো ধরিয়ে দেওয়া, সুশিক্ষা দেওয়া, মনের অন্তস্তলে নৈতিকথা, ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবতাবোধ, সুনীতির ধারণা, বিবেকের তাড়না জনে জনে জাগিয়ে তোলা। পার্থিব বিষয়ে জনকল্যাণ সাধন করতে পারলে পারলৌকিক কল্যাণসাধনও সম্ভব– এ ধারণায় মানুষকে উজ্জীবিত করা।

ছাত্রছাত্রীদের সুশিক্ষিত বানাতে শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যসূচিতে আমূল পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। পাঠ্যসূচির ভিত্তিমূল হতে হবে– লেখা, পড়া, গণিত, ধর্ম, গবেষণা বা অনুসন্ধান, জাগ্রত বিবেকবোধ ও ন্যায়নিষ্ঠা। এ উপাদানগুলো শিশুমনে সুদৃঢ়ভাবে প্রথিত করে দিতে হবে। এ কাজগুলো কমপক্ষে দশম শ্রেণি পর্যন্ত চলতে থাকবে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় এ ভিত্তিমূলগুলোর অভাব ভীষণভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ ব্যবস্থার আশু পরিবর্তন করতে হবে। শিক্ষার উদ্দ্যেশ্য হবে তিনটি– জীবনমুখী শিক্ষা, মনুষ্যত্ববোধ-সঞ্চারক শিক্ষা, এবং কর্মমুখী শিক্ষা। জীবনমুখী শিক্ষা ও মনুষ্যত্ববোধ-সঞ্চারক শিক্ষার দীর্ঘ তালিকা তৈরি করে তা গুরুত্বানুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে বণ্টণ করে দিয়ে ব্যবহারিকভাবে শেখাতে হবে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় তিনটি উদ্দেশ্য-সাধনেই অসম্পূর্ণতা ও ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। ফলে সুশিক্ষা অর্জিত হচ্ছে না। তাই জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদও বলা যাচ্ছে না। এদেশে শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তবায়ন সমস্যাও প্রকট। ব্যবস্থাপত্রের অতি সামান্য অংশ প্রতিপালিত হচ্ছে। প্রকৃত শিক্ষার বাজার দারুণ মন্দা। এভাবে জাতি বেশিদূর এগোতে পারে না। শিক্ষার এ দৈন্যদশা পুরো সমাজে ছড়িয়ে গেছে। এছাড়া দেশব্যাপী রাজনীতির নোংরামি, সামাজিক বিভাজন ও দেউলেপনা পরিবেশকে

কলুষিত করে ফেলছে। সমাজ গেছে নষ্ট হয়ে। সেজন্য দেশ ধ্বংসের প্রান্তসীমায় এসে সমাজ সংস্কারের আশু প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে।

সমাজের এ অবস্থাকে সুষ্ঠুপথে পরিচালিত করা কঠিন কিছু নয়, ইচ্ছাশক্তিই যথেষ্ঠ। প্রয়োজন পথহারা রাজনীতিকে সুপথে ফিরিয়ে নিয়ে আসা এবং সমাজ সংস্কারে দেশ-পরিচালকদের সাহায্য-সহযোগিতা নেওয়া; Inclusive society এবং Integrated education system। সমাজ সংস্কারের জন্য প্রথমেই সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে একই ডোরে গেঁথে গাঁটছড়া বাঁধতে হবে। গঠিত সংগঠন একটি নীতিমালা ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজগুলো করবে। প্রতিটি এলাকায়ই স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা আছে। বিকালের পর এগুলো খালি থাকে। বর্তমানে গ্রাম-গঞ্জের লোকজন সারাদিনের কর্মশেষে বিকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বিভিন্নভাবে অবসর সময় কাটায়। সংগঠন স্কুল-মাদ্রাসার অবকাঠামো ব্যবহার করে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রশিক্ষণ, সফ্টস্কিলস ট্রেইনিং, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও আর্থিক সহায়তার কাজ করবে। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে, আবার কখনো রাষ্ট্রীয় উৎস থেকে প্রান্তিক এ জনগোষ্ঠীর আর্থিক সহযোগিতা ও ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের কাজ অব্যাহত রাখতে এবং বণ্টনব্যবস্থা ক্রটিমুক্ত করতে গঠিত এ সমাজ গঠনমূলক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। সামাজিক শিক্ষা বৃদ্ধি করতে সাধারণ মানুষকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া, ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া এবং জীবনমুখী প্রশিক্ষণ দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই, যে দায়িত্ব এ সংগঠন পালন করতে পারে। প্রতিটি এলাকায় এ সংগঠন অভিভাবকসহ সাধারণ মানুষকে সুশিক্ষা দেবে, কাউন্সিলিং করবে, সমাজসেবা দেবে, প্রশিক্ষণ দেবে, তাদেরকে শিক্ষা-সচেতন জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তুলবে। এভাবে সামাজিক শিক্ষাবলয় গড়ে তুলতে পারলে সমাজে শিক্ষার উন্নতি হবে, সামাজিক অপরাধ, রাজনৈতিক সংঘাত ও অপচিন্তা অনেকটাই কমে আসবে। সাধারণ মানুষকে জনে জনে সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে সুস্থ চিন্তাধারার বিকাশসাধন করবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সম্মিলনে ত্রি-পক্ষীয় সম্পর্ক গড়ে তুলবে। তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে উচ্চশিক্ষা বা টেকনিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত করতে বলবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার তত্ত্বাবধান করবে। স্কুল-মাদ্রাসাগুলোতে ‘ফুল-টাইম স্কুলিং’ ব্যবস্থার দিকে ক্রমশ নিয়ে যাবে। স্কুল-মাদ্রাসার অবকাঠামো ব্যবহার করে অভিভাবকদের ও সাধারণ মানুষের জন্য সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। সামাজিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক অবক্ষয় রোধ করবে। বর্তমানে মাদকের

অপব্যবহার (ড্রাগ-এবিউজ) সমাজে টিন-এজারদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করেছে। এ সংগঠন শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে নিয়ে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করবে।

গরিব, নিঃস্ব, পীড়িত, অসহায় ও মেহনতি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আর্ত-মানবতার সেবায় আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করবে। শেণিভেদে, বিশেষ করে নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের মাধ্যমে সুদবিহীন স্বল্পকিস্তিভিত্তিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে মানুষকে কর্মমুখী করে গড়ে তুলবে। এভাবে সামাজিক ব্যবসার মডেলও তৈরি করা সম্ভব। বেকার ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে এলাকাভিত্তিক ছোট-মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানও গঠন করা যেতে পারে। এ সংগঠন নিজ নিজ এলাকায় একটি ক্লিনিক ও একটি কমিউনিটি পাঠাগার তৈরি করবে। স্বাস্থ্যশিক্ষার জন্য সেমিনার, হাতে-কলমে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে। সমাজের মানুষের সামাজিক স্বাস্থ্য-সচেতনতা বৃদ্ধি করবে এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে। সংগঠন উপজেলা বা জেলার কোনো মানবহিতৈষী এক বা একাধিক ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে পারে, যিনি বা যারা সপ্তাহে ভিন্ন দিন ক্লিনিকে এসে বিনা ফি-তে বা নামমাত্র ফি-তে রোগী দেখবেন। এতে সাধারণ মানুষ যারপরনাই উপকৃত হবে।

এ সংগঠন প্রতিটি মসজিদের ইমামকে অনুরোধ করবে মসজিদে খুৎবা দেয়ার আগে বাংলাতে বক্তৃতা দেওয়ার সময় মুসলমানের বৈশিষ্ট্য কী হওয়া উচিত, প্রতিহিংসার পরিণতি, অজ্ঞতার পরিণতি, স্বাস্থ্যশিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখার গুরুত্ব, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব, মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য, প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব, গরিব-দুঃখীকে দানের সাওয়াব, সাম্প্রদায়িক অহিংসা, সমাজসেবা সম্বন্ধে কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা, সমাজসেবকের ইহকাল ও পরোকালের প্রাপ্তি, দুনিয়ার সমস্ত ন্যায়-কাজ ও পেশাগত সমস্ত কাজও ইবাদতের অংশ ইত্যাদি বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী করে বক্তৃতা দিতে। মসজিদের ইমামকেও সমাজসেবার জন্য সাথে নিতে পারেন। সংস্কার-কর্মীদের কাজ হচ্ছে, তাদের আওতাধীন বিভিন্ন মসজিদ-মাদ্রাসায় নিয়মিত যাওয়া; সব মাদ্রাসায় জীবনমুখী, কর্মমুখী ও জীবনের উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষা চালু করার জন্য অনুরোধ করা। ছাত্রছাত্রীরা যেন বিজ্ঞান ও ব্যবসামুখী কিংবা কারিগরি শিক্ষা নিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে সে কথা বুঝিয়ে বলা।

এখানে বড় আকারের কোনো খরচ নেই। বলা যায়, বিনামূল্যে সমাজের মানুষ

সমাজসেবা পাবেন। শুধু প্রক্রিয়াটা একবার চালু করে দিতে পারলেই হবে এবং পরবর্তী সময়ে এটা সামাজিক প্রক্রিয়ারও একটা অংশ হিসেবে রূপ নেবে। এ ব্যবস্থাকে চালু রাখতে পারলে ভবিষ্যতে সমাজ-সংস্কৃতির একটা অংশ হিসেবে দেখা দেবে। দীর্ঘ বছরে সমাজের যে নেগেটিভ পরিবর্তন হয়েছে, এ প্রক্রিয়ায় সমাজ পজিটিভ পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাবে।

তবে সমাজ সংস্কারের সব বিষয়ে সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রতিটি জেলার জেলা-প্রশাসক কর্মকাণ্ড দেখাশোনার দায়িত্বে থাকবেন। একজন অতিরিক্ত জেলা-প্রশাসক, জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার; জেলা ও উপজেলা সমাজকল্যাণ বিভাগ এবং স্বাস্থ্য বিভাগ উপজেলার প্রতিটা অঞ্চলে যোগ্যতার ভিত্তিতে ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ গঠন করবেন এবং সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতা করবেন। শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তবায়ন করবেন। সমাজ সংস্কার একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে হবে। এ সংগঠনের পুরো কর্মকাণ্ডটাই হবে ব্যষ্টিক উন্নয়নের মডেল আকারে এবং সামাজিক উন্নয়নে মানবসম্পদ তৈরির প্রক্রিয়া হিসেবে। মানবসম্পদ উন্নয়ন তথা জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও মানসিকতার উন্নয়নও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুগামী একটা সহায়ক উপাদান। এ বিষয়ে ‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’ সবসময় অগ্রণি ভূমিকা পালন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

(প্রকাশ: ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, দৈনিক যুগান্তর)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ;
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।
Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ– পরিচিতি

ড. হাসনান আহমেদের জন্ম ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮, চুয়াডাঙ্গা জেলার দত্তাইল-শম্ভুনগর গ্রামে। তিনি একজন সুপরিচিত অ্যাকাডেমিশিয়ান। তাঁর অ্যাকাউন্টিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট, কর্পোরেট গভর্নেন্স বিষয়ে বৈচিত্র্যময় অবদান ও ভূমিকা দেশ-বিদেশের অ্যাকাডেমিশিয়ানস ও পেশাজীবী সমাজে স্বীকৃত। তিনি দেশ-বিদেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে ঋদ্ধ, চার দশকের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ, ব্যবসায় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাবিদ্যা এবং নানাবিধ প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তিনি স্ট্যাটিজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

তিনি একজন প্রাবন্ধিক, লেখক ও গল্পকার। তাঁর লেখালেখির সূত্রপাত স্কুল থেকে। তিনি সমসাময়িক বিক্ষুব্ধ সমাজব্যবস্থা ও বেপথুমান জীবনাচারের নিখুঁত ছবি অঙ্কনের একজন বলিষ্ঠ ভাষাশিল্পী। তাঁর লেখনীতে বর্তমান মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা, জনসমাজের দুরবস্থা, নৈতিক অধঃপতন, শিক্ষামানের অবনতি প্রভৃতির বাস্তব ও মনোজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। এছাড়া তিনি তাঁর লেখনীতে মানবসম্পদ উন্নয়নের বাস্তব প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনার ছবি একজন উদারচেতা শিক্ষাবিদের দৃষ্টিতে এঁকেছেন। তাঁর সূক্ষ্ম ও নিখাদ উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে বেশ কিছুসংখ্যক কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও ছোটগল্পের বইয়ে। তাঁর লেখনী সমকালীন সমাজ-সংগঠনের গতিপ্রকৃতি, পরিবেশ, জীবনবৈচিত্র্য, পারিপার্শ্বিক ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার এক ধরনের ইমপ্রেশনিস্টিক বা আত্মমগ্ন উপাখ্যান।

ড. আহমেদ তেতাল্লিশ বছর ধরে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত ইন্সটিটিউট, কলেজ, গবেষণা-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, শিক্ষা-প্রশাসন এবং গবেষণার কাজ করে আসছেন। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গবেষণা প্রকল্পে গবেষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু এবং আর্থ-সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ে অসংখ্য গবেষণায় এখনোও জড়িত। তিনি আইসিএমএবি-র শিক্ষা ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি এএসিএসবি স্বীকৃত মালয়েশিয়ার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 'ইউনিভার্সিটি উতারা মালয়েশিয়া'র ভিজিটিং স্কলার হিসেবেও কর্মরত ছিলেন। ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর হিসেবে

দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। এছাড়া স্কুল অব বিজনেস অ্যান্ড ইকোনোমিক্স-এর ডিন এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন ও সমাজসেবার সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা রয়েছে। তিনি বাংলাদেশ সোসাইটি ফর হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট-এর একজন ফেলো। ফেডারেশন অব বাংলাদেশ হিউম্যান রিসোর্স অর্গানাইজেশনস-এর ট্রাস্টি-বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। আইসিএমএবি-এর অ্যাকাডেমিক অ্যাডভাইজরি কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য। কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট।

তিনি কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা-সেবা কার্যক্রমের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত। এতে তিনি অনন্য এক ব্যষ্টিক উন্নয়ন মডেলের প্রয়োগ করেন। সমন্বিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করেন; গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সুস্থ মানসিক বিকাশে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন; দুঃস্থদের জীবনমান উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তিনি এদেশের সমাজ, দেশ ও শিক্ষার উন্নয়নে নতুন মডেল প্রতিষ্ঠা করেন, নতুন শিক্ষানীতি ও দেশ পরিচালনার নীতি ও সমাজ উন্নয়ন বিষয়ে শতাধিক প্রবন্ধের রচয়িতা।

আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নতির জন্য সামাজিক শিক্ষা ও সামাজিক সেবার মানকেও উন্নত করতে হবে। সুশিক্ষিত পরিবেশ গড়তে গেলে সমাজের অভ্যন্তর থেকে সুস্থ-চিন্তাশীল, কর্মোদ্যোগী লোককে একত্র করে কাজে লাগাতে হবে। প্রয়োজন একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা। এ লক্ষ্যে দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদদের সাথে নিয়ে ড. আহমেদ 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' গঠন করেন। এ পরিষদ এলাকাভিত্তিক 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' তৈরি করবে। এক্ষেত্রে 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' ও 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' দলমত নির্বিশেষে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সাথে নিয়ে শিক্ষা ও সেবা কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেবে। এ প্ল্যাটফর্ম সরকারের শিক্ষা ও সমাজসেবা নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও কর্মকৌশল নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে। জনগোষ্ঠীকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে মানবসম্পদরূপে গড়ে তুলতে গেলে জীবনমুখী শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা এবং মানবিক গুণাবলি-সঞ্চারক শিক্ষা প্রয়োজন। এই ত্রিমাত্রিক শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়নে প্রয়োগ করবে। এছাড়া সমাজের

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রশিক্ষণ, সফ্টস্কিলস ট্রেইনিং, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও আর্থিক সহায়তা করবে। বণ্টনব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত করতে ‘জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ’ এবং ‘শিক্ষা-সেবা সমাজ’ গঠনমূলক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যে ড. আহমেদ ‘শিক্ষা-সেবা (আর্থ-সামাজিক) উন্নয়ন মডেল’ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট।

বিভিন্নমুখী শিক্ষার সন্নিবেশ ও অভিজ্ঞতা ড. আহমেদকে অনন্য করেছে। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে বিকম (অনার্স) ও এমকম। বিআইএম থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা। আইসিএমএবি থেকে সিএমএ এবং বর্তমানে একজন এফসিএমএ। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে পিএইচডি। ইউরোপিয়ান কমিশনের এরাসমাস মুন্ডুস স্কলার হিসেবে করভিনাস ইউনিভার্সিটি অব বুদাপেস্ট থেকে কর্পোরেট গভর্নেন্স বিষয়ে পোস্ট-ডক্টরেট। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ’৮৫ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে যোগদান করেন।

ড. আহমেদ গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো– ‘জীবনক্ষুধা’, ‘প্রতিদান চাইনি’, ‘কিছু কথা কিছু গান’, ‘অপেক্ষা’, ‘শেষবিকেলের পথরেখা’, ‘সত্যের গল্প গল্পের সত্য’, ‘সমকালীন জীবনাচার ও কর্ম’, ‘আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা’, ‘এইসব দিনকাল’, ‘এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে’ অলখ মহাশক্তির খেলাঘর প্রভৃতি। তার শতাধিক প্রবন্ধ দৈনিক জাতীয় পত্রিকায় উপসম্পাদকীয় কলামে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি শিক্ষকতা পেশা থেকে অবসরে গেছেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে সমাজে কাজ করে যাচ্ছেন; অভিজ্ঞতাসিঞ্চিত উপলব্ধিকে কাজে লাগিয়ে বইপুস্তক ও নিউজপেপার-কলাম লিখে চলেছেন।

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ
ফোন নম্বর: ০১৭১৮৬৩৪০৫৭
ই-মেইল: hasnanahmed@yahoo.com
Web page: Web page: https://www.pathorekhahasnan.com

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ